লীলা মজুমদার রচনাবলী

১

সম্পাদনায়

সমীর মৈত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।। কলিকাতা-সাত
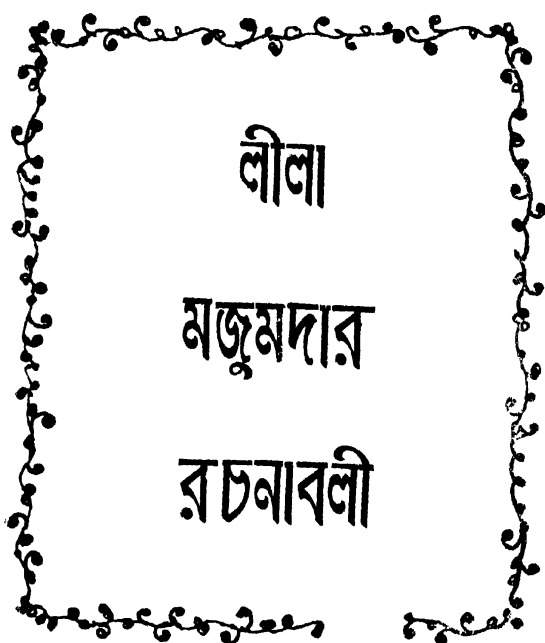
লীলা

মজুমদার

রচনাবলী

সূচীপত্র

পদিপিসীর বর্মিবাক্স	১৫
বক-বধ পালা	৪৯
এই যা দেখা	৭৯
ছেলেবেলার গল্প	১৭৫
হলদে পাখির পালক	২৬১
বহুরূপী	৩২৩

পদিপিসীর বর্মিবাক্স

পদিপিসীর বর্মিবাক্স

পাঁচুমামার প্যাঁকাটির মতন হাত ধরে টেনে ওকে ট্রেনে তুললাম। শূন্যে খানিক হাত-পা ছুঁড়ে, ও বাবাগো মাগো বলে চেঁচিয়ে-টেঁচিয়ে শেষে পাঁচুমামা খচ্‌মচ্‌ করে বেঞ্চিতে উঠে বসল। তার পর পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ফেলে, খুব ভালো করে নিজের হাত-পা পরীক্ষা করে দেখল কোথাও ছড়ে গেছে কি না ও আয়োডিন দেওয়া দরকার কি না। তার পর কিছু না পেয়ে দুবার নাক টেনে, পকেটে হাত পুরে, খুদে-খুদে পা দুটো সামনের বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে চিঁচিঁ করে বলল, "ছোটবেলায় একবার ভুলে বাদশাহি জোলাপ খেয়ে অবধি শরীরটা আমার একদম গেছে, কিন্তু বুকে আমার সিংহের মতন সাহস। তা নইলে পদিপিসীর বর্মিবাক্স খোঁজার ব্যাপারে হাত দেব কেন!" বলে ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ দুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তো অবাক।

কোনার বেঞ্চিতে যে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনিও অবাক! পাঁচুমামা বলল, "একশো বছর পরে পদিপিসীর বর্মিবাক্স আমি আবিষ্কার করব। জানিস, তাতে এক-একটা পান্না আছে এক-একটা মোরগের ডিমের মতন, চুনী আছে এক-একটা পায়রার ডিমের মতন, মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতন। মুঠো-মুঠো হীরে আছে, গোছা-গোছা মোহর আছে। তার জন্য শত-শত লোক মারা গেছে, রক্তের সালওয়েন নদী বয়ে গেছে, পাপের উপর পাপ চেপে পর্বত তৈরি হয়েছে—সব আমি একা উদ্ধার করব!"

তখন আমার ভারি রাগ হল। বললাম, "তুমি ইঁদুর ভয় পাও, গোরু দেখলে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়, তুমি কী করে উদ্ধার করবে?" পাঁচুমামা বলল, "আমার মনের ভিতর যে সিংহ গর্জন করছে।" বলে একদম চুপ মেরে গেল। আমি পাঁচুমামাকে একটা ছাঁচি পান দিলাম, এক বোতল লেমোনেড খাওয়ালাম, খাবারওয়ালাকে ডেকে মস্ত শাল-পাতার ঠোঙা করে লুচি, আলুর দম, কপির সিঙাড়া, খাজা আর রসগোল্লা কিনে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, "ও পাঁচুমামা, পদিপিসীর বর্মিবাক্সটা কোথায় আছে?" পাঁচুমামা আমার এত কাছে ঘেঁষে এল যে তার কনুইটা আমার কোঁকে ফুটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুমামার ভুরুর প্রত্যেকটা লোম খাড়া হয়ে দুটো শুঁয়োপোকার মতন দেখাতে লাগল। ওর মাথাটা ঝুলে আমার এত কাছে এসে গেল যে ঐ শুঁয়োপোকার সুড়সুড়ি আমার কপালে লাগল। পাঁচুমামা নিচু গলায় কথা বলতে লাগল, আর আমি তাই শুনতে-শুনতে টের পেলাম চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কখন জানি ওঁর নিজের বেঞ্চি ছেড়ে পাঁচুমামার ওপাশে ঘেঁষে হাঁ করে কথা শুনছেন, তাঁর চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেছে আর গলার মধ্যিখানে একটা গুট্‌লি মতন ওঠানামা করছে। তাই দেখে আর পাঁচুমামার কথা শুনে আমার সারা গা সির্‌সির্ করতে লাগল।

পাঁচুমামা বলতে লাগল, "দেখ্‌, মামাবাড়ি তো যাচ্ছিস। সেখানকার গোপন সব লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো তোর জানা দরকার এ কথা কখনো ভেবে দেখেছিস? পদিপিসীর নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকতে পারত তা জানিস? ঠাকুর্দার পদিপিসী, অদ্ভুত রাঁধতে পারতেন। একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন যে
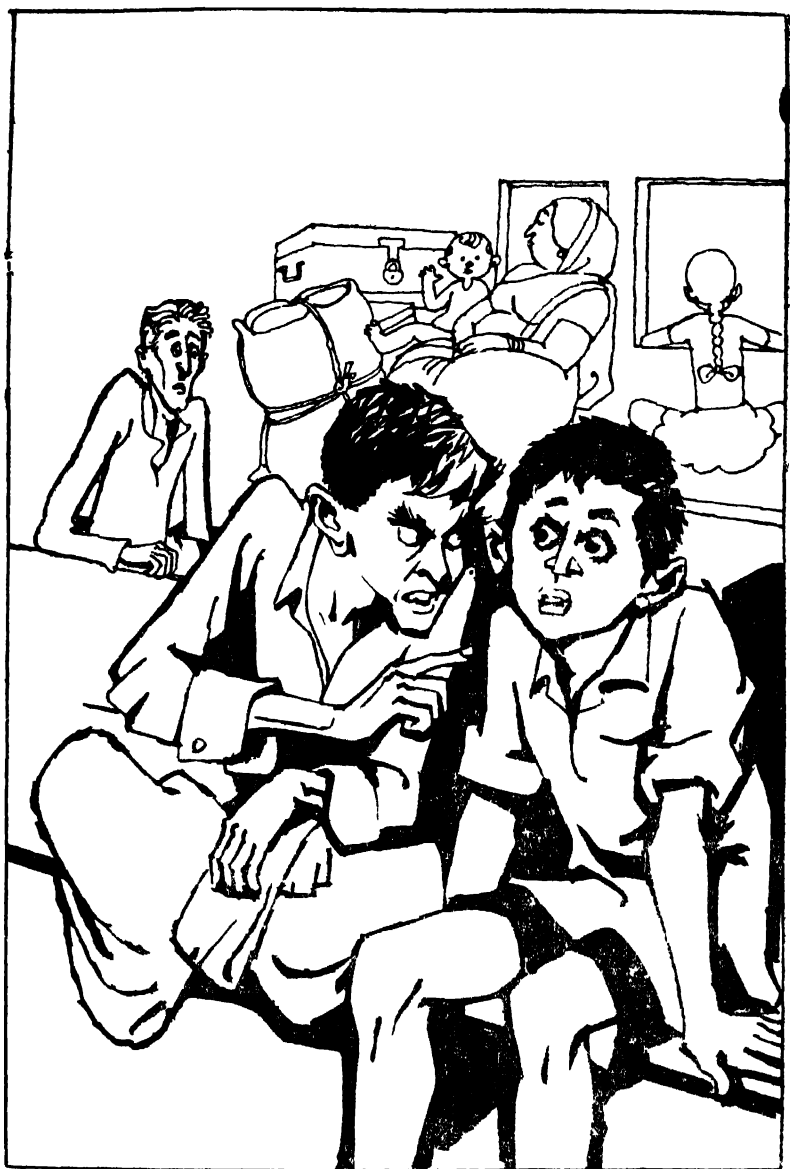
চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনিও অবাক !

বড়লাট সাহেব একেবারে থ! বলেছিলেন, এই খেয়েই তোমলোককো দেশকো এইসা দশা! থাক গে সে কথা! অদ্ভুত রাঁধুনি ছিলেন পদিপিসী। বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ! সিংহের মতন তেজও ছিল তাঁর, হাজার হোক, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি তো তাঁরই বংশধর। বুঝলি, ঐ পদিপিসী গোরুর গাড়ি চড়ে, মাঘীপূর্ণিমার রাতে বালাপোশ গায়ে, নিমাইখুড়োর বাড়ি চলেছেন বত্রিশবিঘার ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে। যাচ্ছেন আর মনে-মনে ভাবছেন নিমাইখুড়োর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, জঙ্গলে একা থাকেন, মেলা সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা নিয়ে, কপালে চন্দন সিঁদুর দিয়ে চিত্তির করা, কথায়-কথায় ভগবানের নাম। অথচ এদিকে মনে হয় দেদার টাকা, দানটানও করেন, জিগ্‌গেস করলে বলেন—সবই ভগবানের দয়া! এত লোক থাকতে ভগবান যে কেন ওঁকেই দয়া করতে যাবেন সেও একটা কথা।

"এই-সব ভাবছেন হঠাৎ হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একদল লাল লুঙ্গিপরা, লাল পাগড়ি বাঁধা, লাল চোখওয়ালা ডাকাতপানা লোক একেবারে গোরুর গাড়ি ঘেরাও করে ফেললে! নিমেষের মধ্যে গোরু দুটো গাড়ি থেকে খুলে নিল, আর পদিপিসীর সঙ্গে রমাকান্ত ছিল, তাকে তো টেনেহিঁচড়ে গোরুর গাড়ি থেকে বার করে তার ট্যাঁক থেকে সাড়ে সাতআনা পয়সা আর নস্যির কৌটো কেড়ে নিলে। পদিপিসী থান পরা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর তার উপর দুই হাত দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এমন করে দাঁড়ালেন যে ভয়ে কেউ তাঁর কাছে এগুলো না। শেষটা তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে বাটপাড়েরা, গাড়োয়ান, রমাকান্ত সবাইকে তো আধমরা করে ফেললি, গোরুগুলোরও কিছু বাকি রেখেছিস কি না জানি না। এবার তোরাই আমাকে নিমাই-খুড়োর বাড়ি কাঁধে করে পৌঁছে দে!' তাই-না শুনে ডাকাতরা জিভ-টিভ কেটে, পদিপিসীর পায়ে একেবারে কেঁদে পড়ে বলল, 'নিমাইসর্দার যদি জানতে পারে তার কুটুমকে এরা ধরেছিল—নিমাইসর্দার এদের প্রত্যেকের ছাল ছাড়িয়ে নেবে, হাউমাউ!' তখন তারা ফের গোরু জুতে, পয়সা ফিরিয়ে, রমাকান্তর গায়ে হাত বুলিয়ে, গাড়োয়ানকে নগদ চারটে পয়সা ঘুষ দিয়ে, নিজেরাই নিমাইখুড়োর বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।

"পদিপিসীও নিমাইখুড়োর কথা জানতে পেরে মহাখুশি!"

পাঁচুমামা ঢোক গিলে চোখ গোল করে আরো কত কি বলল। "পদিপিসীর ভীষণ বুদ্ধি, ধাঁ করে টের পেয়ে গেলেন খুড়োই ডাকাত-দলের সর্দার। পদিপিসী খুড়োর বাড়ি দুপুর রাতে পৌঁছেই খুড়োর চোখের ওপর চোখ রেখে, দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন—'শালবনে আমাকে ডাকাতে ধরেছিল, তাড়াতাড়ি গোরুর গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আমার তসরের চাদর খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, পায়ের বুড়ো আঙুলে হোঁচট লেগেছে, আর তা ছাড়া মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। এর কী প্রতিশোধ নেব এখনো ঠিক করি নি। এখন রান্না করব, খাব, তার পর পান মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখব।'

"খুড়োর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত থেকে রুপোবাঁধানো গড়গড়ার নলটা মাটিতে পড়ে গেল ; খুড়োমশাই বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে তারই উপর একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ নাড়তে লাগলেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। পদিপিসী তাই দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমার মধ্যে যে-সব সন্দেহরা ঝাঁক বেঁধে অন্ধকার বানিয়ে রেখেছে, তারা যাতে মনের মধ্যেই থেকে যায়, বাইরে প্রকাশ পেয়ে তোমার অনিষ্ট না ঘটায়, তার ব্যবস্থা অবিশ্যি তোমার হাতে।' বলে চাদরটা চৌকির উপর রেখে কুঁজো থেকে খাবার জল নিয়ে পা ধুলেন। তার পর রান্নাঘরে গিয়ে খুড়িকে ঠেলে বের করে দিয়ে মনের সুখে গাওয়া ঘি দিয়ে নিজের মতন চারটি ঘিভাত রাঁধতে বসে গেলেন। খুড়োও আস্তে-আস্তে সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—'তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ডাকাতের কথা কাউকে না বল।'

"পদিপিসী একমনে রাঁধতে লাগলেন।

"খুড়ো বললেন—'একশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু হাসলেন। খুড়ো বললেন—'পাঁচশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু কাশলেন। খুড়ো মরীয়া হয়ে বললেন—'হাজার টাকা দেব, পাঁচ হাজার টাকা দেব, আমার লোহার সিন্দুক খুলে দেব, যা খুশি নিয়ো।' পদিপিসী খুন্তিকড়া নামিয়ে রেখে সোজা সিন্দুকের সামনে উপস্থিত হলেন। খুড়ো সিন্দুক খুলতেই হীরে-জহরতের আলোয় পদিপিসীর চোখ ঝলসে গেল। খুড়ো ভেবেছিলেন সেইসঙ্গে পদিপিসীর মাথাও ঘুরে যাবে, কী নেবে না-নেবে কিছু ঠাহর করতে পারবে না। কিন্তু পদিপিসী সে মেয়েই নয়। তিনি অবাক হয়ে গালে আঙুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন—'ওমা, এ যে
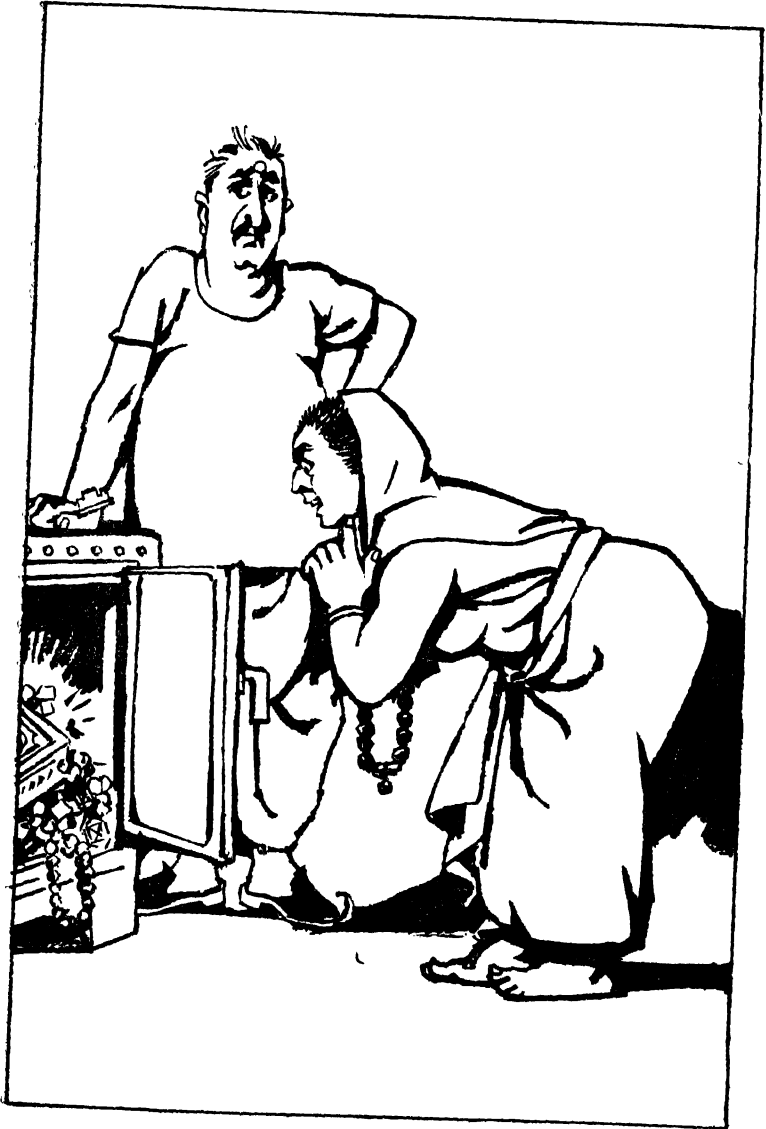
ওমা, এ যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর !

আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর। ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে বাটপাড়, কি দাঁওটাই মেরেছিস!' বলে দু হাতে জড়ো করে একটিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙরের নক্‌শা-আঁকা লাল বর্মিবাক্সও টেনে নামালেন। খুড়ো হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বললেন—'আহা, ওটা থাক, ওটাতে যে আমার সব প্রাইভেট পেপার আছে!'

"পদিপিসী থপ্‌ করে মাটিতে থেবড়ে বসে বললেন—'চোপরাও শালা। নয়তো সব প্রাইভেট ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেব!' বলে কাগজপত্র বের করে ফেলে দিয়ে, ঐ-সব ধনরত্ন বর্মিবাক্সে ভরে নিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে জলচৌকিতে বসে কড়াটা উনুনে চাপালেন। সারারাত ঘুমলেন না, বাক্স আগলে জেগে রইলেন, ভোর না-হতেই আবার গোরুর গাড়ি চেপে শালবনের মধ্যে দিয়ে লাল আলোয়ান গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।"

পাঁচুমামা এবার থামল। আর আমি মাথা বাগিয়ে জিগ্‌গেস করলাম—"তার পর?" এবং সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও নিশ্বাস বন্ধ করে বললেন—"তার পর? তার পর?" পাঁচুমামা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনার কী মশাই?" ভদ্রলোক অপ্রস্তুতপানা মুখ করে বললেন—"না, না—গল্পটা বড় লোমহর্ষণ কিনা—"

পাঁচুমামা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললাম—"চুপ, চোখ ইজ্‌ জ্বল্‌জ্বলিং।" পাঁচুমামা তাঁকে কিছু না বলে আবার বলতে লাগল—"এত কষ্ট করে পাওয়া বর্মিবাক্স নিয়ে পদিপিসী সারাদিন গোরুর গাড়ি চেপে বাড়িমুখো চলতে লাগলেন। দুপুরে সজনে গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে খিচুড়ি আর সজনে ফুল ভাজা খাওয়া হল, তার পর আবার গাড়ি চলল। এমনি করে রাত দশটা নাগাদ পদিপিসী বাড়ি পৌঁছুলেন। কেউ মনেই করে নি পিসী এত শিগ্‌গির ফিরবেন, সবাই অবাক। সবাই বেরিয়ে এসে পদিপিসীকে আর জিনিসপত্র পোঁটলা-পাঁটলি টেনে নামাল। তার পর গোলমাল, চ্যাঁচামেচি, ডাকাতের গল্প, অবিশ্যি ডাকাতের সঙ্গে খুড়োর যোগের কথা পদিপিসী ছাড়া কেউ সন্দেহও করে নি, পদিপিসীও চেপে গেলেন। হঠাৎ বাক্সটার কথা মনে পড়তে বগল থেকে সেটাকে টেনে বের করে দেখেন, যেটাকে বর্মিবাক্স বলে সযত্নে গাড়ি থেকে-নামিয়ে-ছিলেন সেটা আসলে পানের ডিবে। বর্মিবাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।"

পাঁচুমামা চোখ গোল করে চুল খাড়া করে চিঁচিঁ করে বলতে লাগল আর আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম। "সে বাক্স একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। সেই রাতদুপুরে পদিপিসী এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন যে বাড়িসুদ্ধু সবাই যে যেখান থেকে পারে মশাল, মোমবাতি, লণ্ঠন, তেলের পিদ্দিম জ্বেলে নিয়ে এসে এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে মহা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পদিপিসী নিজে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলেন। বললেন, 'নেই বললেই হল! এই আমার বগলদাবা করা ছিল, আর এই তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না! একটা আধহাত লম্বা শক্ত কাঠের বাক্স একেবারে কর্পূরের মতন উড়ে গেল! একি মগের মুল্লুক!'

"বলে গোরু খুলিয়ে, গোরুর গাড়ির ছাউনি তুলিয়ে, বাঁশের বাঁধন আলগা করিয়ে, গাড়োয়ানের দুহাতি ধুতি ঝাড়িয়ে আর রমাকান্তকে দস্তুরমতো সার্চ করিয়ে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। শেষে যখন গোরু দুটোর ল্যাজের খাঁজে খুঁজতে গেছেন তখন গোরু দুটো ধৈর্য হারিয়ে পদিপিসীর হাঁটুতে এইসা গুঁতিয়ে দিল যে পদিপিসী তখুনি বাবাগো মাগো বলে বসে পড়লেন। কিন্তু বসে পড়লে কি হবে, বলেইছি তো সিংহের মতন তেজ ছিল তাঁর, বসে-বসেই সারারাত বাড়িসুদ্ধু সবাইকে জাগিয়ে রাখলেন। কিন্তু সে-বাক্স আর পাওয়াই গেল না। এতক্ষণ যারা খুঁজছিল তারা কেউ বাক্সে কী আছে না-জেনেই খুঁজছিল। এবার পদিপিসী কেঁদে ফেলে সব ফাঁস করে দিলেন। বললেন, 'নিমাইখুড়ো আমাকে দেখে খুশি হয়ে ঐ বাক্স ভরে কত হীরে-মোতি দিয়েছিল, আর সে তোরা কোথায় হারিয়ে ফেললি।' তাই-না শুনে যারা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে বসে পড়েছিল, তারা আবার উঠে খুঁজতে শুরু করে দিল। শুনেছি তিন দিন তিন রাত ধরে মামাবাড়িসুদ্ধু কেউ খায়ওনি ঘুমোয়ওনি। বাগান পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। যাদের মধ্যে বিষম ভালোবাসা ছিল তারাও পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিল।"

আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বললাম, "তার পর? তার পর?" পাঁচুমামা বলল, "তার পর আর কি হবে? এক সপ্তাহ সব ওলটপালট হয়ে রইল, খাওয়া নেই, শোয়া নেই, কারু মুখে কথাটি নেই! সারা

বাড়ি সবাই মিলে তোলপাড় করে ফেলল। কত যে রাশি-রাশি ধুলো, মাকড়সার জাল, ভাঙা শিশি-বোতল, তামাকের কৌটো বেরুল তার ঠিক নেই। কত পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি বেরুল; কত গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেল; কত হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু পদিপিসীর বর্মিবাক্স হাওয়ায় উড়ে গেল। এমন ভাবে হাওয়া হয়ে গেল যে শেষ অবধি অনেকে এ কথাও বলতে ছাড়ল না যে বাক্স-টাক্স সব পদিপিসীর কল্পনাতে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। কেবলমাত্র রমাকান্ত বার বার বলতে লাগল—নিমাইখুড়োর বাড়ি থেকে পদিপিসী যে খালি হাতে ফেরেন নি এ কথা ঠিক। গোরুর গাড়িতে আসবার সময়ে বাক্সটা চোখে না-দেখলেও পদিপিসীর আঁচল চাপা শক্ত চৌকো জিনিসের খোঁচা তার পেটে লাগছিল, এবং সেটা পানের বাটা নয় এও নিশ্চিত, কারণ পানের বাটার খোঁচা তার পিঠে লাগছিল।

"বাক্সের শোকে পদিপিসী আধখানা হয়ে গেলেন। অত হীরে-মোতি লোকে সারাজীবনে কল্পনার চোখেও দেখে না আর সে কিনা অমন করে কোলছাড়া হয়ে গেল! শোকটা একটু সামলে নিয়ে পদিপিসী আবার রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর খোঁজে গেছিলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। গিয়ে দেখেন বত্রিশবিঘার শালবনের মাঝখানে নিমাইখুড়োর আড্ডা ভেঙে গেছে, জনমানুষের সাড়া নেই, বুনো বেড়াল আর হুতুমপ্যাঁচার আস্তানা।

"তার পর কত বছর কেটে গেল। বাক্সের কথা কেউ ভুলে গেল, কেউ আবছায়া মনে রাখল। একমাত্র পদিপিসীই মাঝে-মাঝে বাক্সের কথা তুলতেন। আরো বহু বছর বাদে পদিপিসী স্বর্গে গেলেন। যাবার আগে হঠাৎ ফিক করে হেসে বললেন, 'এই রে! বাক্সটা কী করেছিলাম এদ্দিন পরে মনে পড়েছে!' বলেই চোখ বুজলেন! তাই শুনে পদিপিসীর শ্রাদ্ধের পর আর-এক চোট খোঁজাখুঁজি হয়েছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নি।"

চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বললেন, "তার পর?"

পাঁচুমামা বলল, "সেই বাক্স আমি বের করব। কিন্তু আপনার তাতে কী মশাই?"

পাঁচুমামা এইখানে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থাকার ফলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক উঠে গিয়ে সুড়্‌সুড়্‌ করে নিজের জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে

বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবাই ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়ে একেবারে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে দেখা গেল।

আমি আশা করে বসেই আছি পাঁচুমামা লোমহর্ষণ আরো কিছু বলবে, কিন্তু পাঁচুমামা দেখলাম চটিটি খুলে ঘুমোবার জোগাড় করছে। তাই দেখে আমার কেমন অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক থাকতে না পেরে দাঁত খোঁটা বন্ধ করে জিগগেস করলেন, "একশো বছর ধরে যা এত খোঁজা সত্ত্বেও পাওয়া যায় নি, তাকে যে আবিষ্কার করবেন, কোনো পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ জাতীয় চিহ্ন-টিহ্ন কিছু পেয়েছেন?"

পাঁচুমামা বলল, "ঠিক পাই নি, তবে পেতে কতক্ষণ? পদিপিসীর শেষ কথায় তো মনে হয় যে চোখের সামনেই কোথাও আছে, চোখ ব্যবহার করলেই পাওয়া যাবে। লুকিয়ে রাখবার তো সময়ই পান নি। আর মনে পড়ে যখন হাসি পেয়েছিল তখন নিশ্চয় চোরেও নেয় নি। কিন্তু পাঁচশোবার বলছি মশাই আপনার তাতে কী?" চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সবাই শুয়ে পড়ল আর আমি একা জেগে অন্ধকার রাত্রের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে হাজার-হাজার জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি আর থেকে-থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়ার মধ্যে ছোট-ছোট আগুনের কুচি দেখতে লাগলাম। ক্রমে সে-সব আবছা হয়ে এল, আমার চোখের সামনে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স, লালচে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট হিংস্র এক মাছ প্যাটার্নের ড্রাগন, তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লক্‌লক্ করছে। আরো দেখতে পেলাম যেন বাক্সর ঢাকনিটা খোলা হয়েছে আর তার ভিতর পায়রার ডিমের মতন, মোরগের ডিমের মতন, হাঁসের ডিমের মতন, উটপাখির ডিমের মতন সব হীরেমণি আমার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। হঠাৎ ঘচ্ করে ট্রেন থেমে গেল।

মামাবাড়ির স্টেশনে পৌঁছলাম গভীর রাতে। স্টেশনের বেড়ার পেছনে কতকগুলো লম্বা-লম্বা শিশুগাছের পাতার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা

ঝোড়ো হাওয়া সির্‌সির্‌ করে বয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানুষ নেই। ছোট্ট স্টেশনবাড়ির কাঠের দরজার কাছে স্টেশনমাস্টার একটা কালো শেড্‌ লাগানো লণ্ঠন নিয়ে হাই তুলছেন। পান খেয়েছেন অজস্র, আর বহুদিন দাড়ি কামান নি। একটা গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, গোরুর গাড়ি দূরে থাকুক, একটা বেড়াল পর্যন্ত কোথাও নেই।

আমি পাঁচুমামার দিকে তাকালাম; পাঁচুমামাও ফ্যাকাশে মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তখন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, "তুমি যে প্রায়ই বল আমরা এখানকার জমিদার, এরা তোমাদের প্রভুভক্ত প্রজা, এই কি তার নমুনা? আমি তো ভেবেছিলাম আলো জ্বলবে, বাদ্যি বাজবে, মালাচন্দন নিয়ে সব সারে সারে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পর আমরা চতুর্দোলায় চেপে মামাবাড়ি যাব। গিয়ে গরম-গরম—"

পাঁচুমামা এইখানে আমার খুব কাছে ঘেঁষে এসে কানে-কানে বলল, "চোপ্‌ ইডিয়ট্‌! দেখছিস না চার দিক থেকে অন্ধকারের মতন বিপদ ঘনিয়ে আসছে? রক্তলোলুপ নিশাচররা যাদের পিছু নিয়েছে তাদের কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শোভা পায়?"

চমকে উঠে বক্তৃতা থামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা নিবু-নিবু দু-সেলওয়ালা টর্চ জ্বেলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে রাশি-রাশি পোঁটলা-পাঁটলি ছেলেপুলে ও মোটা গিন্নিকে নামাচ্ছেন। তাঁরা নামতে না-নামতেই গাড়িটাও ঘড়্‌ঘড়্‌ করে চলে গেল, আর অন্ধকার লম্বা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। তার মধ্যে শুনতে পেলাম পাঁচুমামা আমার ঘাড়ের কাছে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে নিশ্বাস ফেলছে। এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে কে চ্যাঁচাতে লাগল, "অ পাঁচুদাদা, অ মেজদিমণির খোকা! বলি এয়েচ না আস নি?" পাঁচুমামার যেন ধড়ে প্রাণ এল, খচ্‌মচ্‌ করে ছুটে গিয়ে বলল, "ঘনশ্যাম এলি! আঃ বাঁচালি!"

ঘনশ্যাম কিন্তু পাঁচুমামার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ ভালো লাগে না পাঁচুদাদা। এ দিকে বড় গোরু তো আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছেন। কত টানাটানি করলাম, কত কাকুতি-মিনতি করলাম, কত ল্যাজ মোচড়ালাম। শেষ অবধি গাড়ির বাঁশ

খুলে নিয়ে পেটের নীচে চাড় দিয়ে পর্যন্ত ওঠাতে চেষ্টা করলাম। সে কিন্তু নড়েও না, ঐরকম বসে ঘাস চাবায়।"

পাঁচুমামা বলল, "অ্যাঁ ঘনশ্যাম! তবে কী হবে?"

ঘনশ্যাম বলল, "হবে আবার কী? চল দেখবে চল।"

আমরা সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে কাঁকর-বেছানো প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে ওদিকে ধুলোমাখা রাস্তায় এসে পড়লাম। সেইখানে দেখি রাস্তার ধারে একটা গোরুর গাড়ি। তার একটা গোরু পা গুটিয়ে মাটিতে বসে-বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, অন্য গোরুটা তার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে জাবর কাটছে।

সত্যি-সত্যি সে গোরু কিছুতেই উঠল না। তখন ঘনশ্যাম পাঁচু-মামাকে আর আমাকে জিনিসপত্রসুদ্ধু গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে সেই গোরুটার জায়গায় নিজেই গাড়ি টানতে শুরু করে দিল। গাড়ি অমনি চলতে লাগল।

স্টেশন ছাড়িয়েই ডানহাতে পুরনো গোরস্থান। সেখানটাতে আবার মস্ত-মস্ত ঝুলো-ঝুলো পাতাওয়ালা উইলোগাছ জমাট অন্ধকার করে রয়েছে। সেখানে পৌঁছতেই পাঁচুমামা ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে ইংরিজিতে বলল, "এখানে সব সিপাই বিদ্রোহের সময়কার কবর আছে।" অমনি ঘনশ্যাম গাড়ি থামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "ইংরিজিতে সব ভূতের গল্প বললে ভালো হবে না পাঁচুদাদা। এইখানেই গাড়ি নামিয়ে চম্পট দেব বলে রাখলাম।"

পাঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে ভূতের গল্প নয় রে ঘনশ্যাম। কবরের কথা বলছিলাম।" ঘনশ্যাম আরো বিরক্ত হয়ে বলল, "ভূতের কথা নয় মানে? কবর আর ভূত কি আলাদা? ইংরিজি জানি না বলে কি তোমাদের চালাকিগুলোও ধরতে পারব না নাকি! না পাঁচুদা, আমার পোষাবে না।" বলেই ঘনশ্যাম গাড়িটা দুম্ করে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

এমন সময় খটাখট্-খটাখট্ শব্দ করে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে উপস্থিত। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম সাদা ফ্যাকাশে মুখ করে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক জ্বল্‌জ্বলে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

পাঁচুমামা তখুনি হাত-পা ছুঁড়ে মূর্ছা গেল।

ঘনশ্যাম বললে, "ইয়াকি ভালো লাগে না পাচুদাদা।" বলে আবার গাড়ি টানতে শুরু করল। পাঁচুমামাও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উঠে বসল। অনেক রাতে মামাবাড়ি পৌঁছলাম। মনে পড়ল পদিপিসীও এমনি দুপুর রাতে রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর বাড়ি থেকে ফিরেছিলেন। সত্যি, বর্মিবাক্সটা গেল কোথায়? পাঁচুমামাকে জিগ্‌গেস করলাম, "হাত থেকে পড়ে-টড়ে যায় নি তো?"

পাঁচুমামা দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে বলল, "স্‌স্‌ চুপ, এটা শত্রুর আস্তানা। বুক থেকে হৃৎপিণ্ড উখড়ে নিলেও পদিপিসীর বর্মিবাক্সর নাম মুখে আনবি না।"

গাড়িবারান্দার নীচে গোরুর গাড়ি নামিয়ে ঘনশ্যাম সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ঘরের মধ্যে থেকে প্যাঁচা, ফিঙে, নটবর, খেন্তি, পেঁচী, ইত্যাদিরা সব বেরিয়ে এল মজা দেখবার জন্যে। কিন্তু গাড়ি থেকে লটবহর নামাতে কেউ সাহায্যও করল না। পাঁচুমামাও নেমেই কোথায় জানি চলে গেল। শেষ অবধি আমি মনে-মনে ভারি রেগে জিনিসপত্র দুমদাম করে মাটিতে ফেলতে লাগলাম। সেই দুমদাম শুনে দিদিমা বেরিয়ে এসে আমাকে চুমুটুমু খেয়ে একাকার। দিদিমা আমাকে সেজ-দাদামশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

দেখলাম সেজ-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্যি টেরিকাটা চুল নিয়ে ইজিচেয়ারে বালাপোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ভিতর ধ্বক্‌ করে টের পেলাম শত্রু নম্বর ওয়ান! সেজ-দাদামশাইকে প্রণাম করতেই একটু মুচকি হেসে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "হুঁ!"

ভীষণ রাগ হল। রেগে-মেগে দিদিমার সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়ে আমার দাদামশাই যে বড় পিঁড়িতে বসতেন তাতে আসন হয়ে বসে লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফুলকপির-ডালনা, চিংড়িমাছের মালাইকারি, চালতার অম্বল, রসগোল্লার পায়েস, এক নিশ্বেসে সমস্ত রাশি-রাশি পরিমাণে খেয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ হলে দেখলাম পাঁচুমামাও কোন সময় আমার পাশে বসে খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

দু-একবার তাকালাম। পাঁচুমামার ভাবখানা যেন আমায় চেনেই না। তখন আমার ভারি দুঃখ হল। পাঁচুমামাও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু হাত ধোবার সময় কানের কাছে মুখ এনে
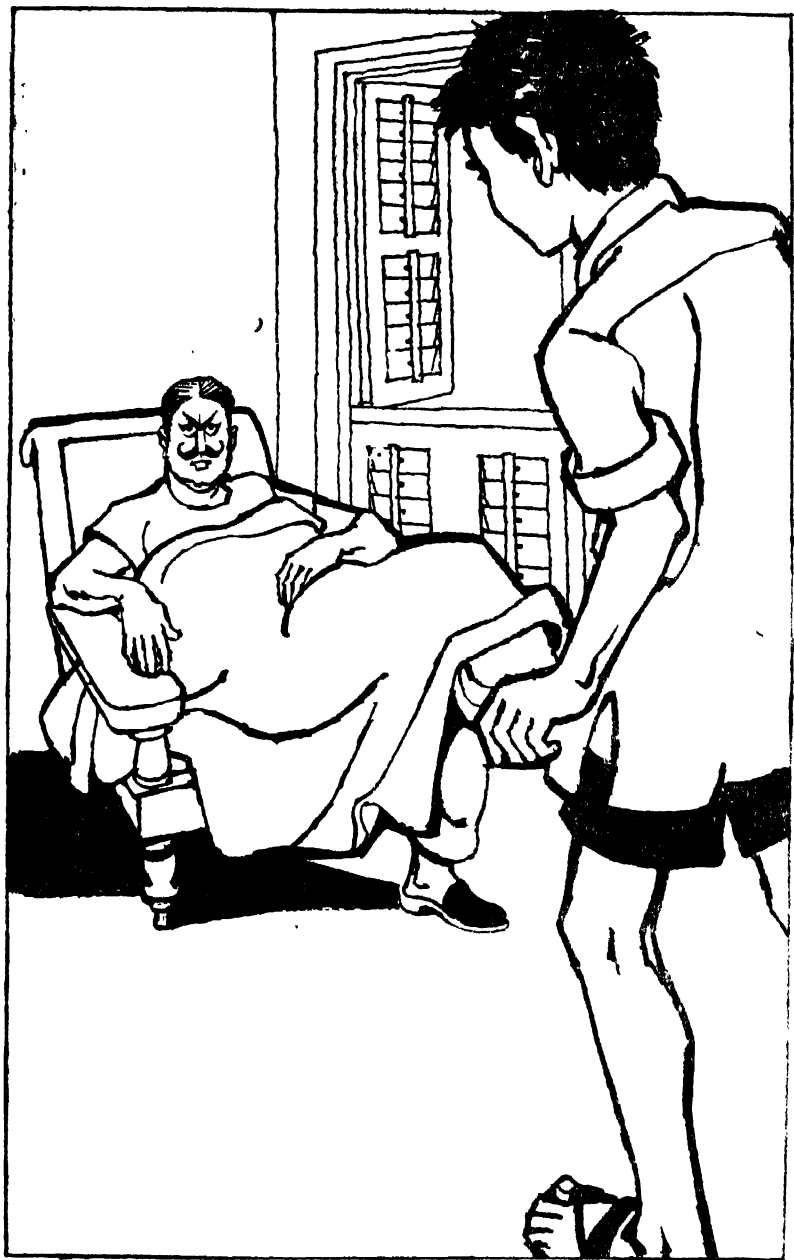
সেজ-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোফ, হিংস্র চোখ, ইজিচেয়ারে বালাপোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "দুজনে বেশি ভাব দেখালে মতলব ফেঁসে যাবে। ওল্ড লেডি নম্বর ওয়ান স্পাই।" আমি একটু আপত্তি করতে গেলাম, কারণ দিদিমাকে আমার ভালো লাগছিল।

পাঁচুমামা বলল, "চোপ্‌, আমার খুড়ি আমি চিনি না।"

পুরনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, হাতে মোমবাতি নিয়ে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় বিশাল এক শোবার ঘরে শুতে গেলাম। কতরকম কারু-কার্য করা ভীষণ প্রকাণ্ড আর ভীষণ উঁচু এক খাটে শুলাম। সেটা এমনি উঁচু যে সত্যিকারের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠলাম। খাটের উপর আবার দু-তিনটে বিশাল-বিশাল পাশবালিশ। আর খাটের নীচে মস্ত-মস্ত কাঁসা-পেতলের কলসি-টলসি কি সব দেখতে পেলাম। দিদিমা একটা রঙচঙে জলচৌকির উপর মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে আমাকে বেশ ভালো করে ঢাকা দিয়ে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ টপ করে ঘুমিয়ে পড় তো মানিক। আমি খেয়ে এসে তোমার পাশে শোব। কাল তোমাকে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর গল্প বলব। একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না তো?" পদিপিসীর নাম শুনে আমার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। মুখে বললাম, "আলোটা রেখে যাও, তা হলে কিচ্ছু ভয় পাব না।" দিদিমা আদর করে চলে গেলেন। পাঁচুমামা কেন বলল স্পাই নম্বর ওয়ান!

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল দেখি ভোর হয়ে গেছে। দিদিমা কখন উঠে গেছেন। আমিও খচ্‌মচ্‌ করে খাট থেকে নেমে আস্তে-আস্তে গিয়ে ঘরের সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়ালাম। দেখি ফুলবাগান থেকে, আর তার পেছনে আমবাগান থেকে কুয়াশা উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেইজন্যেই হোক, কিংবা আম-গাছতলায় যা দেখলাম সেইজন্যেই হোক, আমার সারা গা সির্‌সির্‌ করে উঠল। দেখলাম ছাইরঙের পেণ্টেলুন আর ছাইরঙের গলাবন্ধ কোট পরে মুখে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাই-না দেখে আমার টনসিল ফুলে কলাগাছ!
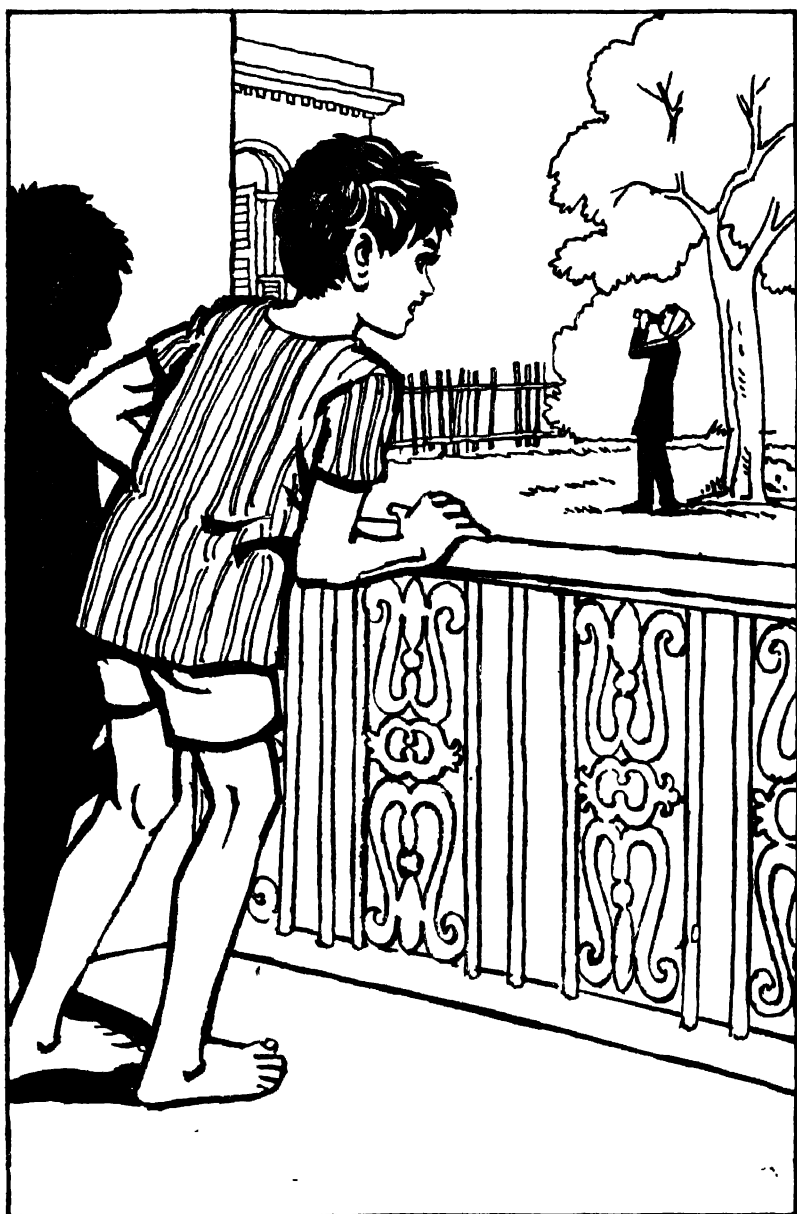
মুখে-মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন।

এমনি সময় সুট্‌ করে সে আমগাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল আর ভোরবেলাকার প্রথম সূর্যের আলো এসে বাগান ভরে দিল। ফিরে দেখি আমার পাশে লাল নীল ছককাটা লুঙি আর সবুজ কম্বলের ড্রেসিং-গাউন পরে আম-কাঠির দাঁতন চেবাতে-চেবাতে সেজ-দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সেজ-দাদামশাই বললেন, "জানিস, এই বারাণ্ডাটাতে আমার ছোট-কাকা কত কি করিয়েছিলেন! বিলেত থেকে ছোটকাকা ভীষণ সাহেব হয়ে ফিরলেন। ঘাড়-ছাঁট চুল, কোটপ্যাণ্ট পরা, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট, কথায়-কথায় খারাপ কথা। ক্রমেই বললেন, 'আমি মেম আনব, বিলেতে সব ঠিক করে রেখে এসেছি। এই দোতলার উপর শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা এক বাথরুম বানাব, লম্বা বারাণ্ডাটা তো আছেই, তার এক কোণ দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বানাব। সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ঐ সিঁড়ি বেয়ে জমাদার ওঠানামা করবে। নইলে মেম আসবে না বলেছে।' তাই-না শুনে আমার ঠাকুমা-পিসিমা আর জেঠিমারা হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, 'অমা! সে কি কথা গো! মেমদের যে লাল চুল, কটা চোখ, ফ্যাকশা রঙ আর মড়াখেকো ফিগার হয়। কি যে বলিস তার ঠিক নাই, মেমরা যে ইয়েটিয়ে পর্যন্ত খায় শুনেছি!' ছোটকাকা বিরক্তমুখ করে বললেন, 'অবিশ্যি তোমরা যদি চাও যে আমি সন্নিসী হই, তা হলে আমার আর কিছুই বলবার নেই। বল তো নাগা সন্নিসীই হই, মেমেও দরকার নেই, নতুন স্যুটগুলোতেও দরকার নেই!' তাই শুনে ঠাকুমারা সবাই আরো চ্যাচামেচি শুরু করে দিলেন। কিন্তু ভয়ে ঠাকুর্দার কানে কেউই কথাটা তুললে না। ছোট-কাকাও সেই সুযোগে মিস্ত্রি লাগিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফেললেন। ঐখানে রেলিং কেটে সিঁড়ি বসানো হয়েছিল। দোতলা থেকে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি একটা ছিলই, বাঁদর তাড়াবার জন্যে, তারই ঠিক নীচে দিয়ে নতুন সিঁড়ি হল। এখন খালি বাথরুম বানানো আর জমাদারের পাগড়ি কেনা বাকি রইল। ঠাকুর্দার কাছে কী ধরনের মিথ্যে কথা বলে টাকা বাগানো যায় দিনরাত ছোটকাকা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন। এদিকে পাড়ার চোররাও সুবিধে পেয়ে রোজ রাত্রে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে শুরু করে দিল! তাদের জ্বালায় ঘুমোয় কার সাধ্যি! শেষটা একদিন ঠাকুর্দার ঘুম

ভেঙে গেল, গদা হাতে করে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন, চোররাও সিঁড়ি দিয়ে ধপ্‌ধপ্ নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। চাঁদের আলোয় ঠাকুর্দা অবাক হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর আস্তে-আস্তে আবার শুতে গেলেন। পরদিন সকালে উঠেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ঐ সিঁড়ি খুলিয়ে ফেললেন। রাগের চোটে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়িটা অবধি খুলিয়ে দিলেন। কাটা রেলিং ফের জোড়া দেওয়ালেন। আর ছোটকাকাকে ডেকে বললেন, 'পানুর ছোটমেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। টোপর পরে প্রস্তুত হও।' শেষটা ঐ পানুর ফর্সা মোটা গোলচোখো বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ছোটকাকার বিয়ে হয়ে গেল। এবং বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তারা সারাজীবন পরম সুখে কাটাল। পাঁচুটা তো ওঁরই নাতি। এই রে, ঘনশ্যাম আবার আমার ঈশপগুল. নিয়ে আসছে। বলিস যে আমি বেরিয়ে গেছি।" বলেই সেজ-দাদামশাই হাওয়া।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ছাদ পর্যন্ত বাঁদর তাড়াবার সিঁড়ির খাঁজগুলো দেওয়ালের গায়ে কাটা-কাটা তখনো রয়েছে।

সব পুরনো বাড়ির মতন মামাবাড়ির ঘরগুলো বিশাল-বিশাল, সিঁড়িগুলো মস্ত-মস্ত, বারাণ্ডাগুলোর এ মাথা থেকে ডাকলে ও মাথা থেকে শোনা যায় না। আর দুপুরে সমস্ত বাড়িখানা অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল। পাঁচুমামার টিকিটি সকাল থেকে দেখা যায় নি। নেহাত আমার সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছিল, নইলে ও যে জন্মেছে তারই কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাড়িসুদ্ধু কেউ ওর নাম করল না। দুপুরে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর সন্ধান নিচ্ছি এমন সময় কানে এল খুব একটা হাসি-গল্পের আওয়াজ।

রান্নাঘরে আনন্দ কোলাহল। এমন কথা তো জন্মে শুনি নি। অবাক হয়ে এগিয়ে-বাগিয়ে চললাম। বারাণ্ডার বাঁকে ঘুরেই দেখি চাকর-বাকররা বিষম ঘটা করে অতিথি-সৎকার করছে। কে একটা রোগা লোক ঠ্যাং ছড়িয়ে বামুনঠাকুরের উঁচু জলচৌকিতে বসে রয়েছে। চার দিকে পানবিড়ি আর কাঁচি সিগারেটের ছড়াছড়ি। বামুনদিদি পর্যন্ত ঘোমটার মধ্যে বিড়ি টানছে। ঘনশ্যামট্যাম সবাই উপস্থিত আছে, পান খেয়ে-খেয়ে সব চেহারা বদলে ফেলেছে।

আমার পায়ের শব্দ পেয়েই নিমেষের মধ্যে রান্নাঘর ভোঁভাঁ, কে যে

কোথায় চম্পট দিল ঠাওরই করতে পারলাম না। চোখের পাতা না ফেলতেই দেখি কেউ কোথাও নেই, খালি বামুনদিদি ঘোমটার ভিতরে হাই তুলছে এবং বিড়িটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত গোপন করে ফেলেছে! কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখ এড়াতে পারে নি। ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক। ভাবতে-ভাবতে গা শিউরে উঠল! এতদূর সাহস যে ভোরবেলা দুরবীন দিয়ে পরখ করে নিয়ে দুপুর না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁদিয়েছে! চুলগুলো আমার সজারুর কাঁটায় মতন উঠে দাঁড়াল। বামুনদিদিকে জিগ্‌গেস করলাম, "কে লোকটা?" বামুনদিদি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"কোন লোকটা খোকাবাবু? তুমি-আমি ছাড়া আর তো লোক দেখছি না কোথাও!" বলেই সে সরে বসল, অমনি তার কোলের মধ্যে কতকগুলো রুপোর টাকা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। বুঝলাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করেছে! কি ভীষণ!

এদিকে পাঁচুমামার সঙ্গে পরামর্শ করব কি! সে যে সকাল থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার আর কোনো পাত্তাই নেই! একবার কি একটা গুজব শুনেছিলাম নাকি ভুলে বেশি জোলাপ খেয়ে ফেলেছে। তবুও তখুনি তার খোঁজে বেরুলাম। চার-পাঁচটা ভুল দরজা খুলে চার-পাঁচবার তাড়া খাবার পর দেখি পুবদিকের ছোট ঘরে তক্তপোশের ওপর শুয়ে-শুয়ে পাংশুপানা মুখ করে পাঁচুমামা পেটে হাত বুলচ্ছে। আমাকে দেখেই বিষম বিরক্ত হয়ে নাঁকিসুরে বলল, "কেন আঁবার বিরক্ত কঁরতে এঁসেছ। যাঁও না এঁখান থেঁকে।" আমি বললাম, "চার দিকে যেরকম ষড়যন্ত্র চলেছে এখন আর তোমার আরাম করে শুয়ে-শুয়ে পেটে হাত বুলনো শোভা পায় না! এদিকে শত্রু এসে ঢুকেছে সে খবর রাখ কি?" পাঁচুমামা কোথায় আমাকে হেল্প করবে, না তাই-না, শুনে এমনি ক্যাঁও-ম্যাঁও শুরু করে দিল যে আমি সেখান থেকে যেতে বাধ্য হলাম!

সারাদিন ভেবে-ভেবেও একটা কূলকিনারা করতে পারলাম না। রাত্রে দিদিমা পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলতে-বুলতে বললেন, "বলেছিলাম তোকে পদিপিসীর বর্মিবাক্সের গল্প বলব, তবে শোন।"

দিদিমা সবুজ বালাপোশ ভালো করে জড়িয়ে গালের পান দাঁতের

পেছনে ঠুসে গল্প বলবার জন্যে রেডি হলেন। আর আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। দিদিমা বলতে লাগলেন, "পদিপিসীর ইয়া ছাতি ছিল, ইয়া পাঞ্জা ছিল। রোজ সকালে উঠে আধ সের দুধের সঙ্গে এক পোয়া ছোলা ভিজে খেতেন। কি তেজ ছিল তাঁর। সত্যি মিথ্যে জানি না, শুনেছি একবার একটা শামলা গোরু হাম্বা-হাম্বা ডেকে ওঁর দুপুরের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিল বলে উনি একবার তার দিকে এমনি করে তাকালেন যে সে তিনদিন ধরে দুধের বদলে দই দিতে লাগল। পদিপিসী একবার শীতকালে গোরুর গাড়ি চেপে কাউকে কিছু না-বলে রমাকান্ত নামে একটিমাত্র সঙ্গী নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন ফিরে এলেন দুপুর-রাত্রে। এসেই মহা হৈ-চৈ লাগালেন কি একটা নাকি বর্মিবাক্স হারিয়েছে। সবাই মিলে নাকি দেড়বছর ধরে ঐ বাক্স খুঁজেছিল। কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ চোখে দেখে নি সে বাক্স। শেষপর্যন্ত সে পাওয়াই গেল না!" আমি নিশ্বেস বন্ধ করে বললাম, "তাতে কী ছিল?"

দিদিমা বললেন, "কে জানে! মসলা-টসলা হবে। ঐ পদিপিসীর একটিমাত্র ছেলে ছিল, তার নাম ছিল গজা। কালো রোগা ডিগ্‌ডিগে, এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া তেল-চুকচুকে চুলে টেরি বাগানো। দিন-রাত কেবল পান খাচ্ছে আর তামাক টানছে। পড়াশুনো কি কোনো-রকম কাজকর্মের নামটি নেই। সারাদিন গোলাপি গেঞ্জি আর আদ্দির ঝুলো পাঞ্জাবি পরে পাড়াময় টোটো কোম্পানি। সখের থিয়েটার, এখানে-ওখানে আড্‌ডা। অথচ কারু কিছু বলবার জো নেই, পদিপিসী তা হলে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

"জানিস তো ভালো লোকের কখনো ভালো হয় না। যত সব জগতের বদমায়েস আছে সবাই সুখে জীবন কাটিয়ে যায়। গজারও তাই হল। যখন আরো বড় হল, গাঁজা গুলি খেতে শিখল, জুয়োর আড্‌ডায় গিয়ে জুটল। মাঝে-মাঝে একমাস-দুমাস দেখা নেই। আবার একগাল পান নিয়ে হাসতে-হাসতে ফিরে আসে। পদিপিসী যেখান থেকে যেমন করে পারেন টাকা জোগান। পাজি ছেলেকে পায় কে!

"হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে। কথায়-কথায় বাড়িসুদ্ধু সবাইকে পাঁঠার মাংস খাওয়ায়, ঝুড়ি-ঝুড়ি সন্দেশ আনে। একবার

সমস্ত চাকরদের গরম বেনিয়ান কিনে দিল। ঘোড়ার গাড়ি কিনল, হীরের আংটি কিনল। বাড়িসুদ্ধু সবাই থরহরি কম্পমান! কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায়! পদিপিসী অবধি চিন্তিত হলেন। অথচ চুরি-ডাকাতি করলে তো এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিত! টাকা ভালো, কিন্তু পায় কোথা?"

গজার উপাখ্যান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাই নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুনতে পেলাম পাহাড়ে-পাশবালিশটার আড়ালে দিদিমা আস্তে-আস্তে নাক ডাকাচ্ছেন! আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। তার পর শুনলাম দূরে হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে, আর মাথার উপর পুরনো কাঠের কড়িগুলো মট্‌মট্‌ করে মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম এ-সবের জন্যে ঘুম ভেঙে যায় নি। যার জন্যে ঘুম ভেঙেছে সে নিশ্চয় আরো লোমহর্ষক। শুয়ে-শুয়ে যখন শুয়ে থাকা অসহ্য হল, পা সির্‌সির্‌ করতে লাগল, আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জল না খেয়ে আর এক মিনিটও থাকা অসম্ভব হল, আস্তে-আস্তে খাট থেকে নামলাম। আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বাইরে প্যাসেজে দাঁড়ালাম। ঐ একটু দূরে সারি সারি তিনটে কলসিভরা জল রয়েছে, কিন্তু মাঝখানের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারটুকু পেরোতে ইচ্ছা করছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ পায়ের গুলিটা চুলকোচ্ছি আর মন ঠিক করছি এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

কি আর বলব! হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। যেদিকে শব্দ সেদিকে সেজ-দাদামশাইয়ের ঘর। কল্পনা করতে লাগলাম দাঁত দিয়ে ছোরা কামড়ে ধরে হাত দিয়ে সিঁদ কাটতে-কাটতে, কানে মাকড়িপরা, লাল নেংটি, গায়ে তেল-চুকচুকে সব চোর-ডাকাতেরা সেজ-দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে ওঁর হাতবাক্স সরাচ্ছে, রুপোর গড়গড়া নিচ্ছে, মখমলের চটি পায়ে দিচ্ছে!

এমন সময় ঠুস্‌ করে সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল আর বিড়ি ধরাতে-ধরাতে যে বেরিয়ে এল বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিনলাম সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক—বগলে জুতো নিয়ে পা টিপে-টিপে এগুচ্ছে।

আমার তো আর তখন নড়বার-চড়বার ক্ষমতা ছিল না তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। লোকটা কিন্তু কি-একটা পেরেকে না কিসে হোঁচট খেয়ে 'দুর শালা!' বলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটু বাদেই নীচের তলায় একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম।

এতক্ষণে আমার চলবার শক্তি ফিরে এল, ভাবলাম জল খেয়ে কাজ নেই। ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক। একবার বেরুল চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক, এর পরে হয়তো বেরুবে দামড়া ডাকাত। ফিরতে যাব এমন সময় একটা সাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে সবেমাত্র পকেটে পুরেছি এমন সময় আবার সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল এবং এবার স্বয়ং সেজ-দাদামশাই বেরিয়ে এসে টর্চ হাতে নিয়ে আঁতিপাতি করে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। আমি তো এদিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। ধরে ফেললে কী যে হবে ভাবা যায় না! এমন সময় সেই একই পেরেকে না কিসে হোঁচট খেয়ে সেজ-দাদামশাইও হাত-পা ছুঁড়ে কত কি যে বললেন তার ঠিক নেই। ভালোই হল, আমাকে দেখবার আগেই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘরে ফিরে গিয়ে বোধ হয় কিছু লাগালেন-টাগালেন।

আমি যে কি ভাবব ঠাওর করতে না-পেরে খানিকটা জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। পকেটে কাগজটা কর্‌কর্‌ করতে লাগল, কিন্তু দিদিমা আলো নিভিয়ে দিয়েছেন, পড়বার উপায় নেই। রঙ-চঙে চৌকির উপর রোজকার মতন আজও দেশলাই মোমবাতি রাখা ছিল, কিন্তু সব জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে আর জ্বাললাম না। সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা করতে-করতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম পদিপিসী এসে পেছনের বারাণ্ডার দরজা থেকে আমাকে ডাকছেন। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, থান পরা, ছোট করে চুল ছাঁটা, কপালে চন্দন লাগানো—অবিকল পাঁচুমামা যেমন বলেছিল। এক হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে ডাকছেন, আর অন্য হাতটা পেছনে রেখেছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, "বাক্স পেয়েছিস?" আমি বললাম, "কই না তো! নিমেষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে

একবছর ধরে খুঁজে-খুঁজেও পাওয়া যায় নি, আমার আশা আছে যে আমি দুদিনেই খুঁজে দেব? কোথায় রেখেছিলে?"

পদিপিসী বললেন, "ভালো করে খুঁজে দেখ। পেলে তুইই নিস। পাঁচুটা একটা ইডিয়ট, জোলাপের পর্যন্ত ডোজ ঠিক করতে পারে না, তুইই নিস। বাক্সের মধ্যে লাল চুনীর কানের দুল আছে, তোর মাকে দিস। আর দেখ, ঐ ব্যাটা চিম্‌ড়েটাকে আর ঐ বুড়োটাকে একেবারে কাইণ্ড অফ বোকা বানিয়ে দিস। বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনো অভাব নেই, জুড়িগাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে, গাঁজার ব্যবসা করেছে। আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠদের কী গতি হবে?" বলে আমাকে চুমু খেয়ে পদিপিসী ছোটকাকার তৈরি সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চললেন, এবং পেছন ফিরতেই দেখলাম যে হাতটা পেছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত এক গদা!

গদা দেখে এমন চমকে গেলাম যে ঘুমই ভেঙে গেল। দেখলাম সকালবেলার রোদ পেছন দিকের বারাণ্ডা দিয়ে ঘরে এসে বিছানা ভরে দিয়েছে। কাটা সিঁড়ির দাগটা চকচক করছে। হঠাৎ কেন জানি মনে হল সিঁড়িটা একটা ভারি ইম্‌পরট্যাণ্ট জিনিস।

এই তো সুবর্ণ সুযোগ সেই গোপন চিঠি পড়বার। পকেট থেকে বের করে দেখলাম লাল কালিতে লেখা—শ্রীযুতবাবু বিপিন বিহারী চৌধুরীর কাছ হইতে ২০০্ পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা।

পুঃ সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।

অবাক হয়ে ভাবছি সেজ-দাদামশাই কী উদ্দেশ্যে চিম্‌ড়েকে টাকা দিলেন, কী অনুসন্ধান? এ বিষম সন্দেহজনক! এমন সময় দরজা খুলে পাঁচুমামা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকেই দুম্ করে দরজা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়ালমাছের মতন হাঁপাতে লাগল। মুখটা দেখলাম আগের চাইতেও সাদা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে বললাম, "কী হয়েছে পাঁচুমামা? আবার জোলাপ খেয়েছ?"

পাঁচুমামা শুকনো ঠোঁট আরো শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা করে বলল, "খেন্তিপিসী এসেছে।"

আমি বললাম, "খেন্তিপিসীটা আবার কে ?"

পাঁচুমামা আমসি হেন মুখটি করে বলল, "পদিপিসী দি সেকেণ্ড !"

চিঠিটা পাঁচুমামার নাকের সামনে নেড়ে বললাম, "ও-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না মামা। স্বয়ং সেজ-দাদামশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন, এই দেখ তার প্রমাণ!" পাঁচুমামা চোখ গোল-গোল করে চিঠিটা সবে পড়তে যাবে এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দরজা গেল খুলে, আর সত্যি বলছি, অবিকল আমার সেই স্বপ্নে দেখা পদিপিসীর মতন কে একজন তোলোহাঁড়ির মতন মুখ করে ভিতরে এলেন। বুঝলাম, ঐ খেন্তিপিসী। পাঁচুমামা দরজার ঠেলা খেয়ে ছিট্‌কে আমার খাটের উপর পড়েছিল, সেখান থেকে সরু গলায় চেঁচিয়ে বলল, "কী করতে পার আমার তুমি ? এমন কোনো স্ত্রীলোক জন্মায় নি যাকে আমি ভয় পাই। জানো আমার বুকের মধ্যে সিংহ—" এইটুকু বলতেই খেন্তিপিসী কোমরে কাপড় জড়িয়ে খাটের দিকে একপা এগুলেন আর পাঁচুমামাও অন্যদিক দিয়ে টুপ্ করে নেমে খাটের তলায় অগুনতি হাঁড়ি-কলসির মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

খেন্তিপিসী তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন, আমার হাত এমনি কাঁপতে লাগল যে চিঠিটা খড়্‌মড়্‌ খড়্‌মড়্‌ করে উঠল। তাই শুনে খেন্তিপিসী এমনি চমকালেন যেন বন্দুকের গুলি শুনেছেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কথা বলবার আগেই সেজ-দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। খেন্তিপিসীকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আ খেন্তি, তুই আবার এখানে কেন ?"

খেন্তিপিসী চায়না ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের চোখ দুটো আমার ওপর থেকে সরিয়ে বরফের মতন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কেন, তোমার কি তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে ? পুজোর সময় একটা কাঁচকলাও দিলে না, আমার ভজাকে যে কাপড় দিলে সেও অতি খেলো সস্তা রাবিশ। বাপের বাড়ি থেকে কলাটা-মুলোটা দূরে থাকুক কচুটারও মুখ দেখি না। তাই বলে বৌদির ঘরের কোনায়ও একটু জায়গা হবে না ?"

পাঁচুমামা এখানে দুটো হাঁড়ির মাঝখান দিয়ে মুণ্ডু বের করে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলল, "জায়গা হবে কি না হবে তাতে তো তোমার ভারি বয়ে
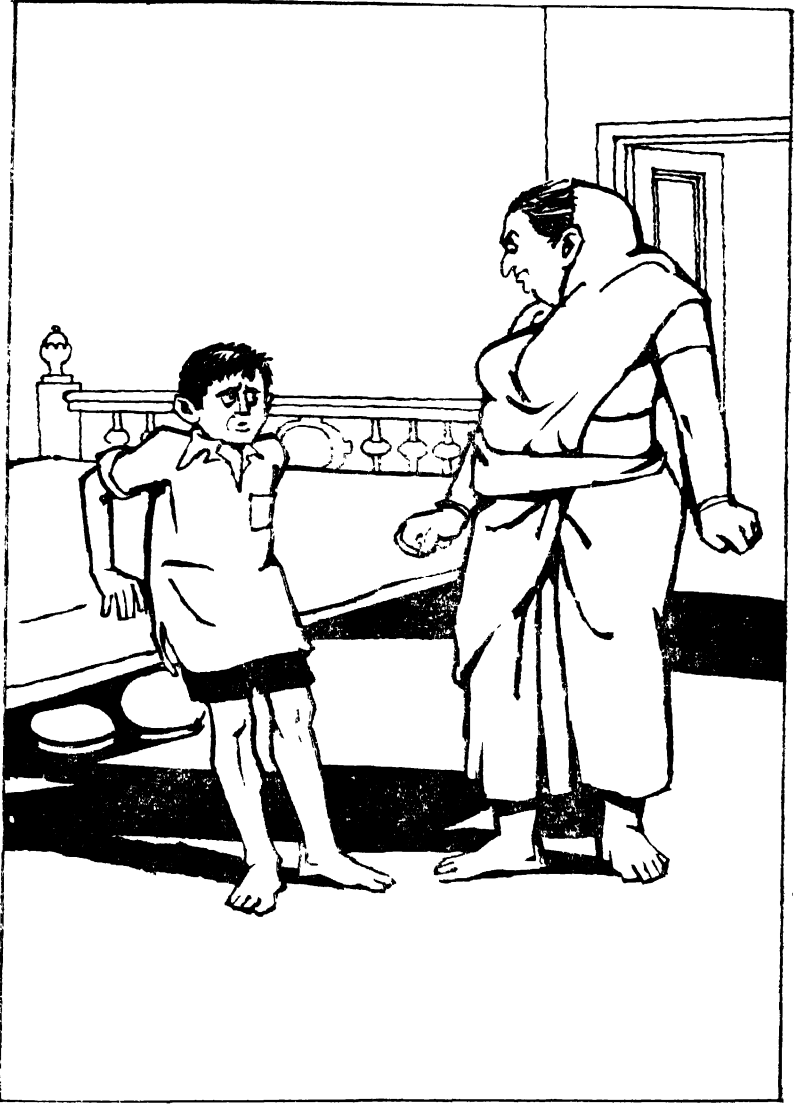
খেন্তিপিসী আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন।

গেল! এই ভরসকালে আমার ঘরেই-বা তোমার কত জায়গা—"
বলেই কচ্ছপের মুণ্ডুর মতন সুট্ করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেজ-দাদামশাই এবার গলা পরিষ্কার করে পাঁচুমামাকে তাড়া দিয়ে বললেন, "এই পাঁচু হতভাগা, বেরিয়ে আয় বলছি। আমার একটা ইম্‌পরট্যাণ্ট কাগজ হারিয়েছে, খুঁজে দে বলছি, নইলে ভালো হবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে খেন্তিপিসীও বললেন, "বেরো এক্‌খুনি। তুইই নিশ্চয় আমার স্যুটকেশ থেকে বাড়ির নক্‌শাটা সরিয়েছিস। বেরো বলছি। তোকে আমি সার্চ করবই করব। না বেরোলে ঐ খাটের তলায় সেঁদিয়েই সার্চ করব। আমি জানি না তোদের সব চালাকি! পদিপিসীর বাক্সর জন্যে তোরাও ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিস! অথচ বাক্সতে আর কারো অধিকার নেই। ওটা স্ত্রীধন, ওটা আমি পাব!" সেজ-দাদামশাই রেগে বললেন, "তুই পাবি মানে? তোর ভজার পেটে যাবে বল! আমি আইন পাস করেছি, তা জানিস? কেউ যদি পায় তো আমি পাব। জানিস আমি দুশো টাকা খরচ করে ডিটেকটিভ লাগিয়েছি। ও বাক্স আমি বের করবই!"

এইবার দরজার কাছ থেকে একটা নরম কাশির শব্দ শোনা গেল। দেখলাম চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক সেখানে কালো আলস্টার পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন। বিড়িটা এবার বের করে বললেন, "মনে থাকে যেন তিনভাগের একভাগ আমার! যদি বাক্স পান আমার অদ্ভুত বুদ্ধির সাহায্যেই পাবেন।"

খেন্তিপিসী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন খাটের তলা থেকে পাঁচু-মামার ঠ্যাং দুটো অসাবধানতাবশত একটুখানি বেরিয়ে রয়েছে। আর যায় কোথা, নিমেষের মধ্যে হিড়্‌হিড়্ করে টেনে পাঁচুমামাকে বের করে এনে দুই থাপ্পড় লাগালেন, তার পর বুকপকেট থেকে একটা মোটামতন কাগজ টেনে বের করে বললেন, "তবে না নক্‌শা নিস নি!"

তার পর কাগজটা খুলে বললেন, "ইস্, দেখেছ সেজদা, ব্যাটাছেলে সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছে!"

সেজ-দাদামশাইও অমনি বললেন, "কই দেখি-দেখি!"

চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও এগিয়ে বললেন, "মানুষ হওয়াই একরকম অসম্ভব!"

পাঁচুমামা তখন একদৌড়ে আবার খাটের তলায় ঢুকল এবং এবার

পা গুটিয়ে সাবধানে বসে বলল, "আমার কলেজের পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে তোমাদের কী দরকার শুনি? বিশেষত খেন্তিপিসীর মতন একজন আকাট মুখ্যু স্ত্রীলোকের! নক্‌শা হারিয়েছে! দরকারি কাগজ হারিয়েছে! তাই আমার ওপর হামলা! আর ঐ ইজের-পরা ছোকরার হাতে যে কাগজটা আছে সেটা কী?"

পাঁচুমামার কাছে আমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা আশা করি নি! কিন্তু তখন দেখলাম আপত্তি-টাপত্তি করবার সময় নেই। দেখলাম খেন্তিপিসী, সেজ-দাদামশাই আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক নিজেদের ঝগড়া ভুলে, পাঁচুমামার সংস্কৃতের নম্বর ভুলে, গোল হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন! শুনতে পেলাম ফোঁস্-ফোঁস্ করে ওঁদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে! বুঝলাম বিপদ সন্নিকট!

হঠাৎ 'ও দিদিমা' বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমার পেছনের দরজা দিয়ে বারাণ্ডায় উপস্থিত হলাম। বুঝলাম দেয়ালে সিঁড়ির খাঁজকাটার কাজ শেষ হয় নি! নিমেষের মধ্যে খাঁজের মধ্যে মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুঁজে গুঁজে একেবারে ছাদে উপস্থিত হলাম। এবার আমি নিরাপদ, যদিও আমি এখন অবধি চা পাই নি তবু নিরাপদ! আমি ছাদে শুয়ে খুব খানিকটা হাপরের মতন হাঁপিয়ে নিলাম। আমি জানি ওদের কারু সাধ্য নেই ওপরে ওঠে!

আস্তে-আস্তে রোদ এসে ছাদটাকে ভরে দিল। আমার পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইতে লাগল। দেখলাম ছাদে রাশি-রাশি শুকনো পাতা জমেছে কত বছর ধরে কে বা জানে। শুনলাম কত-কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বকবকম করছে। দেখলাম বাড়ির সামনের দিকে গম্বুজের মতন করা, তাতে খোপ খোপ আছে, পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া-আসা করছে। চার দিক একটা পায়রা-পায়রা গন্ধ! খিদে যে পায় নি তা নয়। তবু যেই মনে হল নীচে সব ওৎ পেতে বসে আছে, নেমেছি কি কপাৎ করে ধরবে, অমনি আর আমার নামবার ইচ্ছে রইল না। দরকার হলে ছাদে শুধু দিনটা কেন, রাতটাও কাটাব স্থির করলাম।

কিছু করবার নেই, কিছু দেখবার নেই। চার দিকে পাঁচিল, ওপরে

আকাশ আর কশো পায়রা কে জানে। শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা নানান সুরে কখনো রেগে চেঁচিয়ে, কখনো নরম সুরে ফুসলিয়ে আমাকে ডাকছে।

আমি সে ডাকের কাছ থেকে যতদূরে পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন পায়রাদের রাজ্যে এসেছি। খোপের ভেতর থেকে দেখলাম কচিকচি লালমুখোরা আমাকে অবাক হয়ে দেখছে, আর তাদের মায়েরা চ্যাঁ-চ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। সারি সারি খোপে শত-শত পায়রার বাসা। চার দিকে পায়রার পালক, পায়ের নীচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সব খোপে পায়রার বাসা, কেবল এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া।

তখন আমার গায়ের লোমগুলি খড়্‌খড়্‌ করে একটার পর একটা উঠে দাঁড়াল আর পা দুটো তুলতুলে মাখনের মতন হয়ে গেল, কানের মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম শোঁ-শাঁ করে সমুদ্রের শব্দ। যে আমি কোনোদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশি পেলাম না, সেই আমি কি তবে আজকে একশো বছর ধরে কেউ যা পায় নি সেই খুঁজে পাব?

খট্‌ করে হাঁটু দুটো ফের শক্ত হয়ে গেল আর আমি তর্‌তর্‌ করে গম্বুজের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চার দিকটা গোলপানা বটে কিন্তু মাঝখানটা ফোঁপরা, কেমন একটু ভিজে ভিজে গন্ধ, আর ভিতরের দেয়াল কেটে লেখা খোঁচাখোঁচা হরফে—

"ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়।"

ধপাস্‌ করে লাফিয়ে পড়লাম ওর ভেতরে। দেখলাম গম্বুজের গায়ে কুলুঙ্গির মতন ছোট্ট তাক করা আছে, বোধ হয় তারই বাইরের দিকটাতে যে খোপ আছে তাতেই জায়গার অভাবে পায়রা বাসা করে নি। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

মাটিতে বসে দুহাত দিয়ে কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে মাঝারি সাইজের একটা বাক্স নামালাম। কি আর বলব! তার রঙ একটুও চটে নি, একেবারে চকচক করছে, আর ঢাকনার উপর আঁকা ড্রাগনের সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কোলের উপর সেই বাক্স রেখে তার ঢাকনা খুলে ফেললাম। উপরে খানিকটা ছেঁড়ামতন হলদে হাতে-তৈরি কাগজ, মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা করে সুতো চালিয়ে কাগজগুলো একসঙ্গে আটকানো, যাকে বলে

বাক্সটা খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

পুঁথি। তার একপৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা, অন্যপৃষ্ঠায় খোঁচা-খোঁচা হরফে গজা কি সব লিখেছে।

সেই পুঁথিও নামালাম। নামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সের মধ্যে আট-দশটা সাদা লাল নীল সবুজ পাথর বসানো আংটি, হার, বালা আর একজোড়া জ্বল্‌জ্বলে লাল চুনী বসানো কানের দুল। বুঝলাম স্বপ্নে পদিপিসী এইটাই আমার মাকে দিতে বলেছিলেন। তাই সেটা তখুনি পকেটে পুরলাম।

তার পর পুঁথিটা খুলে, কি আর বলব, দেখলাম যে শ্রীগজার লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয়। বুঝলাম পুঁথিটা সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দেওয়া দরকার, বাক্সটা দিদিমাকে দেব, যেমন খুশি ভাগ করে দেবেন। তখন আমি ওদের ক্ষমা করলাম। আমাকে গোল হয়ে মিছিমিছি আক্রমণ করার জন্য ওদের ওপর একটুও রাগ রইল না।

বাক্সটা নিয়ে সে যে কত কষ্ট করে দেয়াল বেয়ে গম্বুজের মাথায় উঠলাম, আবার দেয়াল বেয়ে বাইরের দেয়াল দিয়ে নামলাম সে আর কি বলব! তার পর বাঁদর-তাড়ানো সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে নামাটাও প্রায় অমানুষিক কাজ। নেমে দেখি ওরা সবাই চক্রাকারে তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, কিন্তু আমার হাতে ধরা একশো বছর আগে হারানো পদিপিসীর বর্মিবাক্স দেখে সবাই নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি কাউকে কিছু না-বলে দিদিমার হাতে বাক্স দিলাম, আর ঢাকনির তলাটা থেকে হলদে পুঁথি বের করে সেজ-দাদামশায়ের হাতে দিলাম। সেজ-দাদামশাই অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে ওলটাতে লাগলেন। আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও অভ্যাসমতন নিঃশব্দে এগিয়ে ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেজ-দাদামশাই খুব লম্বা আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক খুব বেঁটে হওয়াতে বিশেষ সুবিধে হল না।

হঠাৎ সেজ-দাদামশাই বিষম চমকে উঠে বললেন, "আরে, এ যে বাবার পদিপিসীর ছোটোবোন মণিপিসীর বিয়ের আসন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই পুঁথি! এ কোথায় পেলি! আরে, এ হারানোর ফলেই তো পুরুতঠাকুর ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়েছিলেন, আর তার ফলেই বাবার মণিপিসী আর পিসেমশাই সারাটা জীবন ঝগড়া করে কাটিয়েছিলেন।"

তার পর পাতা ওলটাতেই গজার হাতের লেখা চোখে পড়াতে আরো বিষম চমকে গিয়ে বললেন, "শোনো-শোনো, পদিপিসীর ছেলে শ্রীগজা কী লিখেছে শোনো। আরে, এটা যে একটা ডায়েরির মতন শোনাচ্ছে, না আছে তারিখ, না আছে বানানের কোনো নিয়মকানুন। ব্যাটা সাক্ষাৎ মাসির বিয়ের জায়গা থেকে বিয়ের মন্ত্রের পুঁথি চুরি করে তাতে কী লিখেছে দেখ।

"সোমবার ॥ সর্বনাশ হইয়াছে! মাতাঠাকুরানীর গোরুর গাড়ি উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়া আমার হাতে বমিবাক্স গুঁজিয়া দিয়া মাতাঠাকুরানী সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ও অভ্যাসমতন বাড়িসুদ্ধ সকলকে তাড়নপীড়ন করিতেছেন।

"মঙ্গলবার ॥ আর পারা যায় না। বাক্স আমি কিছুতেই কাহাকে দেব না, স্থির করিয়াছি; অথবা ইহারা যেরূপ খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছে, বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা ছাড়া কোনো উপায় নাই। বগলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

"শুক্রবার ॥ সৌভাগ্যবশতঃ তাড়িওয়ালার বাড়িতে বাক্স লুকাইবার সুবিধা পাইয়াছি। খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইলে বাড়ি আনিব।

"সোমবার ॥ তাড়িওয়ালার সহিত পরামর্শ করিয়া গাঁজার ব্যবসা শুরু করিয়াছি। বিষম লাভ হইতেছে। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরিও করিতে হয়।

"শনিবার ॥ জিনিসপত্র বহু কিনিয়াছি, বহু দানও করিয়াছি। ইহারা জিনিস লয় অথচ আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাই মনে করিয়াছি শহরে বাড়ি কিনিব।

"রবিবার ॥ ঘটনাক্রমে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। এখানেই আমার এই লিপি ও বাকি গুটিকতক অলংকার রাখিলাম। ইহাদের বিবাহাদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবেক। ইতি শ্রীগজা।"

সেজ-দাদামশায় হতাশ গলায় বললেন, "তার পরই বোধ হয় ঠাকুর্দা বাঁদরের সিঁড়ি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, গজার আর কাউকে গয়না উপহার দেয়া হয় নি। শেষে তো সে কলকাতাতেই থাকত শুনেছি। পদিপিসীর ফিক করে হাসারও কারণ বোঝা গেল। তাঁর মতে গজার থেকে বাক্স পাবার যোগ্য পাত্র আর কেই-বা ছিল!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খেন্তিপিসী বললেন, "বাক্সে কী আছে ?"

দিদিমা ঢাকনি খুলে দেখলেন। বললেন, "আমি ভাগ করে দিচ্ছি। খেন্তি, যদিও তুই আমার কাছ থেকে সেবার তিনশো টাকা ধার নিয়ে শোধ দিস নি, তবু এই হারটা তুই নে।" সেজ-দাদামশাইকে বললেন, "ঠাকুরপো, তোমার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো : তুমি এই হীরের আংটি নাও। এটা মেজঠাকুরপোর ছেলেকে দেব ; এটা পাঁচুর ; এটা ন্যাড়ার প্রাপ্য ; এটা পুঁটকি পাবে ; এটা বুঁচকি পাবে ; এই বালা-জোড়া আমার ভাগ, আমার মেয়েকে দেব।" বলে মাকে দেবার জন্য আমার হাতে দিলেন। তার পর সকলের সামনে আমাকে আদর করে বললেন, "বাকি রইল এই পান্নার আংটি, এটা দাদা তোমার, কারণ তুমি খুঁজে না-দিলে এদের দ্বারা হত না। এবার চল দিকিন, কত পুলি বানিয়েছি হাতমুখ ধুয়ে খাবে চল। হ্যাঁ, বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম, মসলা রাখব।"

দিদিমার সঙ্গে চলে যেতে-যেতে শুনলাম খেন্তিপিসী পাঁচুমামাকে বলছেন, "তাকে দিল সাত নহর আর আমার বেলা এক ছড়া !" আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক সেজ-দাদামশাইকে বলছেন, "স্যার, আমার দুশো টাকা?"

বক-বধ পালা

পাত্র-পাত্রী

জুড়ির দল	হিড়িম্বা
নারদ	বক ও অন্যান্য
কুন্তী	রাক্ষসগণ
যুধিষ্ঠির	ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী
ভীম	ও তাঁদের পুত্র-কন্যা
অর্জুন	আঁটলো
নকুল	বাঁটলো
সহদেব	—ব্রাহ্মণবাড়ির চাকর

উ ৎ স র্গ

আমার বড়দা

সুকুমার রায়ের

স্মৃতিতে

বক-বধ পালা

পালা শুরু

জুড়ির সুর করে আবৃত্তি, মৃদু মৃদু তবলা ইত্যাদি সহযোগে

পোড়া জতুগৃহ থেকে বাহিরিয়া যবে,
পাণ্ডব বুঝিলা মনে এ বিশাল ভবে
গৃহ বন্ধু কিছু নেই, নিলা বনবাস ;
দুঃখে কষ্টে বৃক্ষতলে কাটে দিনমাস।
কত যে বিপদ ঘটে, কেবা তাহা কবে,
বাহুবলে ভীমসেন রক্ষা করে সবে।
ঘোর অরণ্যে মারি হিড়িম্ব দুরাচারে,
বাঁচাইলা ভীম চারি ভাই আর মা'রে ;
তার বোন হিড়িম্বারে বিয়া করি তবে,
কিছুদিন থাকে ভীম ছাড়ি আর সবে ;
হিড়িম্বারে ছাড়ি পরে অতি সুখী মনে,
পাণ্ডবের সনে ভীম ঘোরে বনে বনে।
দীর্ঘকাল গেল কাটি, ঘোরে দেশে দেশে।
পশু মারে, ভিখ মাগে, ঘোরে দীনবেশে।
হেনকালে পিতামহ ব্যাসদেব আসি,
দেখা দিলা সুমধুর বচনে সম্ভাষি।
পাঠাইয়া দিলা সবে একচক্রা গ্রামে
আশ্রয় লইল সেথা ব্রাহ্মণের ধামে।
তার পরে ঘটে যাহা শুন শান্ত মনে,
বক-বধ কথা এবে কহি সর্বজনে।

প্রথম দৃশ্য

ব্রাহ্মণের বাড়ির প্রাঙ্গণ

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ

নারদের গান

তোরা ঝগড়াঝাঁটি কর্
আহার নিদ্রা মাটি কর্।
ওরে নারদ নারদ বল্।
সুখশান্তি লণ্ডভণ্ড
বন্দোবস্ত হচ্ছে পণ্ড।
ওরে নারদ নারদ বল্।
আমরা খেটে মরি ঘুরে,
তোমরা খাসা পেটটি পুরে,
ঘুম লাগাও হে দিন-দুপুরে।
ওরে নারদ নারদ বল্।
বের কচ্ছি মজা মারা,
দিবানিদ্রা কচ্ছি সারা,
কুঁড়ের বাদশার দল।
ওরে নারদ নারদ বল্।

[নারদের প্রস্থান

পরস্পরের কাঁধে ভর দিতে দিতে ভীম ও কুন্তীর প্রবেশ, মাঝে মাঝে পড়ে যাওয়া, কোলে নিতে চেষ্টা···ইত্যাদি

কুন্তী। বড্ড লেগেছে বুঝি বাবা? তাই আর আজ ওদের সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুতে পারলি না? তা বুনো ছাগলের সঙ্গে কেন লড়াই করতে গিয়েছিলি বল্ দিকিনি? আহা মরে যাই! দেখি বাপধন কোথায় কোথায় ব্যথা, সেখানে বেশ করে ঘষে ঘষে এই অস্থি-ভস্ম-টুকুন লাগিয়ে দিলেই সব সেরে যাবে। আর কোনো ভয় থাকবে না। দেখি তো।

ভীম। (লাফিয়ে উঠে) অ্যাঁ! ওষুধ লাগাবে? বঁল কি!

ওঁ বাঁবা। এ মনিতেই আঁমি ব্যাঁথার চোঁটে টিঁকতে পারছি না তাঁর উঁপর আঁবার ওঁষুধ দিঁলে আঁমার নিঁশ্চয় ভীঁষণ জ্বাঁলা কঁরবে। তাঁ হলে তাঁর পঁর আঁমি নিশ্চয় মঁরে যাঁব। ওঁ বাঁবা।

কুন্তী। কি জ্বালা! এর যে দেখি দেহটা যেমনি বড়, বুদ্ধিটা ঠিক তেমনি ভোঁতা! আরে না না, কিছু লাগবে না। আর ওষুধ না লাগালে ব্যামো বেড়ে যাবে। কব্‌রেজমশাইকে ডাকতে হবে। পঞ্চতিক্ত গেলাবেন, এই এত্ত বড় ব্যাণ্ডিস্‌ বেঁধে দেবেন। তিনদিন খাওয়া বন্ধ করে দেবেন--

ভীম। অ্যাঁ বল কি! খাওয়া বন্ধ? তা হলে আমি কেমন করে বাঁচব? আচ্ছা দাও, ওষুধটাই বরং দাও। (শরীরের নানাস্থান দেখিয়ে) এই যে এখেনে ব্যথা, এখেনে ব্যথা, এখেনে ব্যথা। উহু-হু-হু, ওকি করছ, ওখেনে যে ভীষণ ব্যথা। আরি বাবা রে! ঐ জায়গাটা ধরো না, ধরো না বলছি। উঃ আর কিছু রাখলে না রে। আরি বাব্বা! অত চিপ্‌কোচ্ছ কেন বল তো? আই মাই গড্‌! জ্বলে গেলুম রে! ওরে তোরা কে কোথায় আছিস রে, আমি যে আর নেই রে!

বাইরে করাঘাত ও হেঁড়ে গলায় ডাক

হিড়িম্বা। (বাইরে থেকে) বলি, কেউ বেঁচে আছে না কি গা? আমি যে একটা মেয়েমানুষ, কখন থেকে দোরগোড়ায় দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে হেঁকে মরছি, বলি, তোমরা কি সব কানের মাথা খেয়েছ নাকি বাছা?

কুন্তী। ও মা! এ আবার কেমনধারা মেয়ে গো? হাঁকের চোটে গাছ থেকে কাগরা উড়ে যায়, চাল থেকে খড়কুটো ভেঙে পড়ে! কে বাছা তুমি অমন ধারা বে-আক্কেলের মতো চেল্লাচিল্লি লাগিয়েছ?

কোমরে কাপড় জড়াতে-জড়াতে হিড়িম্বার প্রবেশ

হিড়িম্বা। ভারি তেজ দেখছি যে! মুখ দিয়ে বুঝি মিষ্টি কথা বেরোয় না? জানিস তোকে আমি এক--(ভীমকে দেখে জিভ কেটে, ঘোমটা দিয়ে) ওমা, কি লজ্জা!

ভীম। হিড়িম্বে, এদিকে আয়। নাকে খৎ দে, প্রতিজ্ঞা কর আমার মার সঙ্গে আর কক্ষনো অমন ভাবে কথা বলবি নে।

হিড়িম্বা। (কুন্তীর পায়ে ধরে) হেই মা, তোমার পায়ে পড়ি, দোষ নিয়ো না মা। এই দ্যাখ নাকে খৎ দিচ্ছি।- উঃ, মেঝেটা কি

শক্ত রে বাবা, একটু গোবরজল-ছড়াও কি কেউ কক্ষনো দেয় না? দ্যাখ দিকিনি আমার এমন ভালো নাকটার কি অবস্থা হল।

কুন্তী। কেরা ভীমু, চিনতে পারছি না তো?

ভীম। হিড়িম্বা, হিড়িম্বা! আঃ তোমার বউমা গো!

কুন্তী। অ মা! এই আমাদের সেই হিড়িম্বা-বউমা নাকি? তা বাছা তোমার চেহারার এ কি হাল হয়েছে বল দিকিনি? তখন তো দিব্যি ফুটফুটেটি ছিলে, এমনধারা পোড়াহাঁড়ি চেহারা কেমন করে হল গা?

হিড়িম্বা। তাই বটে! যাও তো ঠাকরুন পুকুরপাড়ে একবারটি গিয়ে জলের মধ্যে নিজের চেহারার প্রতিবিম্বিটি দ্যাখ গিয়ে! মাছ-কচ্ছপরা সব আঁৎকে উঠবে। ইস্! আমায় কিনা বলে পোড়াহাঁড়ি। আজ যদি আমার দাদা বেচারীকে যমের বাড়ি না পাঠাতুম তবে সে তোমাকে দেখে নিত ঠাকরুন, হ্যাঁ! আর আমি নিজেও কি কিছু কম—

ভীম। কি আপদ! বলি তুমি থামবে কি না? দেখ তো কানের কাছে কি ঘ্যান্ ঘ্যান্ লাগিয়েছে?

হিড়িম্বা। বেশ, আমি নাহয় খারাপ, পোড়াহাঁড়ি, কিন্তু তাই বলে কি আমার পরানে একটু দয়ামায়াও থাকতে নেই? তোমরা কেমন আছ তাই দেখতে এলুম। আর সে সঙ্গে আমার ঘটুবাবার সংবাদটাও দিতে এলুম। কোথায় খুশি হবে, তা, না। আসামাত্র সব মারমূর্তি ধরেছে।

কুন্তী। (সহাস্যে) আহা, ঘটু আমাদের বেঁচে থাক্। তা সে কত বড়টি হয়েছে এখন?

হিড়িম্বা। (সগর্বে হাত তুলে দেখিয়ে) তা এই তালগাছটি পরমাণ হবে বৈকি। আর দেখতে যেন সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুরটি! ইয়া ছাতি, যেন একটা বিরাট কালো পাহাড়। ইয়া মুখখানিতে কেমন সুন্দর তামাটে রঙের নৌকোর মতো ঠোঁট দুখানি। আর প্যাখ্না-পানা কান দুটি মাথার দুটি পাশে এমনি করে উঁচিয়ে রয়েছে। আর মাথাটিও কি সুন্দর মোলায়েম চিক্ চিক্ করছে, চুলটুলের বালাই নেই। আহা বেঁচে থাক্ বাছা, লক্ষ বছর পরমাই হোক।

কুন্তী। (গালে হাত দিয়ে) ওমা, সে কি গা, মাথায় চুল নেই কেন গা?

ভীম। তা বেশ, তা বেশ। আচ্ছা, এসেছই যখন, দ্যাখ আমার শরীরটাতে বড় কাহিল-কাহিল বোধ করছি। তুমি আমার পায়ের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে টেনে দাও দিকি, বেশ মুট্‌মুট্‌ করে উঠলে ভারি আরাম লাগে ;—উহুহু, ও কি করছ ? আরে বাবা রে! একেবারে ছিঁড়ে যাবে যে !—আচ্ছা, ও থাক্‌। তার চেয়ে বরং আমার পিঠটাতে আস্তে আস্তে কিলিয়ে দাও।— ওরে বাস্‌ রে! এ যে গুম্‌ গুম্‌ করে মুগুর পিটতে লেগেছে! হয়েছে, হয়েছে, তুমি সরে গিয়ে, ঐখানে আমার মায়ের পাশটিতে চুপটি করে বস দিকিনি। আমার শরীর খারাপ, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। ইচ্ছে কর তো ঐখান থেকে আমাকে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে পার। কিন্তু দেখো যেন একেবারে উড়িয়ে দিয়ো না আবার।

ভীমের নিদ্রা। নাক ডাকার গান

ভর দুপুরে ঘঁফিস্‌—ঘঁফিস্‌।
ইক্কি কাণ্ড! হোয়াট্‌ ইজ্‌ দিস্‌!
ভোঁ—ঘড়্‌ ঘড়্‌! ভোঁ—ঘড়্‌ ঘড়্‌!
বৃক্ষ মড়্‌ মড়্‌, ঘরদোর পড় পড়।
এই ভয় লাগানো, চোর ভাগানো,
লোক জাগানো লক্ষ্মীছাড়া।
এই কাগ্‌ তাড়ানো, ভূত ঝাড়ানো,
নাক ডাকানো কেমন ধারা!

অন্তরালে নানান্‌ সুরে বিলাপ

ওরে বাবা রে, আমরা কোথায় যাব রে!
হায় রে কি হবে রে!
ওরে কি সর্বনাশ রে!
তার চেয়ে না জন্মালেই তো ভালো ছিল রে।
হু-হু-হু। হায় হায় হায়···ইত্যাদি।

ভীম। (উঠে বসে হাই তুলে) এই দ্যাখ! একটুখানি বিশ্রাম করবার কি জো আছে ? যেমনটি দুই চোখের পাতি এক করেছি, অমনি কি না ওরে বাবা রে, গেলুম রে, মলুম রে, খেয়ে ফেল্লে রে·। যাও, যাও, দেখে এসো গিয়ে কার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আরে, রক্ষা-টক্ষা

করবার দরকার থাকলে তো সেই আমাকেই যেতে হবে। যাও, যাও, মনে হচ্ছে যেন সেই বামুন-বাম্‌নীর গলাই বটে।

কুন্তীর প্রস্থান ও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তাঁদের পুত্র-কন্যার সঙ্গে পুনঃপ্রবেশ

ব্রাহ্মণ। দেখুন মা, আপনারা হলেন গিয়ে অতিথি, দ্যাব্‌তার স্বরূপ। আপনারা মরে গেলে আমাদের পাপ লাগবে, তাই বলি কি না—(হিড়িম্বাকে দেখে) আরি বাবা রে! এখানে আবার এ কোত্থেকে এল রে?

আরি বাবা রে! এখানে আবার এ কোত্থেকে এল রে?

হিড়িম্বা। (সরোষে) দ্যাখ বাপু, তুমি কেমনধারা ভদ্রলোক তা তো বুঝলাম না। আমি বউ মানুষ, লজ্জায় মুখটি খুলি নে, তাই বলে আশ্‌কারা পেয়ে পেয়ে যা মুখে আসে তাই বলে যাবে নাকি? দাঁড়াও ঠাকুর, একবার যখন ঠ্যাং দুটো ধরব, এক্কেবারে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেল্‌ব বলে রাখলাম। চির্ চির্ করে কেটে সরু চাকলি বানিয়ে ফেল্‌ব!

ভীম। হিড়িম্বে, চোপ্!— দেখুন, আপনার ভীতির কোনো যথার্থ কারণ নেই। উনি আসলে আমার ভার্যা। অতিশয় স্নেহশীলা, তবে কিনা একটু কোপন-স্বভাবা। কিচ্ছু মনে করবেন না, ওঁর দ্বারা আপনাদের কোনোরকম অনিষ্ট হবে না।

হিড়িম্বা। হবে না মানে? যথেষ্ট হবে। দ্যাখই-না, হয় কি না।

ভীম। চোপ্!

ব্রাহ্মণ। তুমি তো বাছা ধমক দিয়েই খালাস। ভাঁটা-পানা চক্ষু করে তাকাচ্ছে দ্যাখ না। এমনিতেই ভয়ে আমাদের প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়, তার উপর এ আবার কি নতুন গেরো! যাক গে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পুত্র-কন্যা। অ্যাঁ, কপালে যাঁ আঁছে তাঁই হবে? ওঁ বাঁবা, ভঁয়ে যেঁ আঁমাদের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে যাচ্ছে। চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, পেটের মধ্যে প্রজাপতি ফর্‌ফর্ করছে। যঁদি সত্যি কাঁমড়ায়? ওঁরে বাঁবা রেঁ, কোঁথায় যাঁব রেঁ!

ভীম। ন্যাকা! বলছি ও কাউকে কিচ্ছু করবে না। আর সামান্য একটু এখানে ওখানে কামড়ালেই-বা, কী এমন ক্ষতিটা হবে শুনি? যত রাজ্যের ঢং! নাও, এখন ব্যাপারটা কি তাই খুলে বল— কিসের জন্য অত হাঁউমাউ হচ্ছিল?

ব্রাহ্মণ। আরে কি মুশকিল! সেই কথা বলবার জন্যই তো এসেছি। বককে চেনেন? আরে, এ অঞ্চলের বক-নিশাচরের নামই শোনেন নি? তবে শুনেছেন কি? এই চাকাই জালার মতো পেট, বিরাট-বিরাট শালগাছের মতো হাত-পা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, মুলোর মতো দাঁত। আরি বাবা রে! বলতে বলতেই যে গা শিউরে উঠছে! তার গর্জনেতে বড়-বড় কাঁঠাল গাছ ভেঙে পড়ে। আর কি

দারুণ ক্ষিদেই যে অষ্টপ্রহর লেগে আছে সে আর কি বলব ! পেটে যেন সদাই আগুন জ্বলছে। দিনরাত শুধু খাই-খাই।

ভীম। সে কি ! বেশি খাওয়া যে বড় খারাপ। ওতে ব্যামো হয়। মন তামসিক হয়ে ওঠে। বড় খারাপ।

হিড়িম্বা। আহা, ন্যাকামো করবার আর জায়গা পাও নি। নিজের খাওয়ার বহরটি তো কিছু কম যায় না। বাড়িতে যা রান্না হবে, তার অর্ধেকটি ভাগ উনি একলা খাবেন, আর বাকি অর্ধেকটি বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে খাবে। বক বেচারির বেলাতেই যত দোষ !

ভীম। হিড়িম্বে ! ফের মুখ খুলেছিস কি দেখবি মজা ! একেবারে হিড়ি-মিড়ি-কিড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেব। চারটি খাই বলে অমনি খোঁটা দিচ্ছিস যে বড়, তোর খাই নাকি ?

ব্রাহ্মণ। আহা, এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধাল। আপনারাই যদি সর্বক্ষণ খ্যাঁচাখেঁচি করবেন তো আমাদের উদ্ধার করবেন কখন ? কোথায় আমাদের দুঃখের কথা শুনবেন, না নিজেদের তালেই আছেন।

ভীম। আচ্ছা, আচ্ছা, বলুন, বলুন।

ব্রাহ্মণ। তা সেই ব্যাটা বক এমনি উৎপাত লাগিয়ে দিল যে দেশে তিষ্ঠুনো দায় হয়ে উঠল। মানুষ, গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি—ইঃ ! থুড়ি ! ধান চাল কলা মুলো, সব তচ্‌নচ্ করে দিতে লাগল। আমাদের রাজাটি তো আর মনিষ্যি নয়, দিবারাত্র শহরে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মেতে আছে। রাক্ষস তাড়ানো তার কম্ম নয়। শেষটা তার সঙ্গে বক রাক্ষসের এইরকম রফা হল যে, ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু প্রজাদের পালা করে প্রতিদিন ওর খোরাক জুটোতে হবে। সে এক-একটা এলাহি ব্যাপার ! এই পাহাড় পাহাড় খাবার, আর একটা করে মানুষ। আঁজ আঁমাদের পাঁলা। (ক্রন্দন)

ভীম। এই দ্যাখ, গল্প শেষ না হতেই আবার ক্যাঁওম্যাও লাগিয়ে দিল।

ব্রাহ্মণ। ক্যাঁওম্যাও আবার কি ? আমার ব্রাহ্মণীকে বক খেয়ে ফেললে বুঝি আমাদের কষ্ট হবে না ? কে আমাদের ভাত রেঁধে দেবে, কে ঘর-দোর নিকিয়ে দেবে ? ও হো হো ! রাতে কে আমার বাতের তেল মালিশ করে দেবে শুনি ?

ব্রাহ্মণী। ওগো, তুমি অমনটি কোঁরো না, তা হলে আমার বুক ফেটে

যাবে। কিন্তু হায়! হায়! কি সর্বনাশ! আমার বামুন বকের পেটে গেলে কে আমার ছেলেমেয়ে মানুষ করে দেবে? ও আমার একার কম্ম নয়, এক-একটা যা হয়েছে, এক-একটা আস্ত বাঁদর! আর—আর আমার এই নতুন বালা জোড়া কে পরবে?

কন্যা। হাউ হাউ হাউ! আমি পরব মা, আমি পরব। তোমার এত কষ্ট করে আদায় করা বালাজোড়া কি আর আমি অমনি ছেড়ে দেব? কিন্তু—কিন্তু তা হলে বাবাকে যদি বক খায়, আর তুমি যদি বুক ফেটে মরে যাও, তা হলে আমার বিয়ে দেবে কে? উ হু হু হু হু!

পুত্র। অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাই তো! ঐ বুড়োধাড়ি মেয়েটাকে আমি কি করে পার করব! ঐ তো চেহারা, ঐ তো গুণের হাঁড়ি! শেষটা কি আজীবন আমার ঘাড়ে চেপে থাকবে নাকি রে! ও মাগো, ও বাবাগো, ও পিসিমা!

ভীম। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি মুশকিল! এরা যে একটা গোটা কন্‌সার্ট পার্টি খুলে বসল! আরে না না, কাউকে বকের পেটে যেতে হবে না। দ্যাখ-না, আমি এক্ষুনি গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছি। কই গো, কোথায় তোমাদের হাঁড়ি হাঁড়ি পোলাও কালিয়া ক্ষীর সন্দেশ। দাও, দাও, সব গুছিয়ে দাও। বককে ভালোভাবেই যমের বাড়ির দিকে রওনা করে দিয়ে আসি! (নেপথ্যে কোলাহল) কি আপদ! ও আবার কিসের গণ্ডগোল!

আঁটলো-বাঁটলোর প্রবেশ

আঁটলো। এই সেরেছে! এখানে আবার কিসের কাঁদাকাটি নেগেছে গো? এঁয়ারা সব মরে যাচ্ছেন নাকি বাবা?

বাঁটলো। সেটি হচ্ছে না কত্তা, এই বলে রাখলুম। নবাবী করে সব দুটো দুটো চাকর রাখবেন। তাপ্পর মাইনে দেবার নামটি করবেন না। আর টপাটপ্ সব মরে যাবেন! আছেন বেশ! বড় যে সব সারি সারি মরতে লেগেছেন, বলি, আমাদের মাইনেটা কে দেবে? এই সবার সামনে বলে দিলুম বাপু, ও-সব মরা-টরা চল্‌বে না। কান অবধি দেনায় ডুবে রয়েছেন, আবার সখ দ্যাখ-না!

আঁটলো। যা বলেছিস। ইদিকে ট্যাক সব গড়ের মাঠ উদিকে বড়-মানুষির বহরটি আছে খাসা! ও-সব হবে-টবে না। আগে টাকা ফেলুন, তাপ্পর দ্যাখা যাবে?

বাঁটলো। ইস্, কি সাঁপের মতো মানুষ গো! তখন কত্ত কত্ত মিষ্টি কথা।—দু বেলা পেট পুরে খাওয়া, দু টাকা করে মাইনে, পুজোর সময় কাপড় গামছা, হেনা তেনা কত কি—যেন আমার বাপের ঠাকুরদাদা এয়েছেন!

আঁটলো। তার পর মাস না ঘুরতেই অন্য সুর।

আঁটলো-বাঁটলোর গান

এই আঁটলো, কাপড় কাচ্।
ও বাঁটলো, বাসন মাজ্।
টিকে আন্ তামাক সাজ্।
ঘরটা মোছ্, খড়ম খোঁজ্।
উনুন ধরা, ছাগল চরা।
বিছানা কর্, পোলাটা ধর্।
শিগ্‌গির ওঠ্, বাজারে ছোট্।
মাছটা কাট্, মসলা বাট্।
চল্‌ছে সদাই এমনি ধারা,
কাজের বহর হয় না সারা।
রাত্রি দিবা, হুকুম কিবা।

আঁটলো। এবার ইয়াকি ছেড়ে মাইনে দিন।

বাঁটলো। ভালো চান্ তো মাইনে দিন।

ব্রাহ্মণী। একি গেরো রে বাবা। বার বার বল্‌ছি তোদের, এখন আমরা ভয় পাচ্ছি, এখন বিরক্ত করিস্ নি, তা কে কার কথা শোনে! কেবল কানের কাছে টাকা দিন, টাকা দিন। আরে ব্যাটারা, টাকা হল গিয়ে ছাই। এক কানাকড়িও ওর দাম নয়। তার চেয়ে আত্মার সদ্‌গতি কর্ দিকি বাপ্।

ব্রাহ্মণ। আর তোরা হলি গিয়ে কাজের মুনিষ। তোদের মুখে কি অত বড়-বড় কথা শোভা পায়?

ভীম। বেশ, তা হলে আপনারা ঝগড়া করতে থাকুন, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

ভীমের পাশ ফিরে শয়ন। নেপথ্যে যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি চারি পাণ্ডবের সমবেত সংগীত। ভীমের উত্থান

ভীম। কি জ্বালা! ও আবার কি হল?—এই যে বাবুরা সব ফিরে এলেন।

মাছ ধরার গান গাইতে গাইতে চারি পাণ্ডবের প্রবেশ

মাছ ধরার গান

মাছ মারি, মাছ মারি, মাছ মারি।
সাদা সাদা ছোট মাছ,
চক্‌চকে কালো মাছ,
আঁশ-ঢাকা, শিং-ওলা, বড়-বড় ভালো মাছ।
মাছ মারি।...

ভ্যাদা মাছ, চাঁদা মাছ,
ধরা দেয় হাঁদা মাছ।
মাছ মারি।...
জালে পড়ে বোকা মাছ,
টোপ্ গেলে খোকা মাছ।
মাছ মারি।...

চিতল মাছ, মাগুর মাছ, চিংড়ি মাছ, তাজা মাছ।
বাটা মাছ, বাচা মাছ, ইলিশ হল রাজা মাছ।
শোল শিঙি ভাঙড় মাছ,
ডাগর ডোগর হাঙর মাছ।
ঘাই মারে ঢাই মাছ,
খ্যাংরা গোঁফ ট্যাংরা মাছ।
মাছ মারি।...

গান শেষ করে ছিপ, মাছের থলে ইত্যাদি মাটিতে ফেলে

যুধিষ্ঠির। উঃ! কী ক্ষিদে রে বাবা! পেটের ইদিকটার সঙ্গে উদিকটা এক্কেবারে কিনা সেঁটে গেছে মনে হচ্ছে।

অর্জুন। মনে হচ্ছে এক্ষুনি একটা আস্ত উট পেলে, তাকে সুদ্ধ গিলে ফেলি।

নকুল। হ্যাঁ রে, মনে হচ্ছে একটু লেবু আর নুন দিয়ে টপ্ করে গিলে ফেলি।

সহদেব। আর সামান্য একটু কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে।

অর্জুন। এই, ফের তোরা আমি যা বলছি তাই বলছিস ?

কুন্তী। (দুই বাহু প্রসারিয়ে) এসো, এসো বৎসগণ, বক্ষে এসো। ইস্! তোদের গায়ে কি ঘামের গন্ধ রে বাবা! যা, যা, নেয়ে আয়, নেয়ে আয়। ততক্ষণ আমাদের হিড়িম্বা-বউমা মাছগুলোকে কেটেকুটে দিব্যি নুন হলুদ আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভেজে ফেলুক।

হিড়িম্বা। যা বলেছ ঠাকরুন!

ভীম। (সকলকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে) বাবাবাবা! আছ বেশ! ভিক্ষে করবার নাম করে সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবুরা তোফা মাছ ধরে এলেন। ওহে জ্যেষ্ঠ, যদি তুমি আমার উপাস্য দেবতা না হতে, তা হলে আজ তোমায় একবার দেখে নিতাম! ইয়ার্কি করবার জায়গা পাও নি, না ? গুরুজন হয়ে নেহাত বেঁচে গেলে, নইলে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তোমার মুণ্ডুর খুলিটা যদি আজ উড়িয়ে না দিতাম, তা হলে—

অর্জুন। আরে সে কি পুকুর রে ভাই! স্বর্গের সঙ্গে কোনো তফাত নেই। সেইখানেতে গাছের ছায়ায় পা মেলে দিয়ে সারাটা সকাল পড়ে থাকতে সে যে কী আরাম, সে আর তোকে কি বলব! থেকে থেকে এই বড়-বড় মাছ ঘাঁই মেরে ওঠে—

নকুল। হ্যাঁ, এমনি করে এত্ত বড় মাথা উঁচিয়ে ওঠে।

সহদেব। আর টুপ্ করে ফের ডুবে যায়।

অর্জুন। ফের! দিন রাত কেবল আমি যা বলব তোরা তাই বলবি ? যা, পালা এখান থেকে।

যুধিষ্ঠির। ওরে ভীমু, চটছিস কেন বল তো ? মাছ ধরব বলে কি আর বেরিয়ে ছিলাম রে ? তা হলে তো তোকে সঙ্গেই নিয়ে যেতাম। মাছ ধরার নাম করলেই তোর সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত, সে কি আর জানি না। ভিক্ষের ঝুলি নিয়েই বেরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি পথের ধারে কালো জলে ভরা পুকুরটা টলমল করছে। আর সে কি বিরাট বিরাট মাছ ঘাঁই মারছে—

নকুল-সহদেব। ঐ শুনলে অর্জুনদা ? তুমি যা বল জ্যেষ্ঠও তাই বলছে। আমাদের বেলাতেই যত দোষ।

অর্জুন। তোরা থাম দিকিনি।—বুঝলি, তখুনি গাছতলায় সব

বসে পড়ল, আর আমি এক দৌড়ে বাড়ি এসে লুকিয়ে লুকিয়ে ছিপটিপ নিয়ে গেলাম।

নকুল-সহদেব। হ্যাঁ, পাঁই-পাঁই করে বাতাসের বেগে এল আর গেল। কাক-পক্ষীটি টের পেল না।

অর্জুন। আবার! আবার যা বলছি তাই বলছিস? এ তো মহাজ্বালা!

যুধিষ্ঠির। (শুয়ে পড়ে) উঃ! ঠায় বসে থেকে থেকে পিঠ ধরে গেল! কী বড় একটা মাছ টোপ্ গিলেছিল রে! কম-সে-কম তার ওজন হবে পঁচিশ সের। যেই-না ফাৎনা নড়েছে, অমনি বুঝেছি বাছাধন টোপ্ গিলেছেন। তার পর আধটি ঘণ্টা তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে যেই-না ড্যাঙার কাছে এনে ফেলেছি—

অর্জুন। অমনি ব্যাটা সুতো ছিঁড়ে একদম ভাগলুয়া!

নকুল। হ্যাঁ, এক্কেবারে চোঁ-চাঁ হাওয়া!

সহদেব। স্রেফ্ কপ্পুর!

অর্জুন। কি মুশকিল! এ দুটো কি এক্কেবারে তোতাপাখি বনে গেল নাকি! হ্যাঁ গা মেজদা, তুমি যে চুপ?

ভীম। আমি থাকলে ঐ মাছটাকে—যাকগে, এখন আমার বাজে বক-বার সময় নেই।—কই গো, বকের জন্য কি খাবার-দাবার দেবে, দাও।

ব্রাহ্মণ। সবই প্রস্তুত আছে। আঁটলো-বাঁটলোর মাথায় চাপিয়ে নিয়ে গেলেই হল।

আঁটলো। অ্যাঁ! ঐটেই বাকি ছিল রে বাবা! এবার দে আঁটলো-বাঁটলোকে বকের পেটে ঠুসে! না বাবু, আমরা দেশে চললুম।

বাটলো। 'তার' এয়েছে, ঠাকুমার কঠিন ব্যামো, বাঁচে কি না সন্দেহ। তা হলে এবার মাইনেটা দিয়ে দিন। ওষুধপথ্যি কিনতে হবে, গামছা লাগবে, খাটিয়া লাগবে, কাঠ লাগবে—

ভীম। (ধমক দিয়ে) যা, যা, মেলা কথা না বলে কি সব পোলাও, কালিয়া, চিংড়িমাছের আফগানী কাটলেট, পাঁঠার দোপেঁয়াজা, ক্ষীর, নতুন গুড়ের সন্দেশ আর কি কি সবের গন্ধ পাচ্ছিলাম—যা, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। ক্ষিদেয় যে পেট জ্বলে গেল। বক বেচারিকে কতক্ষণ অপেক্ষা করান যায় বল!

[আটলো-বাঁটলো ও ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রস্থান

অর্জুন। বলি, ও মেজদাদা, বকের খাওয়ার জন্য যে ভারি উদ্‌বেগ ! তা বক কিছু পাবে-টাবে তো ?

হিড়িম্বা। (সহসা হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে উঠে) তুমি কি তা হলে একাই ঐ-সব খাবে ? কাউকে কিছু দেবে না ? আর বকের সঙ্গে যদি তোমার মারামারি হয়, আর যদি ভীষণ যুদ্ধ হয়, আর যদি দুজনেই দুজনকে মেরে পাট করে দেয়, তা হলে কি ঐ খাবার-দাবারগুলো সব নষ্ট হবে ? অ্যাঁ ! এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে ঐ তাল তাল পোলাও কালিয়া দোপেঁয়াজী আর চিংড়িমাছের কি যেন আর ক্ষীর-সন্দেশগুলো সব কি তবে বিড়ালে খাবে ?

কুন্তী। দ্যাখ বউমা, ভাশুরের সামনে ওরকম চ্যাঁচামেচি শোভা পায় না, বাছা। আর গলাখানিও যা বানিয়েছ, যেন খুন্তি দিয়ে কড়াই চাঁচা ! তুমি একটু ইদিকে এসো তো ? ঘটুর জন্য কয়েকটা জিনিস রেখেছি, তা এখন গায়ে উঠলে হয় ! আর তার পর, দ্যাখ বাছা, বেলাও হয়ে এল, যাবেও অনেক দূর, দিন থাকতে থাকতে হাঁটা দাও। আমার ছেলেরা স্নানাহার করবে, এখন কি আর মেলা খ্যাঁচ্‌ খ্যাঁচ্‌ ভালো লাগে ? জিনিসগুলি নিয়ে কেটে পড় দিকিনি। মাছ-টাছ যে তুমি ভেজে দেবে না সে আমি আগে থাকতেই জানি।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কি যে ব্যাপার সে তো আমার আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না। খাবার-দাবার নিয়ে সব যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

ভীম। যাও, যাও, তোমার সে জেনে দরকার নেই। মাছ মারার সময় যেমন আমি কিছু বলি নি, আমার রাক্ষস মারার সময় তুমিও তেমনি নাক ঢোকাতে এসো না। কই রে আঁটলো-বাঁটলো!

যুধিষ্ঠির। রাক্ষস মারা ? বলি, কার পারমিশন্‌ নিয়ে তুমি রাক্ষস মারার তোড়জোড় করছ চাঁদ ?

ভীম। কেন, স্বয়ং মাতৃদেবীর। জিগ্‌গেস করতে পার।

কুন্তী। আরে, এর জন্য আবার পারমিশন্‌ কি বাবা ? ও যাবে আর আসবে। তোমাদের মাছগুলো আমি খোলা থেকে ভেজে তুলতে না তুলতে দেখো, হাঁই হাঁই করতে করতে এসে হাজির হবে।

যুধিষ্ঠির। না, মা। কাজটা ভালো কর নি। তোমার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটে থাকবে। নইলে তুমি তো ভালো করেই জানো যে যদিও ওর বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই, তবু বিপদে-আপদে ওর ঐ ষাঁড়ের মতো

শক্তিই আমাদের একমাত্র সহায়। ও-ই আমাদের রাজ্যোদ্ধার করে দেবে বলে আমরা আশা করে বসে আছি। দুর্যোধন তো আমাদের থোড়াই কেয়ার করে। একমাত্র ওরই ভয়ে রাতে তার ভালো করে ঘুম হয় না। নাঃ, এই অবস্থায় ওকে বকের কাছে পাঠিয়ে কাজটা ভালো করছ না মা।

ভীম। কেন, তাতে হয়েছে কি? কী বলতে চাইছ খুলেই বল-না। বকের সঙ্গে আমি পারব না, এই তো? ওঃ! নিজেদের শক্তি তো কাঁচকলা। বারোমাস আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাও আর আমারই উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই? বাঃ বাঃ খুব ভালো।

কুন্তী। রাগ করছিস কেন? ও তোর গুরুজন না? আর তোমাকেও বলি বাবা যুধিষ্ঠির, বাস্তবিকই তুমি নিজে কিছু কম্মের নও, এক বক্তিমে করা ছাড়া। ওকে বাধা দিয়ো না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ও বহু মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় সব রাক্ষসদের এক-একটি গদার ঘায়ে মাটিতে সব ফ্ল্যাট করে দিয়েছে। তুমি কিছুমাত্র ভীত হয়ো না। ও এখনই বকরাক্ষসকে সাবাড় করে ফিরে আসবে।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, শুধু কি আর বককে সাবাড় করবে? উপরন্তু ঐ-সব উপাদেয় সামগ্রীগুলিকেও সাবাড় করবে।

হিড়িম্বা। সত্যি কাউকে কিছু দেবে না? সব একা খাবে?

ভীম। তা হলে তোমরা এখন ঐ-সবই কর, আমি চলি। ও আঁটলো-বাঁটলো, গেলি কোথায়?

নেপথ্যে আঁটলো-বাঁটলোর কণ্ঠস্বর শোনা যায়— এই যে স্যার—সব রেডি

কুন্তী ও হিড়িম্বা। তা হলে এসো। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

অর্জুন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

নকুল ও সহদেব। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

অর্জুন। ফের।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বকের আবাসের সম্মুখভাগ

ঘটি গামছা সাবান ইত্যাদি সহ বক ও তার দুই অনুচরের 'স্নান নৃত্য' ও প্রস্থান
ভীমসেন ও খাদ্যাদি-সহ আঁটলো-বাঁটলোর প্রবেশ

আঁটলো। আর কত এগুবে দাদা? আর তো পারি নে।

ভীম। অ্যাঁ? আচ্ছা, এইখেনেতেই রাখ্ দিকিনি।—আহা-হা, ও কী করছিস? পোলাওটার পাশেই কালিয়া রাখ। তার পর ওধারটাতে মণ্ডা-মেঠাইগুলো থুয়ে দে। নইলে বকের যে ভারি অসুবিধে হবে। জল এনেছিস? আ সর্বনাশ, জল আনতে ভুলেছিস তো? ইস্, এমন ভালো খাওয়াটা এক্কেবারে মাটি! বক বেচারির যদি গলা শুকিয়ে যায়?

বাঁটলো। না গো না, সব এনেছি। খাবে তো ঐ বক হতভাগা, তা আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন কত্তা?

ভীম। উতলা হব না, বলিস কি রে? সে অতিথি মানুষ, তার খাওয়া নিয়ে উতলা হব না তো কার খাওয়া নিয়ে উতলা হব? তোদের যে একেবারেই কোনো জ্ঞানগম্যি হয় নি দেখছি। নে, এখন দে তো আমার হাতে একটু জল। বকের খাবার-দাবারগুলো একটু গুছিয়ে দিই।

হাত ধুয়ে খাবারের সামনে ভীমের আসন-পিঁড়ি হয়ে উপবেশন

আঁটলো। বক এলেই কিন্তু আমরা সরে পড়ব স্যার, বলে রাখলুম। ঠাকুমার ব্যামো; সেবা করবার, কাঁধ দেবার লোকের দরকার।

ভীম। যা না, এখুনি যা। ঠাকুমার ব্যামোতে দেরি করতে নেই। পালা, পালা।

বাঁটলো। উঁহু! 'সেটি হচ্ছে না কত্তা। মা-ঠাকরুনকে কথা দিয়ে এসিচি, খাবার-দাবারগুলো যাতে যথাস্থানে পৌঁছয় সেটি দেখে যাব। আমরাও যাই, আর আপনিও সুবিধে বুঝে সব সাঁটাবেন, সেটি হবার জো নেই।

ভীম। বটে? বটে? তবে বককেই ডাকা যাক। (উচ্চৈঃস্বরে) বক, ও বক, বক রে, তোর খাবার এনেছি রে, গেলি কোথা? হেই বক্, হোই বক, বক রে!

আঁটলো। ওরে বাবা রে, এবারে বুঝি এল রে। চল, আর দেরি

নম্ন। পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে সময় থাকতে চম্পট দিই।

[আঁটলো ও বাঁটলোর পলায়ন

ভীম। আঃ, এবার একটু আরাম করা যাক। আচ্ছা—নুন-টুন যদি ঠিক না হয়ে থাকে? তা হলে তো বক বেচারির বড়ই কষ্ট হবে। তা হলে তো একটু চেখে দেখাই কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। (একটার পর একটা হাঁড়ির ঢাকনা খুলে একটু-একটু চাখন) বাঃ! বেড়ে রেঁধেছে ভাই এটা!— ও ব্বাওয়া? এটা যে আরো সরেস!— আহাহাহা! এর সঙ্গে যে মধুর কোনো তফাত নেই!—(আর একটা) কি খাওয়ান্নি রে বাপ্! জন্ম জন্ম ধরে যে খালি জিভ চুলকুব আর কেঁদে কেঁদে বলব 'কি খেলুম রে কি খেলুম!' (থাবা থাবা ভোজন) আঃ! নরজন্ম কি সাধে বলে! বহু পুণ্যে নরজন্ম হয়। দেওতা হয়ে কি সুখ রে বাবা তোরাই বল্? শুধু অমৃত খেয়ে কি আমাদের শানায় রে? হ্যাঁরে? আহাহাহা! সায়েবরা যে চিংড়িমাছের মুণ্ডু খায় না, কি পাপিষ্ঠ বল দিকিনি? আর যাই হোস রে বাবা, কখনো সায়েব হোগ নি।— কি রেঁধেছে বাবা সত্যি!

দূরে গর্জন

আহা, এমনি একটা ভালো দিনে কে গোল কচ্ছিস বল্ তো? নারে বাবা, জন্ম জন্ম এইখেনেই পড়ে থাকতে চাই। সগ্গেও যেতে চাই না, কোথাও যেতে চাই না।

আরো কাছে গর্জন

উঃ! কি মানুষ রে বাবা! এই সময়ও চ্যাঁচায়?—আঃ, এগুলি যে রেঁধেছে সে সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা! হিড়িম্বাটা কোনো কম্মের নয়! একটা ওয়ার্থলেসের একশেষ!

একজন রাক্ষসের প্রবেশ

আরে আরে বক নাকি! তা এসো ভাই বক, ওদিকটাতে বসো! আমি আর এখন নড়তে পাচ্ছি নে।

রাক্ষস। ওরে ও লক্ষীছাড়া! তোর পরানে ভয়ডর নেই? বড় যে খাবারগুলো খেয়ে ফেলছিস?

ভীম। ওমা কী বলে! খেলুম কোথায়? কেমন হল না-হল, একটু শুধু চেখে দেখছিলুম। তোরই সুবিধে করে দিচ্ছিলুম। সাধে কি

শাস্ত্রে বলে কারুর উপকার করতে নেই।

রাক্ষস। প্রথম কথা হল শাস্ত্রে মোটেই ও-সব বলে না। দ্বিতীয় কথা হল, আমার সুবিধে কচ্ছ মানে!—ও, তুমি বুঝি আমাকেই বক ঠাউরেছ? আর আমাকেই দেখে বুঝি ভয়ে ঠকাঠক হয়ে যাচ্ছ? হাসালে বন্ধু। আমি হলাম গিয়ে বকের ভাই ঠক। আমার দাদাকে যদি দ্যাখ তো তোমার দুই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে বলে রাখলুম। হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চুরি করে খাওয়া তখন তোমার বেরুবে। দাদা চান করতে গেছে, এখুনি হালুম হালুম করতে করতে এই এল বলে; ভালো চাও তো আগে ভাগেই কেটে পড়ো। সরো, সরো, উঠে পড়ো। আমিই বরং ঐখানটাতে বসে জিনিসপত্র আগলাই।

ভীম। ইল্লি? দেখি দেখি, চাঁদমুখখানি দেখি একবার! আমি উঠি, আর উনি আমার জায়গাটিতে বসে এত কষ্টের সব খাবার চেঁচে-পুঁচে সাবাড় করুন আর কি! ও-সব হবে-টবে না। ভারি আমার বকের জন্য সহানুভূতি দেখাতে এয়েছেন। এখন এখান থেকে মানে মানে পালাও। নইলে একটি প্রচণ্ড ঘুষিতে তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। যাও, পালাও। [ঘুষি প্রদর্শন

রাক্ষস। (কাঁদো-কাঁদো সুরে) বাঃ। আমি কি করলুম? উনি দিব্যি বসে বসে আমার দাদা বেচারির খাবার গিলছেন, আর আমি একটু কিছু বললেই যত দোষ। বেশ, তবে তাই হোক। দাঁড়াও-না, আমিও এখুনি গিয়ে দাদাকে ডেকে আনছি। দেখো তোমাকে কেমন পিটিয়ে ছাতু বানায়।

ভীম। কি আপদ! যা না, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। আরে, তার জন্যেই তো পথ চেয়ে বসে রয়েছি। নইলে আমার আর কী বল?

রাক্ষস। (চীৎকার করে) ও দাদা, ও বক দাদা, বলি চান করতেই যদি দিন কাবার হল তো খাবে কখন? ও দাদা, ও বক দাদা, এদিকে যে একটা বদমাইস লোক সব খেয়ে ফেলল! ও বক দাদা, বক দাদা গো—

[ডাকতে ডাকতে রাক্ষসের প্রস্থান

ভীম। গেল চলে? আঃ! বাঁচা গেল। কোথাও যে একটু নিরি-বিলি হাত-পা মেলে আরাম করে বসব, তার উপায় নেই। তাও বাবা,

ঐ হিড়িম্বাটার, ক্যাঁচক্যাঁচানি থেকে খানিকক্ষণের মতন রেহাই পাওয়া গেছে।— অ্যাঁ! ও কি! ওটা আবার কে?

ঘোমটা দিয়ে হিড়িম্বার প্রবেশ

কি জ্বালা! আবার এসে জুটেছ? পালাও, পালাও এখান থেকে। নইলে এক্ষুনি বক এসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে!

হিড়িম্বা। আচ্ছা, আসুক তো সে। তার পর কে কাকে খায় দেখা যাবে'খন! ঐ বড় হাঁড়িতে কী আছে?

ভীম। ও হিড়িম্বে, ঐ ব্রাহ্মণী বুড়ির পা ধুয়ে চারটিখানি জল খেতে পারিস না রে? কি রেঁধেছে, বা বা! মুখে দিলে চোখ আপনা থেকে বুজে আসে। দেখবি চেখে? তোকে একটু একটু দেব। অন্ কণ্ডিশন্ যে তোকে ঐরকম রাঁধতে হবে। পারবি তো?

হিড়িম্বা। কি যে বল। তা আবার পারব না? একবার সেই বনের মধ্যে গাছের তলায় দাদার জন্য এমনি তোফা দু-ঠ্যাং রেঁধেছিলুম, দাদা তো গলে জল! নিজের গলা থেকে গজমোতির মালা খুলে আমাকে দিয়ে বললে—'ওরে হিড়িম্বে, তোর মতো কেউ রাঁধতে পারে না। ব্রাহ্মণীদের ঠাকুরমারাও না!' আর আজ কি না তুমি আমাকে ব্রাহ্মণী দেখাচ্ছ। (খেতে খেতে) কই, দাও তো আরো চাট্টি, সত্যিই বেড়ে রেঁধেছে। বুঝলে গো, খাওয়া হল গিয়ে আমাদের জেতের পেশা। যেমনি রাঁধতেও পারি, তেমনি খেতেও পারি। আর তার ফলে শরীরেও যেমনি শক্তি, মনেও তেমনি সাহস। আমাদের বুকের ভিতর দিবারাত্র হাঁই হাঁই করে সিংহ ঘুরে বেড়ায়। ভয়-ডর কাকে বলে আমাদের জানা নেই। (সহসা দূরে গর্জন শুনে) ও বাবাগো। ওটা আবার কি?

ভীম। অ্যাঁ, ভয় পেলে নাকি? এই যে বললে ভয়-ডর কাকে বলে জানো না, বুকের মধ্যিখানে সিংহ চরে বেড়াচ্ছে? কই সে?

হিড়িম্বা। আরে দুৎ, ভয় পাব কেন? হাত-পাগুলো কেমন—ধারা এলিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই। (পুনরায় গর্জন) বাঁবাঁরে! ঐ গাঁছগুলোর পিছনে বরং একটু লুকোই। [পলায়ন

ভীম। দেখলে, মেয়েদের কাণ্ড দেখলে? লম্বাচৌড়া বক্তিমে, আর কাজের বেলা অষ্টরম্ভা! নাঃ, বক্তিমে শুনে শুনে খিদেটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। সেই কখন ঘুম থেকে উঠে অষ্টগণ্ডা লুচি সন্দেশ

দিয়ে জলযোগ করেছিলুম, তার পর থেকে এই এত্তটা বেলা পর্যন্ত গুটি পাঁচেক কাঁটাল, আর বিশ-পঁচিশটে ন্যাংড়া আম, আর তার পর চাট্টিখানিক দই-ভাত আর এই দুই হাঁড়ি দই আর সের পাঁচেক ছানা ছাড়া দাঁতে কিছু কাটি নি। মাগো, কেমন যেন দুব্বল-দুব্বল লাগছে গো! এখন কি করা যায়? অ্যাঁ! কি করা যায়, কি করা যায়—ঠিক হয়েছে! একটু টিপিন খাওয়া যাক্। একা একা এত খেলে বকটার নির্ঘাৎ পেটের ব্যামো হবে।

গর্জন করতে করতে বকের প্রবেশ

বক। (দু চোখ কপালে তুলে) কে রে হতভাগা তুই? প্রাণের উপর বুঝি ঘেন্না ধরে গেছে, তাই আত্মহত্যে কত্তে এইছিস? (ভীমের একমনে ভোজন। ভীমের ঘাড়ে টোকা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছিস না? কালা নাকি? আমার খাদ্য যে বড় খেয়ে ফেলছিস, পরানে তোর ভয় নেই? ওঠ্ বলছি।

ভীমের হাস্য ও ইঙ্গিতে বককে প্রস্থান করবার নির্দেশ

বক। (রেগে ভীমের পিঠে কীল-চড় মারতে মারতে) লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর, পেটুক দামু কোথাকার! (ভীমের অল্প একটু কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে) যাও, ভালো লাগে না, অসভ্য কোথাকার। পেটে আমার লাগে না বুঝি? (প্রাণপণে প্রহার করতে করতে) ইডিয়ট্ কাঁহিকা, ঠ্যাং ভেঙে তালগোল পাকিয়ে দেব, মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলে দেব; গলা টেনে ইয়া লম্বা করে দেব।— ই কি! পাথর দিয়ে তৈরি নাকি রে বাবা? লাগে-টাগেও না?—হ্যাঁরে, তুই কী রে বাবা!

বক কিছু দূরে গিয়ে ছুটে এসে ভীমের পিঠে লাফিয়ে পড়ল, আর তখুনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে ভীম বককে ফেলে দিল

বক। উঃ, গেলাম গো! হাঁটুটা আমার উলটোবাগে হয়ে গেছে নিশ্চয়। কি সাংঘাতিক লোক রে বাবা! (হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে) কি সব্বনাশ। অদ্ধেকের বেশি শেষ করে দিয়েছে! ব্যাটা তোর পেটে কি দাবানল জ্বলছে নাকি রে? আরে ওঠ্ না। ওঠ্ বলছি। ও-সব আমার খাবার। এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল! নড়েও না, চড়েও না, সমানে খেয়ে যাচ্ছে। কি জ্বালা! এর একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে

তো চলছে না। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করে) হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! একটা গাছ আনছি। এবার বাছাধনকে টের পাওয়াচ্ছি!

বকের প্রস্থান ও বিশাল এক গাছ কাঁধে নিয়ে পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে গোটা তিন রাক্ষস ও সেই প্রথম গানের দুই-এক পদ গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ

রাক্ষসত্রয়। হ্যাঁ, এইবার ঠিক জমবে। লেগে যা। নারদ! নারদ!

বক। এইবার মজাখানা টের পাবে বাছাধন। গাছ এনেছি।

ধাঁই ধাঁই করে গাছ দিয়ে প্রহার। ভীমের বাঁ হাতে গাছ কেড়ে নিয়ে নারদের দিকে নিক্ষেপ ও নিবিষ্টভাবে ভোজন

বক। ইক্কিরে বাবা! একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম! তখন থেকে অ্যায়সা পিটছি, তবু কিছু হয় না! দাঁড়া, আরো অনেক বড় আর অনেক শক্ত একটাকে নিয়ে আসি। [বকের প্রস্থান

ওদিকে গাছের ডালের খোঁচা লেগেছে নারদের গায়ে

নারদ। এই, তোদের কাছে আইডিন-টাইডিন আছে?

রাক্ষসত্রয়। যান মশাই। মরছি নিজেদের জ্বালায়, আর উনি এসেছেন 'আইডিন আছে? ব্যাণ্ডিস্ আছে?' বলি আমরা কি দাতব্য চিকিৎসালয় নাকি?

বড় গাছ নিয়ে বকের পুনঃপ্রবেশ

বক। সর্, সর্, পথ ছাড়্।

নারদ। ঐ গাছ-ফাছ দিয়ে কিছু হবে না দাদা। মাথায় একটা সুপুরি বসিয়ে বরং লাগাও খড়ম।

বক। আমার ব্যাপারে তুমি নাক ঢোকাতে এসো না ঠাকুর। সরো; পথ আটকো না।

ভীমকে প্রহার। ভীম খাওয়া শেষ করে, মুখ ধুয়ে, বকের কাপড়ে মুখ মুছে নারদকে বলল–

ভীম। আঃ! বেড়ে খাওয়াটা হল। ও ঠাকুর, তোমার বটুয়াতে পান কি মসলা কি হরতুকি বা কোনোরকম মুখশুদ্ধি আছে নাকি?

নারদের কাছে ভীমের হরতুকি গ্রহণ। বকের ক্রমাগত প্রহার। ভীমের হরতুকি মুখে ফেলে গা ঝেড়েঝুড়ে জুতো পায়ে দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে সহসা বকের চুলের মুঠি ধারণ

ভীম। আচ্ছা এবার চলে আয়।

নেপথ্যে যুদ্ধের বাদ্য। রাক্ষসদের আস্ফালন।

তৃতীয় দৃশ্য

যুদ্ধস্থল

ভীম ও বক তাল ঠুকে পাঁয়তাড়া কষছে। তাদের ঘিরে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারদ ও রাক্ষসরা

বক। বলি পিঁপড়ে, বকরাক্ষসের সঙ্গে যে বড় যুদ্ধু করতে এইছিস, বলি লাইফ ইন্‌সিয়োর করেছিস তো? জানিস তোকে আমি এক্ষুনি চিপ্‌কিয়ে মেরে ফেলব? বাড়ির লোকদের কাছ থেকে ভালো করে ফেয়ারওয়েল নিয়েছিস? যাকে যা যা বলবার শেষবারের মতো বলেছিস? যা যা দেবার-থোবার, সব দিয়েছিস?

ভীম। ওরে ও বক! আমার জন্য তোর অত ভাবতে হবে না। বরং তোর ভাবনাতেই আমি গেলাম। এক্ষুনি প্রচণ্ড এক ঘুষিতে তোকে একটা তালগোল পাকিয়ে দেব, তা জানিস? কোথায় তোর হাত-পা নাক মুখ চোখ কান ভুঁড়ি, তোর বাপ-ঠাকুরদাদারাও চিনতে পারবে না রে। তখন তোর অবস্থাটা কেমন হবে বল্ দিকি?

বক। বটে! বটে! ছোটবেলা থেকে আজ অবধি তোর মতো যত অপোগণ্ড নরাধম মেরেছি, সবগুলোকে টান টান করে লম্বালম্বি শুইয়ে দিলে পৃথিবীর চার দিকে তিন বার ঘুরে আসবে, তা জানিস?

ভীম। বলিস কি রে বক? অতগুলো মানুষ তোর সামনে এসে একবারটি দাঁড়ালেই যে তুই ভয়ের চোটে পেলিয়ে যাবি!

বক। বটে! বটে! দাঁড়া—

নেপথ্যে যুদ্ধের বাদ্য। বকের যুদ্ধনৃত্য এক মিনিট

ভীম। আরে বাবা রে! এ যে দেখি বেজায় তড়পায়! আয় তবে আয়।

এবার ভীমেরও নৃত্য। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে দুজনের বসে পড়া

১ম রাক্ষস। ইক্কিরে বাবা! এরা যে দেখি পরান ভরে খালি নেত্য করে। যুদ্ধু-টুদ্ধু হবে না?

নারদ। ওমা, সে কি কথা! আমি বলি বুঝি এর পর লড়াই না হয়ে যায় না। তাই কাজ ফেলে ছুটে এনু। আমার ভাই মারামারি ব-ড্ড ভালো লাগে। কিন্তু কিছুই দেখছি না যে?

২য় রাক্ষস। ধেৎ! সব যেন যাত্রাদলের সঙ! আজকের দিনটাই মাটি! (নারদের দিকে চেয়ে) হেই ঠাকুর, তুমিই-বা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি দেখ্‌তেছ? একটা কিছু লাগিয়ে দাও-না

নারদ। আরে দুর্-দুর্! ওরা আবার যুদ্ধু করবে! তবেই হয়েছে! তার চেয়ে দুজনায় মিলে একটা সখের থিয়েটার পার্টি খুলে বসলেই পারে! আমরা টিকিট কেটে মজা দেখে আসি।

৩য় রাক্ষস। আমারও ভাই থিয়েটার দেখতে ভা-রি মজা লাগে। কিন্তু টিকিট কাটার জন্য আমার একটাও পয়সা নেই কিনা, তাই আমার কিচ্ছু দেখা হয় না।

নারদ। কিচ্ছু দেখা হয় না কি রে? আয়নায় গিয়ে নিজের মুখটা দেখলেই পারিস, তা হলে তোর সঙ দেখা হয়ে যাবে।

১ম রাক্ষস। আচ্ছা ঠাকুর, তা হলে কি সত্যিই আজকের মারামারিটা হবে না?

নারদ। হবে না মানে? আলবাৎ হবে।

২য় রাক্ষস। আমাদের এতজনাকে এতক্ষণ ধরে এত আশা দিয়ে এনে এখন বললেই হল মারামারি করবে না? ইয়ার্কি নাকি, মারামারি করতেই হবে।

নারদ। করতেই হবে। করতেই হবে।

বক। (উঠে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে) আমার নাম বক।
আমার ভয়ে কুরুপাণ্ডব কাঁপে ঠক্ ঠক্।

ভীম। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার নাম ভীম।
আমার নামে রক্ষোকুলের হাত-পা ঝিম্ ঝিম্।

বক। থামা থামা বক্‌বকানি।
দেমাক দেখে অবাক মানি!
চাল নেই,

চুলো নেই।
রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে,
ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়ে,
হেথায় এসে দাপ্‌দাপানি!
থামা থামা বক্‌বকানি।

ভীম। বলি ওহে গুণধর!
সামনে থেকে এবার সর্‌।
নিরীহ সব গ্রামবাসী
তাদের সুখশান্তি নাশি,
সবার উপর অত্যাচারি,
খাসা আছ, বলিহারি!
আজ এসেছে ভীমসেন,
ঘুচবে তোমার লেনদেন।
একটিমাত্র গদার ঘায়ে, যেথা থেকে এসেছিলে,
শেষ কটি কথা বলে, আবার সেথায় যাবে চলে।
কাঁদবে নাকো কেউ।

১ম রাক্ষস। ও ঠাকুর, মারবে বলছে! এবার একটা কিছু হবেই হবে বলে মনে হচ্ছে যে। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ।

২য় রাক্ষস। হ্যাঁ, এবার একটা কিছু না হয়ে যায় না!

নারদ। (সুর করে) ওরে নারদ নারদ বল্‌।

বক। উঃ, তোরা যে বড্ড গোল কচ্ছিস! তোদের এখানে কে ডেকেছে বল্‌ তো? তোদের কি কোনো কাজকম্ম নেই?

ভীম। হ্যাঁরে, তোর তাতে কি রে বক? ওদের যদি কাজকম্ম নাই থাকে, ওরা যদি বেকারই হয়, তোর তাতে কোন্‌ অসুবিধাটা হচ্ছে তাই বল্‌? না হে, এই আহাম্মুকটার কথায় তোমাদের কান দিতে হবে না। তোমরা আমার দলের লোক। বরং তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখ আমি রাস্‌কেলটাকে ক্যায়সা একটা ডবল্‌ রদ্দা কষিয়ে দিই। তার পর একটা ডান-পটকান লাগিয়ে ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়াকে একেবারে ভূমির উপর পাটির মতো বিছিয়ে দেব। যাকে বলে একেবারে 'মাটিং চকার' করে দিই কেমন, একবার শুধু চেয়ে দেখ।

বক। তাই বটে! তাই বটে! নেহাত তোকে একটা উচিত শিক্ষা

না দিলেই নয় দেখছি। (হাতের বাইসেপ্ চাপড়ে) উঃ! তোকে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য, হাত দুটো চিড়্‌বিড়্ করছে। (বুক চাপড়িয়ে) একবার এমনি জাপটিয়ে ধরব যে এক্কেবারে আলুভাতে বানিয়ে দেব। (ট্যাঁক থেকে বটুয়া বের করে নারদের হাতে দিয়ে) ধরো তো ঠাকুর আমার মনিব্যাগটা। নইলে ভীমভবানী প্যাঁচটা কষবার সময় আমার ভারি অসুবিধা হবে। তা ছাড়া, ঐ ব্যাটাকেই-বা বিশ্বাস কি? গোলমালের মধ্যে কখন আমার পকেট মারে তারই-বা ঠিক কি? নিজের ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ।

ভীম। (বকের পিঠে প্রচণ্ড এক কীল মেরে) চোপ্। যতই কিছু বলি না, ততই তোর বাড় বেড়ে যায় দেখছি।

কোলাহল। কুন্তী, হিড়িম্বা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলের প্রবেশ

হিড়িম্বা। এই রে, এইবার একটা মারপিট না হয়ে যায় না। কেমন চোখ রাঙাচ্ছে দেখেছ?

যুধিষ্ঠির। বৎস ভীম, তোর আর কোনো ভয় নেই রে ভাই। এই যে আমরা চারজনা এসে পড়েছি। কে তোকে মারে দেখব। আয়, এই সুযোগে তুই টপ্ করে আমাদের কাছে পালিয়ে আয় তো। তোর সব বেয়াদপি ক্ষমা করে, আমরা তোকে সাহায্য করতে এসেছি।

কুন্তী। (বককে) আর তোমারই-বা কি আক্কেল বাপু? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তবু ঐ ছেলেমানুষের সঙ্গে লাগতে যাও?

যুধিষ্ঠির। ভীম, ভীম, তোকে উদ্ধার করবার জন্যই আমরা এইচি। এই বেলা পালিয়ে আয়।

অর্জুন। ইস্! বকটাও আবার সব্ স্যাঙাৎ-সাগরেদ জুটিয়ে এনেছে দেখছি। দুষ্টু লোকদের কি আর সঙ্গীর অভাব হয়?

নকুল। মোটেই না, মোটেই না, দুনিয়াসুদ্ধ সবাই তাদের বন্ধু।

সহদেব। হ্যাঁ, সক্কলের সঙ্গে এক্কেবারে গলায় গলায় ভাব!

অর্জুন। আচ্ছা, তোরা কি এখানে এসেও টিয়েপাখির মতো বুলি আওড়াবি না কি? তখন থেকে বারণ করছি না!

যুদ্ধের বাদ্য। নারদ প্রভৃতির ব্যস্তভাব

নারদ। আহা, আপনারা এসে সব মাটি করে দিচ্ছেন। সরুন, সরুন, ওদের জায়গা দিন।

৩য় রাক্ষস। ভীষণ যুদ্ধ হবে, তাও জানেন না?

২য় রাক্ষস। এক্ষুনি সাংঘাতিক মারামারি হবে। দুজন দুজনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

১ম রাক্ষস। দু-তিন ঘণ্টা ধরে দারুণ যুদ্ধ হবে। এও ছাড়ে না, ও-ও ছাড়ে না। চারি দিক অন্ধকার করে আসবে। চাঁদ সুয্যি ভয়ের চোটে মুখ ঢাকবে। আকাশ থেকে তারারা সব খসে পড়বে। বাজ পড়বে। ভূমিকম্প হবে। রক্তগঙ্গা বইবে। সবাই মরে কুচিকুচি হয়ে যাবে। ইস্।

হিড়িম্বা। কী মজা! না রে?

২য় রাক্ষস। কিন্তু তা হলে দুজনেই মরে কুচিকুচি হয়ে গেলে যুদ্ধে কে জিতবে? আমি যে আটআনা পয়সা বাজি ধরেছি।

৩য় রাক্ষস। অ্যাঁ! তাই তো! আমিও তো তাই। তা হলে কী হবে?

হিড়িম্বা। হ্যাঁগা, মাঝখানে একবার টিপিনের ছুটি হবে না?

নারদ। টিপিন কি কিছু বাকি রেখেছে যে টিপিনের ছুটি হবে মাঠাকরুন?— এদিকে তোরা সবাই মিলে তো আচ্ছা মজা লাগিয়েছিস। এইবার থাম্ দিকিনি, ঐ দ্যাখ্ শুরু হল বলে।

সকলের ইদিক-উদিক বসে পড়া, ভালো জায়গা নিয়ে ঠেলাঠেলি...ইত্যাদি। মাঝখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জায়গা। ভীম ও বকের পরস্পরকে অবলোকন। তার পর ভীষণ যুদ্ধ। একবার ভীম সরে যায়, একবার বক। অবশেষে ভীম বককে বগলদাবা করে। রণবাদ্য। পাণ্ডবদের উৎসাহ। রাক্ষসদের হতাশা। খানিক পরে বককে দূরে নিক্ষেপ করে ভীম রক্তচোখে তাকায়

নারদ। ইস্! দেখলি! বকটাকে তুলে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিল!

ভীম। আর কারো মরবার সখ হয়ে থাকলে এগিয়ে এসো। (রাক্ষসদের প্রতি) কি? তোমাদের কিছু বলবার আছে?

রাক্ষসগণ। (হাঁটু গেড়ে) না স্যার! না স্যার!

ভীম। (পাণ্ডবদের প্রতি) তোমাদের কিছু বলবার আছে?

যুধিষ্ঠির। আরে না না। আমরা আবার কী বলব?

অর্জুন। শুধু তোমাকে অভিনন্দন করা ছাড়া আমাদের আর কোনো কর্তব্য নেই।

নকুল। ঠিক, ঠিক, কিছু করব না, শুধু তোমার প্রশংসা করব।

ইস্ ! দেখলি ! বকটাকে তুলে কোথায় ছুঁড়ে দিল !

সহদেব। হ্যাঁ, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, আর থেকে থেকে তোমার জয়গান করব।

কুন্তী। বাছা, বক্ষে এসো। আর কক্ষনো ওরকম মারামারি কোরো না।

হিড়িম্বা। আর অত খেয়ো না। ওতে চিত্ত তামসিক হয়ে যায়। অন্যরা কিছু পায় না।

ভীম। এই রাক্ষসরা, যা তোদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রাখিস, এখন থেকে নিরামিষ খাবি, হরিনাম করবি আর কক্ষনো যুদ্ধের সময় ওরকম হট্টগোল করবি না। যা, পালা।

[রাক্ষসদের পলায়ন

কুন্তী। (নারদকে প্রণাম করে) ভগবন্, এবার তোমায় চিনেছি। তুমিই যে এই-সমস্ত ব্যাপারটার মূলে, সেটা এতক্ষণে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ঠাকুর। এবার তা হলে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করে বিদায় দাও।

নারদ। বেশ, তাই হোক। এই বর দিলাম যে, যখনই তোমার পুত্ররা ঝগড়াঝাঁটি করবে, তখনই তারা জয়যুক্ত হবে। এখন যদিও ঐ বক-নিশাচরকে বধ করে তোমাদের কোনো পাপই হয় নি, তথাপি বাড়ি ফিরে গিয়ে সবাই মিলে কিঞ্চিৎ বেদগান কোরো। বলা তো যায় না।

এই যা দেখা

উৎসর্গ

বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য

এই যা দেখা

কলকাতা শহরের উত্তর দিকে সরু একটা সদর রাস্তা, তাতে লোকজন গাড়িঘোড়ার ভিড় কত, ভোর থেকে গভীর রাত অবধি হাঁকডাক ঠেলাঠেলি। লোকে বলে পথটা খুব পুরনো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কালে তৈরি, ঘরবাড়িগুলো এ ওর গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে, কোথাও এক তিল ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে না।

এখন ঐ রাস্তা থেকে বেরিয়েছে একটা অন্ধ গলি, তার ফুটপাথ নেই, গোটা কতক বাড়ি, একটা ছোট মন্দির, তার পরে আরো গোটা দুই বাড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা লোহার ফটকের সামনে পৌঁছে গলিটা শেষ হয়ে গেছে! ফটকের ভিতরে দেখা যায় বিশাল একটা তিনতলা বাড়ি, তার সারি সারি জানলা, লম্বা-লম্বা ঝিলিমিলি দেওয়া বারান্দা।

নব্বই বছর আগে ঐ বাড়ির বারান্দায় বাদলা দিনে একটি ছোট সুন্দর ছেলেকে দেখা যেত। এক দৃষ্টে গলির দিকে চেয়ে আছে, মনে তার বড় আশা আজ হয়তো মাস্টারমশাই পড়াতে আসবেন না, পথঘাটে যেরকম বৃষ্টির দাপট! কিন্তু সে গুড়ে বালি, রোজই যথাসময় দেখা যেত কালো ছাতা মাথায় দিয়ে সাবধানে জল ভেঙে মাস্টারমশাই এগিয়ে আসছেন। ঐ ছোট ছেলেটির নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাড়িটি ওঁদের জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ি, গলিটির নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, বড় রাস্তাটি হল চিৎপুরের সদর রাস্তা।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন কলকাতার পথে গ্যাস বাতিও জ্বলত না, বিজলি বাতিও জ্বলত না, খালি দূরে দূরে আগে রেড়ির তেলের আলো জ্বলত। পরে যখন কেরোসিনের বাতি হল সকলের মনে হত এবার কত আলো হয়েছে!

কলের জলও ছিল না তখন। পথের ধারের বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় হড়্ হড়্ করে গঙ্গার জল বেয়ে এসে ঠাকুরবাড়ির পুকুরটিকে ভরে দিত, তখন মাছগুলোর সে কী আকুলিবিকুলি! তবে ও জল কেউ খেত না, সারা বছরের খাবার জল বেহারারা মাঘ—ফাল্গুন মাসে গঙ্গা থেকে বয়ে এনে একতলার অন্ধকার সব ঘরে বড়-বড় জালায় করে ভরে রাখত। ঐ ঘুপ্‌সি স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলোর কথা মনে করলেও ছোট্ট রবির বুক টিপ্‌টিপ্ করত।

তার উপর সারাদিন যে ঝি-চাকরদের হেপাজতে থাকতে হত, তাদের মুখে কতরকম যে ভয়ের গল্প শোনা যেত তার আর লেখাজোখা নেই। রাত হলে উঠোন পেরোতেই ভয় করত।

ভারি আশ্চর্য ছিল ঐ বাড়িটা। এখানে একটা বড় উঠোন, ওখানে একটা ছোট উঠোন। সেইরকম একটা উঠোনের ধারে কোনো-একটা ছোট ঘরে রবি নামে ছেলেটি জন্মেছিল। তার পর থেকে ঐ বাড়িতেই তার দিন কেটেছে, তবু গোটা বাড়িটাকে আগাগোড়া তার কখনো দেখা হয় নি, এমনি বিরাট বাড়ি।

তা ছাড়া দেখার অসুবিধাও ছিল বিস্তর। সারা বাড়ি জুড়ে লোকজন গিস্‌গিস্ করত; বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা তো ছিলেনই, তার উপর চাকর, দাসী, আমলা, দারোয়ান, কোচোয়ান, পালোয়ান, পণ্ডিত, স্যাকরা দরজি, মাস্টারমশাই, আর বড়দের বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে বাড়িটাকে এমনি জাঁকিয়ে রেখেছিল যে তার মধ্যে একটা পাতলা ছিপ্‌ছিপে ফরসা ছোট ছেলের মাথা গলাবার জো ছিল না।

ফরসা ছেলে বললাম বটে, কারণ অমন সুন্দর মানুষ কমই দেখা যায়, তবু ও-বাড়ির বেশির ভাগ লোকেরই এমন ফরসা রঙ ছিল যে রবীন্দ্রনাথের দিদি বলতেন, 'রবি আমাদের কালো।'

মস্ত নামকরা পরিবার ওঁদের। শুধু ধনে মানে নয়, শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজ-সংস্কারে, দেশসেবায়, ওঁদের সঙ্গে সে-সময়কার কারো তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদাকে লোকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

বলে জানত, ধনে মানে শুধু এদেশে কেন বিলেতেও তাঁর ভারি মর্যাদা ছিল। রাজারাজড়ার সঙ্গে সমানে মিশতেন, দুহাতে পয়সা খরচ করতেন। ভারি উদার, উন্নত মনও ছিল।

অকালে যখন মারা গেলেন, বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে সমস্ত বিশাল পরিবারটার অভিভাবক হয়ে দাঁড়াতে হল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল দেনা রয়েছে বিস্তর, নগদ কিছু নেই। দেবেন্দ্রনাথ বাড়িঘর সম্পত্তি ছেড়েছুড়ে দিয়ে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু পাওনাদারদের মনেও যেন তাঁর মনের উদারতার ছোঁয়া লেগে গেল। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, পৈতৃক সম্পত্তির ভার নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ধার শোধ করে দিতে।

করলেনও তাই দেবেন্দ্রনাথ। কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ঋণ শোধ কেন, কবে কাকে দ্বারকানাথ টাকা দান করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সে-সবও পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিলেন। যেমন ছিল তাঁর হৃদয়ের বিশালতা, তেমনি ছিল তাঁর মেধা। কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁকে মহর্ষি উপাধি দিয়েছিল।

জাতে ওঁরা ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ। ভালো ব্রাহ্মণদের ঘরে ওঁদের বিবাহাদি চলত না, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন সমাজের নেতা। এক কথায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আধুনিক বাংলার গুরু বলা যেতে পারে। যে কজন মনীষী সে-কালের হিন্দু সমাজের প্রাচীন সংকীর্ণতা ত্যাগ করে আধুনিক শিক্ষার আলোয় উদ্‌ভাসিত, প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রেরিত একটা সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধের স্বপ্ন দেখতেন, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যাঁদের নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী।

এমনি বাপের ছেলে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বড় আরো তেরোজন দাদা দিদি ছিলেন। এক বছরের ছোট একটি ভাইও হয়েছিল, কিন্তু সে বাঁচে নি। বড় ভাইবোনদের বেশির ভাগের সঙ্গেই বয়সে অনেক তফাত। সঙ্গী ছিল তাই সামান্য বড় ভাগনে সত্য, আর এক বছরের বড় দাদা সোমেন্দ্রনাথ। তা ছাড়া বাড়ির ছোট বড় আরো ছেলেমেয়ে তো ছিলই। বাঁ ধারের বড় বাড়িতে থাকতেন মহর্ষির এক ভাইয়ের পরিবারবর্গ, তাঁরাও নেহাত অল্প সংখ্যক ছিলেন না। ঐ বাড়িটাই শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ি। দুই বাড়ি মিলে সারাদিন সে যে কী একটা এলাহি কাণ্ড চলত সে ভাবা যায় না।

রবির দু-বাড়ির দাদাদেরই ছিল নানান সখ, ভারি গুণীও ছিলেন তাঁরা। সমস্তক্ষণ বাড়িতে একটা যেন গান বাজনার, নাটক কাব্য ও সাহিত্যালোচনার মহড়া চলত। নানান নামকরা শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিকের নিত্য যাওয়া-আসা ছিল।

গানের আসর, যাত্রা, সখের থিয়েটার প্রায়ই চলত। শহরের যত বিখ্যাত লোক পেটের ওপর মোট-মোটা সোনার ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে জুড়িগাড়ি চেপে আসতেন। স্বয়ং বাংলাদেশের লাটসাহেব পর্যন্ত এসেছিলেন, এমনি ছিল তাঁদের সুনাম।

নাটক অভিনয় দেখবার জন্য দুই বাড়ির ছেলেপুলেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, কিন্তু নিজের চোখে দেখবার বড় একটা সুযোগ হত না, কারণ তখনকার নিয়ম ছিল ছোট ছেলেরা বড়দের সৌখিন ব্যাপারের বাইরে থাকবে। জানলা দিয়ে বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে হাঁ করে তারা লোকের যাওয়া-আসা দেখত আর মাঝে মাঝে বাজনার ক্যাঁ কোঁ আর ক্ষীণ একটু গানের সুর শুনে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হত। এক-আধবার খানিকক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকার অনুমতি পেলে আহ্লাদে আটখানা হত।

ঐ-সব নাটক দাদারা কিংবা তাঁদের বন্ধুরাই বেশির ভাগ লিখতেন, নিজেরাই অভিনয় করতেন। নাটক লেখা কেমন করে হয় ছোট-বেলা থেকেই রবি অনেক দেখেছিল, একটু বড় না হতেই হাত লাগাবার ডাকও পড়ত মাঝে মাঝে। গোটা বাড়ি জুড়ে ভারি একটা নাটুকে হাওয়া বইত। কতরকম লোক যে আসত যেত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার একটা লোক এসে দশটাকা বাজি ধরে এক মণ রসগোল্লা খেয়ে পকেটে পয়সা ফেলে দিব্যি চলে গেল। একবার ডাকাতদের খেলা দেখানো হল, কেমন করে বাঁশে চড়ে দোতলায় ওঠা যায়, উঁচু পাঁচিল টপকানো যায়; কেমন করে রণ-পা চড়ে নিমেষের মধ্যে বহুদূর চলে যাওয়া যায়, এই-সব।

তা ছাড়া বাড়িটার মস্ত-মস্ত সাজানো হলঘর, ঘোরানো সব সরু সরু সিঁড়ি, অজানা অচেনা সব রহস্যে ভরা জায়গা ছোট ছেলের কল্পনার ঘোড়াকে যেন চাবুক লাগাত। এমন রঙিন ছোটবেলা কম মানুষের কপালে জোটে। ওঁদের চালচলন কিন্তু ছিল একটু সেকেলে। অন্দরমহলে মেয়েরা থাকতেন, পুরুষরা বাইরের মহলে। ছেলেরা

একটু বড় হতেই তখনকার নিয়ম ছিল মেয়েদের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে বাইরের মহলে চাকরবাকরদের জিম্মা করে দেওয়া। ছোট্ট রবি ও তার সঙ্গীদের তখন দুর্ভোগের আর সীমা রইল না। খাওয়া-দাওয়া সব-কিছু ছিল চাকরদের হাতে, তাদের নামে নালিশ করবারও কোনো উপায় ছিল না। কাজেই এদিকে খাবারের ভাগেও কম পড়ত, ওদিকে যে-কোনো উপায়ে ছেলেদের ঘরে আটকে রেখে চাকররা সর্বদা আড্ডা দেবার চেষ্টায় থাকত। এ-সব কথা কবি বড় হয়ে কতবার দুঃখ করে লিখেছেন।

দোতলার একটা ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে গোলমতো একটা দাগ কেটে একজন চাকর বলত, খবরদার, এই দাগের বাইরে যেয়ো না, তা হলে বিপদ হবে। এই বলে সে দিব্যি বেরিয়ে যেত, আর ভয়ের চোটে ছোট্ট রবি বসে থাকত দাগের মধ্যে। গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতার কী বিপদ হয়েছিল সে কথা তার অজানা ছিল না।

জানলা দিয়ে তাদের বাড়ির পাশে একটা পকুরে পাড়ার লোকের স্নান করা দেখে তার কত সময় কেটেছে। একটা বুড়ো বটগাছ ছিল, সেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই দিন গেছে। পরে কত কবিতায় গল্পে এ-সব কথা ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

তবে এ-সব দিনেরও শেষ হল, ছোট্ট রবি বন্ধ ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে জুটে গেল। তারাও কম মজাদার ছিল না। ছোট্ট একটা মেয়ে প্রায়ই বলত একটা আশ্চর্য জায়গার কথা, যেখানে সে নাকি যাওয়া-আসা করে। এই বাড়িরই কোথাও সে জায়গাটা, কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও ছোট্ট রবি আর তাকে পায় নি। সেটা নাকি রাজার বাড়ি, সে রাজার বাড়ির কথা রবি বড় হয়ে কবিতায় লিখে গেছে।

রবির বাবাও ছিলেন একজন রহস্যময় মানুষ, যেমনি সুন্দর তেমনি গম্ভীর। বেশির ভাগ সময়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান, তখন বাড়িটার চেহারাই যায় বদলে। সবাই কেমন ব্যস্ত তটস্থ হয়ে থাকে, চাকর-বাকররা সেজে-গুজে ছুটোছুটি করে, রবির মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধাবাড়ার তদারকি করেন, কত অতিথি-অভ্যাগতের আগমন হয়। বাবা যে একজন অসাধারণ কেউ, খুব ছোটবেলা থেকেই রবি সেটা বুঝে নিয়েছিল।

তবে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর খুব কাছে যাবার সুযোগ হয় নি। দাদারাই ছিলেন তার আসল অভিভাবক। মার কাছে রাতে শুতে যাওয়া; বুড়ি এক দিদিমা ছিলেন, মার খুড়ি, তাঁর কাছে গল্প শোনা; আর দিনেরবেলা মেয়েদের তাস খেলা, গল্প করার আড্ডায় অল্পবিস্তর দৌরাত্ম্য করা, এই করে সময় কাটত। কিন্তু আসল অভিভাবক দাদারা, তাঁরাই ছোট ভাইয়ের পড়াশুনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন।

জীবনটা মোটের ওপর কাটত খুব সাদাসিধা ভাবে। জামা-কাপড়ের বিশেষ বালাই ছিল না, শীতকালেও দুটি সুতির জামাই যথেষ্ট বলে মনে করা হত। তবে তাতে পকেট থাকলে খুবই ভালো—পায়ে সাধারণ চটি, এই পরেই দিন কাটত। বাড়িতে যতই বড়মানুষির হাওয়া বয়ে যাক-না কেন, ছোটদের বেলায় এই ব্যবস্থা। কিন্তু এতে কবির যে ভালো বৈ মন্দ হয় নি, এ কথা তাঁর জীবনে বহুবার প্রমাণ হয়েছে। যখনই তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তখনই অকাতরে করতে পেরেছেন; কষ্টকে কখনো ভয় করেন নি।

সত্যি কথা বলতে কি, আগের তুলনায় তখন ওঁদের অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। তবু যা ছিল তাও নেহাত সামান্য নয়। উড়িষ্যাতে জমিদারি, বাংলাদেশেরও একাধিক জায়গায় জমিদারি, ব্যবসা ইত্যাদি ছিল। জোড়াসাঁকোর ঐ বাড়িটি করেছিলেন দ্বারকানাথের ঠাকুরদাদা নীলমণি ঠাকুর। দশ বিঘে জমি জুড়ে ছিল ঐ বাড়ি, দালান, আস্তাবল, গোলাবাড়ি, আখড়াবাড়ি— যেখানে কুস্তিখেলা শিখত বাড়ির সব ছেলেরা, খানিকটা বাগান ছিল, পুকুর ছিল। বড়লোক বলে খ্যাতিও ছিল ওঁদের।

লোকে ওঁদের বিষয় কত গল্প করত! বাংলাদেশে প্রথম যে মেয়েরা শিক্ষিত হলেন, পরদার বাইরে এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওঁদের বাড়ির মেয়েরাই। ভদ্রসমাজের মেয়েরা কিরকম আচরণ করবেন তার অনেকখানিই ওঁদের বাড়ি থেকে স্থির হয়ে যেত!

গোঁড়া হিন্দুরা অবশ্য সে-সবের সমর্থন করতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, ওঁদের বাড়িটি ছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণের কেন্দ্র, এতে যে প্রাচীনপন্থীরা রুষ্ট হবেন সে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কালের ফেরে দেখা গেল তাঁদের সেই-সব আদর্শগুলোকে শুধু বাংলাদেশ কেন, গোটা ভারতবর্ষই আনন্দের সঙ্গে

গ্রহণ করেছে। এইরকম একটা পরিবারে যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, সেটা তাঁর মস্ত সৌভাগ্য।

কবিদের মন হয় বড় সূক্ষ্ম, যেখানকার যত প্রভাব সব-কিছুর বিষয়ে বড় সচেতন। ছোটবেলাকার এই জীবনযাত্রা, এই পরিবেশ, এই চেনাজানা মানুষগুলো প্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর যে ছাপ রেখে গেছে, কত-না গল্পে গানে, কাব্যে সেগুলি তিনি পৃথিবীকে দান করে গেছেন। কোনো-কিছু একেবারে হারিয়ে যায় নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবির সঙ্গী দুটি, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য, এবার স্কুলে ভরতি হল। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে, সেজেগুজে, বই খাতা নিয়ে, গাড়ি চেপে তাদের স্কুলে যাওয়া দেখে রবিও বায়না ধরল সেও স্কুলে যাবে। সবাই কত বোঝালেন, এখনো তোমার স্কুলে যাবার বয়স হয় নি, তা কে কার কথা শোনে! ছেলে এমনি কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে, শেষপর্যন্ত তাকেও সত্যি সত্যি স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল।

বাড়ির মাস্টারমশাই কষে এক চড় লাগিয়ে বললেন, এখন স্কুলে যাবার জন্য যত-না কান্না হচ্ছে, পরে না যাবার জন্য এর চেয়েও বেশি কান্না হবে।

হলও ঠিক তাই। ইট কাঠের তৈরি বদ্ধ ঘরে কয়েদ হয়ে লেখা-পড়া শেখা জীবনে ও-ছেলে সইতে পারে নি। স্কুলে ভরতি হয়েই স্কুল পালানোর নানান অছিলা খুঁজে বেড়াত। বাড়ির শিক্ষকদের কাছেও ঐ স্কুলের নিয়মে-বাঁধা পড়া অসহ্য মনে হত। কত সময় ভালোমানুষ মায়ের শরণাপন্ন হয়ে, মনগড়া সব ব্যামোর কথা পেড়ে মাস্টারমশাইকে সেদিনকার মতো বিদায় করে দেওয়া হত।

স্কুলে কিছুতেই মন বসত না। অভিভাবকরাও সন্তুষ্ট হন না। দেখতে দেখতে তিনটে স্কুলে কিছুদিন করে পড়া হল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, নর্মাল স্কুলে, ও বেঙ্গল একাডেমিতে। সব জায়গাতেই সেই একই নিষ্প্রাণ নিয়মে বাঁধা, কল্পনাবর্জিত, ধরাবাঁধা পড়ার ব্যবস্থা। মন সেখানে ফুটতে পারে না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ছোট রবি কেবলই

পালিয়ে বেড়ায়। বাড়ির লোকে অধৈর্য হয়ে ওঠেন, মনে ভাবেন এই ছেলেটার কিছু হবে না।

দাদারা সব জ্ঞানীগুণী ; বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে লোকে ঋষি বলত, দার্শনিক বলে ভক্তি করত। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সুসাহিত্যিক, ইউরোপীয় সংগীতে দুরস্ত। দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন বিদুষী ও সু-লেখিকা। অন্যান্যদেরও নানান বিষয়ে প্রতিভা ছিল।

এঁদের ছোটভাই হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিনা সামান্য স্কুলের লেখা-পড়াটাও করতে নারাজ। ছেলেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কিন্তু আসলে বিদ্যাশিক্ষার উপর তার কোনো রাগ ছিল না। লেখাপড়া শেখাবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই নিয়েই ছিল গোলমাল। তার মতো লেখাপড়াকে কম লোকই ভালোবেসেছে।

ছোটবেলাই ঐ চাকর মহলেই দেশের সাহিত্যে মন বসে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় চাকরদের পাণ্ডা ব্রজেশ্বর মিট্‌মিটে তেলের আলোতে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাত। আবদুল মাঝির মুখে বাঘের গল্প, কুমিরের গল্প শুনত। মেয়েদের মজলিসে মাসিক পত্রিকা থেকে গল্প পড়ে শোনাবার লোক দরকার হলে, ছোট রবির ডাক পড়ত। কিশোরী চাটুজ্যে সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি সুর করে মুখস্থ শোনাত।

তার পর বাড়িতে সেজ দাদা হেমেন্দ্রনাথ যে কতকগুলো নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তার মধ্যে একবার পড়ে গেলে কারো পক্ষে মুখ্যু থাকাই ছিল অসম্ভব। সারাদিনের মধ্যে থেকে স্কুল তো অনেকটা সময় নিয়ে নিত, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার তালিকাতে সেইটুকুই সব নয়। শিক্ষা শুরু হত ভোরে। ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির মধ্যে আখড়াবাড়িতে শহরের এক ডাকসাইটে পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হত। রবীন্দ্রনাথের মায়ের আবার ছিল ভারি ভয়, কাদা মেখে ছেলে যদি কালো হয়ে যায়, তাই রবিবারে তাকে বাদাম-বাটা, সর ইত্যাদি মাখাতে বসে যেতেন।

কুস্তির পর চলত মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা শেখা, একটা সত্যিকার মানুষের কঙ্কাল দেখে দেখে। তাইতে হাড়গোড়ের ভয় গেল ভেঙে। তার পর সকাল সাতটা বাজতেই নীলকমল মাস্টারের কাছে বাংলায় অঙ্ক শেখা। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃত।

স্কুল থেকে ফিরেও রেহাই ছিল না। প্রথমে জিমনাস্টিকের মাস্টার,

তার পর ছবি আঁকার মাস্টার, তার পর সন্ধে হলে অঘোর মাস্টারের কাছে ইংরেজি পড়া। এত সবের মাঝখানে মুখ্যু হয়ে থাকবার জো ছিল কোথায় ?

তবে পালিয়ে বেড়াবার আরেকটা সহজ উপায়ও আছে, সেটা হল কল্পনার ঘোড়ায় চেপে। ও বাড়িতে চাকরদের মহলকে বলা হত তোষাখানা। তারই কাছে ছিল পড়ে একটা রঙ-চটা পুরনো পালকি ; দেখেই বোঝা যেত যে এককালে তার বাহার ছিল কত। এখন অবিশ্যি তার গদি ছিঁড়ে নারকোলের ছোবড়া গেছে বেরিয়ে। কিন্তু দরজা দুটো টেনে দিলে সেই আধ অন্ধকারে একলা বসে মনে মনে কোথায় যে না যাওয়া যেত তার ঠিক কি! গভীর রাত্রে, তেপান্তরের ওপারে, নির্জন বনপথে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই হোক, কি সমুদ্রের বুকে নৌকাযাত্রাই হোক, কোনো কিছুতেই বাধা ছিল না।

তা ছাড়া কতকগুলো কাঠের রেলিং ছিল, সেগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে খানিকটা মনের জ্বালা দূর করা যেত। কতকগুলো রেলিং আবার এমনি দুষ্টু ছিল যে সেগুলোকে আচ্ছা করে না পিটিয়ে উপায় ছিল না। এমনি বেদম মার খেত তারা যে শেষপর্যন্ত ঢিলে হয়ে খুলে আসে আর কি! তবে তাতে করে তাদের স্বভাব না বদলালেও স্কুলে যাবার দুঃখ খানিকটা কমে যেত।

রবি মাঝে মাঝে খোলা ছাদে একলা চলে যেত। গিয়ে দেখত দূরে যেখানে আকাশের সঙ্গে পৃথিবী গিয়ে মিশেছে, সেই পর্যন্ত শুধু ছাদের পর ছাদ। আর মাথার ওপরে নীল আকাশে মেঘ ভাসছে, চিল উড়ছে।

হাত গলিয়ে খিল খুলে বাবার স্নানের ঘরে ঢোকাতেও কোনো বাধা ছিল না। বাবা বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘুরতেন। ততদিনে কলকাতা শহরে জলের কল বসে গেছে, নির্জন দুপুরে বাবার নাইবার ঘরের কলে আরেকবার স্নান করার সে যে কি আরাম! তার পর পা ছড়িয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে-শুয়ে যা ইচ্ছে তাই ভাবা যেত।

চার দিকে সাধারণ জীবনযাত্রা চলতে থাকে, দেউড়িতে দারোয়ানরা ডন-বৈঠক কষে ; সওদা নিয়ে ঝি উঠোন পার হয়ে আসে ; অন্দরের ছাদে বাড়ির মেয়ে বউরা আচার শুকোয়, আমসত্ত্ব দেয়, বড়ি দেয় ; বারান্দার কোণে নেয়ামৎ আলি দরজি জামা ছাঁটে ; পথ দিয়ে ফেরি-ওয়ালারা বেলফুল হেঁকে যায় ; চুড়িওয়ালার, কুলপি বরফওয়ালার ডাক

শোনা যায়। এত সবের মাঝখানে ছোট রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বকবির আসন নেবেন বলে আস্তে আস্তে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তৈরি হতে থাকেন।

একটু একটু করে বড় হতে থাকেন, ফুলের মতো ধীরে ধীরে মনের পাপড়িগুলোও খুলতে থাকে। বাড়িতে বিষ্ণু বলে গানের মাস্টার দিশি গানে হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন সেই কোন ছোটবেলায়। এখন একবার দুবার শুনলেই যে-কোনো গান গলায় এসে যায়, পরে মেয়েদের আড্ডায় শুনিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে খুব সহজে বাহবা পাওয়া যায়। বাড়িতে সারাদিন গানের হাওয়া বয়।

ওঁদের বাড়ির বন্ধু ছিলেন শ্রীকণ্ঠবাবু, যেমনি তাঁর গলা ছিল, তেমনি গানে অনুরাগ। গান তো শেখাতেন না, মনে হত গানগুলো দিয়ে দিচ্ছেন, নিজের অজানতেই শেখা হয়ে যেত।

আরেকটু বড় হলে বিখ্যাত ওস্তাদ যদুভট্টও ওঁদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু কারো কাছে নিয়ম করে গান শেখা কবির ধাতে সইত না। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলেন, সেইগুলোই নাকি ওঁর বর্ষার গানের সঙ্গে এখনো দল বেঁধে থেকে গেছে। এমনি করে গলায় সুর এসে গেল, গানের কান খুলে গেল।

এই গানের মধ্যে দিয়েই পরে এক সময় বড়দের রাজ্যে চলেছিল ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের যাওয়া আসা। বারো বছরের বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে ঝমাঝম্ বিলিতি সুর বাজিয়ে রবিকে বলতেন কথা বেঁধে দিতে। সন্ধেবেলায় ছাদের উপরে ছোটখাটো একটি আসর বসে যেত। কিন্তু তার আগে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হল বাবাকে কাছে পাওয়া।

অনেকদিন আগে বাবাকে একবার ছোট্ট রবি চিঠি লিখেছিল। বাবা তখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছেন, এমন সময় গুজব উঠল হিমালয় পেরিয়ে রুশেরা নাকি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে। রবির মায়ের হল ভারি ভয়, কর্তা যে আবার ঐ হিমালয়েই গেছেন। ভয়টা বড়দের কাছে বলতে হয়তো লজ্জা পেয়েছিলেন, তাই ছোট্ট রবিকে ধরে এক চিঠি লেখালেন। বাড়িতেই সেরেস্তা, সেখানকার একজন কর্মচারীর সাহায্যে যথাযোগ্য সম্বোধন শিরোনামা দিয়ে চিঠি লেখা হল। তার উত্তরও এল। বাবা লিখলেন, রবি যেন কোনো ভাবনা না করে,

রুশেরা এলে তিনি নিজের হাতে তাদের তাড়িয়ে দেবেন। চিঠি পেয়ে ছেলে আনন্দে আত্মহারা।

হঠাৎ সেই বাবাকে একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল। এগারো বছর দশ মাস বয়সে মহর্ষি এসে রবীন্দ্রনাথের পৈতে দিলেন। পৈতের পর নেড়া মাথার উপর ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুপি চাপিয়ে বাবার সঙ্গে রবি হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। স্কুলের পড়া রইল শিকেয় তোলা। আগ্রহে অধীর হয়ে বাবার সঙ্গে এই প্রথম রবি ট্রেনে চাপল। পাহাড়ে যাবার আগে কদিন শান্তিনিকেতনে থাকা হবে।

ট্রেনে চাপতে গিয়ে দেখা গেল যে ব্যাপারটাকে যতটা কঠিন বলে সত্যর মুখে শোনা গিয়েছিল, আসলে তার কিছুই নয়। সে তো বলেছিল নাকি প্রাণ হাতে করে রেলগাড়িতে চড়তে হয়। আরো বলেছিল যে শান্তিনিকেতনে একটা আশ্চর্য রাস্তা আছে, সেটার উপর ছাদটাদ নেই, তবু সেখান দিয়ে হাঁটলে গায়ে রোদও লাগে না, বৃষ্টিও লাগে না। সেই পথটিও রবি কত খুঁজেছিল কিন্তু পায় নি।

তার বদলে পেয়েছিল বাবাকে খুব কাছাকাছি। তাঁর সঙ্গে খোয়াইয়ের মধ্যে বেড়িয়েছিল। লাল মাটি ক্ষয়ে গিয়ে ঠিক মনে হয় তার পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, তাকেই বলে খোয়াই। তার মধ্যে গাছপালা বিশেষ হয় না, খালি কয়েকটা কাঁটা-ঝোপ, খেজুরগাছ আর মনসাগাছ।

বর্ষায় খোয়াইয়ের মাঝখান দিয়ে জলের ধারা বয়ে যায়, ছোট-ছোট ঝরনা তৈরি হয়, এখানে ওখানে জল জমে থাকে, তার মধ্যে খুদে-খুদে মাছ সাঁতরে বেড়ায়। খোয়াইয়ে নেমে নানারকম সুন্দর নুড়ি আর পাথর কুড়নো যায়। সেই খোয়াই দেখে রবির কি আনন্দ! পাথর কুড়িয়ে বাবাকে দেখালে বাবাও কত খুশি হন!

শান্তিনিকেতনে এসে রবির মন যেন ছাড়া পেল, এখানকার খোলা মাঠ আর নীল আকাশ তাকে মুগ্ধ করল। তখনো ঘরবাড়ি বিশেষ কিছু হয় নি। শোনা যায় গোরুর গাড়িতে করে মহর্ষি একবার রায়পুরের সিংহদের বাড়িতে যাবার সময় নির্জন মাঠের মধ্যে দুটি ছাতিমগাছ দেখে বড় খুশি হয়েছিলেন, বলেছিলেন এখানে বড় ভালো সাধনার জায়গা হয়।

পরে ঐখানে খানিকটা জমি তিনি দান গ্রহণ করেন, তার উপর দোতলা একটি বাড়ি, কুয়ো ইত্যাদি তৈরি হয়। সেই হল এখনকার বিশাল শান্তিনিকেতনের প্রথম বাড়িঘর। মহর্ষি ও তাঁর বন্ধুরা মাঝে মাঝে এসে দু-চার দিন থেকে ভগবানের সাধনা করে যেতেন। রবির এই প্রথম আসা।

জোড়াসাঁকোয় একদিন দুপুরে যখন সবাই ঘুমচ্ছে কিংবা কাজে ব্যস্ত আছে, তখন রবি তার দাদাদের বহুমূল্য পোষা পাখিদের বন্দী অবস্থা সইতে না পেরে সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিল। তেমনি কলকাতার ইট কাঠের খোঁচা থেকে নিজেও আজ যেন মুক্তি পেল। আর সমস্ত খেলাধুলো আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে অসাধারণ বাবাকে সঙ্গী ও উৎসাহ-দাতারূপে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেল।

শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নীচে কিছুদিন কাটাবার পর ওঁরা গেলেন হিমালয়ের দিকে। কয়েক মাস নানান জায়গায়, অমৃতসর, ড্যালহৌসি, বক্রোটা ঘোরা হল। তার পর মহর্ষি থেকে গেলেন, কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে রবি আবার কলকাতায় ফিরে এল।

দেখা গেল এই সময়ের মধ্যে রবির মস্ত একটা পরিবর্তন হয়েছে। তার সেই ছেলেমানুষী ঘুচে গিয়ে, কেমন একটা দায়িত্ববোধের ভাব এসেছে। তার কারণও যথেষ্ট ছিল। বাবার সঙ্গে থাকার সময় যেমন ইচ্ছা মতন ঘুরে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতাও পেয়েছিল, তেমনি বাবার নিজের পরিকল্পিত একটা নিয়মের মধ্য থেকে, মনে একটা দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল।

বাবা সময়নিষ্ঠা ভালোবাসতেন, ভোরে উঠে দিনের কাজ শুরু করতে হত। বেড়ানোর শেষে ঠাণ্ডা জলে স্নান, গীতা থেকে অনুলিপি করা, ইংরেজি পড়া, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত চর্চা, সবই চলতে থাকত। বাবার দামী ঘড়িতে মনে করে দম দিতে হত, ক্যাশ বাক্সের হিসেব রাখতে হত। এ কাজে রবির বেশ দক্ষতা দেখা গেল। একদিন তো তহবিলের হিসেব কমে না গিয়ে বেড়েই গেল। মহর্ষি হেসে বললেন, রবিকে জমিদারির হিসেব রাখার কাজ দিলে তো লাভের আশা আছে।

দূরের বাবা একেবারে বুকের কাছে এসে গেলেন। কত শিক্ষা, কত সরস সব গল্প রসিকতা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। তিনি নিজেই যেন একটি জীবন্ত অনুপ্রেরণা; তাঁর ভোরে উঠে উপাসনা,

গভীর রাতের সাধনা, রবির মনে সারাজীবন ছবির মতো আঁকা হয়ে রইল। যেন পরশপাথরের ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে রবি ফিরে এল জোড়াসাঁকোতে। এতদিন পরে বাড়ির লোকে তাকে একটা গোটা মানুষ বলে মেনে নিল।

তবে বয়স তো খুব বেশি হয় নি, কাজেই নতুন শেখা বিদ্যাগুলো মেয়েদের কাছে জাহির করে মায়ের প্রশংসা পাওয়ার লোভটা কিছুতেই সামলানো যায় নি।

পুরনো স্কুলেও আর কুলোল না, এবার রবিকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভরতি করা হল। সেখানকার অনেক সুখদুঃখের কথাও পরে তিনি অনেক বলেছেন। কিন্তু সেখানেও মন বসবার মতো কিছু পাওয়া গেল না।

এদিকে কবিতা লেখা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। মনের মধ্যে কবিতার লতাগাছটি দিনে দিনে অনেকখানি বেড়েও উঠেছিল, মাঝে মাঝে তাতে ছোট-ছোট কুঁড়িও ধরত, আবার ঝরে যেত।

রবির যখন সাত-আট বছর বয়স, তখন তার চেয়ে বয়সে বড় এক ভাগনে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তার নাম, একদিন দুপুরবেলায় তাকে ডেকে নিয়ে পয়ার ছন্দে চোদ্দো অক্ষরে যোগাযোগ করে কেমন কবিতা হয়, এই রহস্যটি শিখিয়ে দিয়ে বললে, এবার তোমাকে কবিতা লিখতে হবে।

একটু চেষ্টা করতেই রবির হাত দিয়ে কবিতা বেরিয়ে পড়ল। তখন তার উৎসাহ কে দেখে! সোমেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন একজন ভক্ত। রবির লেখা কবিতা একে ওকে, বাড়ির আমলাদের, অভ্যাগতদের শোনানো হতে লাগল। ছোট্ট একটি নীল কবিতার খাতার পাতা ক্রমে ভরে উঠে রবির পকেটে ঘুরতে লাগল। কবি বলে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে খ্যাতি হল।

সেই খ্যাতি কেমন করে স্কুলের মাস্টারমশাইদের কানেও পৌঁচেছিল, তাঁরা ফরমায়েস করে রবিকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিতেন। ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছিল, ঈর্ষা করবার লোকের অভাব হচ্ছিল না। বাড়িতে শ্রীকণ্ঠবাবুও ভারি খুশি, উৎসাহের চোটে রবির লেখা কবিতা তিনি স্বয়ং মহর্ষিকে দেখিয়েছিলেন। সংসারের দাবদাহে তাঁর ছোট ছেলেটি কেমন জর্জরিত, পয়ার ছন্দে সে কথা পড়ে মহর্ষি নাকি হেসেছিলেন।

বহুকাল পরে—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে'

এই গানটি বাবাকে শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে জল এনে আর তাঁর হাত থেকে পরস্কার নিয়ে, ছোটবেলাকার এই অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

প্রথম কবিতা লেখার ঐ কাহিনীটি হিমালয় যাবার অনেক আগের ঘটনা। ততদিনে রবির কাব্যপ্রতিভা আরো অনেক বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তবে এখন পর্যন্ত সে সাধনা অনেকখানি গোপনেই চলছিল। হিমালয় থেকে ফিরে 'অভিলাষ' নামে তাঁর একটি কবিতা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হল, তবে তাতে তাঁর নাম ছিল না। কবিতাটি এই ভাবে শুরু হয়েছিল :

'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ !
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।'

এবার তাঁর জীবনে একটা মস্ত বড় দুঃখ এল। রবির বয়স যখন তেরো বছর দশ মাস, তার মায়ের মৃত্যু হল।

তৃতীয় অধ্যায়

কিছুদিন রোগে ভুগে মা যখন মারা গেলেন, তখন গভীর রাত, ছোট ছেলেরা সব ঘুমিয়ে। সকালে তাঁর সুন্দর করে সাজানো দেহটা দেখেও মৃত্যুর নির্মমতা সম্বন্ধে রবির তেমন কোনো ধারণা হয় নি। স্নেহময়ী দিদি বউদিরা সেদিন থেকে তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে বাবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখেছিল রবি, বাবা তাঁর ঘরের সামনে বসে ভগবানের উপাসনা করছেন। এ কথা রবির চিরকাল মনে ছিল।

কোনো মানুষ সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে জন্মায় না, কতকগুলো দোষগুণ নিয়ে এলেও, তিলে তিলে তার মনটা তৈরি হয়। যাদের সঙ্গে মেলামেশা

যেখানে বাস, যে কথা শোনা, যে রূপ দেখা, সবই তার মনের মধ্যে কিছু কিছু রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথের বড় সৌভাগ্য যে এমন জায়গাটিতে পড়লেন যাতে তাঁর মনের কবিতা-লতাটি ক্রমে ক্রমে পাতায়, কুঁড়িতে, ফুলেতে বিকশিত হয়ে উঠতে যা যা দরকার হয়, একে একে সবই পেয়েছিল।

বাড়ির গান-বাজনা, সাহিত্যচর্চার কথা তো বলাই হয়েছে। তার উপর দেশপ্রেম ছিল তাঁদের সুগভীর। কোথায় ভালো দিশি জিনিস আছে, সবেতেই তাঁদের উৎসাহ। যাত্রাগান, লোকসংগীত, দিশি নাচ, কবি-লড়াই এ-সবেতে তাঁদের আগ্রহ তো ছিলই। দিশি জিনিসকে উৎসাহিত করতে গিয়ে অনেক সময় চিন্তা ও অর্থ অকাতরে খরচ করতেন। বিদেশীর চোখে যাতে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয় তাঁরা সচেতন ছিলেন। তার ফলে তাঁদের বাড়িতে একটি বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার আবহাওয়া বিরাজ করত।

মজার ঘটনাও ঘটত। সঞ্জীবনী সভা বলে তাঁদের গুপ্ত সভা থেকে স্বাদেশিকতার নাম নিয়ে এখানে ওখানে চড়ুইভাতি হত। তা ছাড়া ছিল 'হিন্দুমেলা', সে এক অপূর্ব ব্যাপার। নবগোপাল মিত্র বলে একজন ছিলেন তার কর্মকর্তা; রাজনারায়ণ বসু, কবির খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করা এই হয়তো প্রথম। দাদারা দেশপ্রেমের গান বাঁধতেন, দিশি শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদির প্রদর্শনী হত, গুণীদের পুরস্কার দেওয়া হত।

পনেরো বছর বয়সেই হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দেশপ্রেমের কবিতা পাঠ করেন। কবি নবীন সেন সে কবিতা শুনেছিলেন। তার বছর দুই পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দেশপ্রেমের নাটক 'সরোজিনী'র জন্যও রবীন্দ্রনাথ একটা গান লিখে দিয়েছিলেন। এমনি করে নিঃশব্দে এসে তরুণ কবি কাব্যলক্ষ্মীর সভায় ছোট একটি আসন জুড়ে বসলেন। এখানে ওখানে 'ভারতী'তে, 'জ্ঞানাঙ্কুরে', একটি দুটি রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। তার মধ্যে 'কবি-কাহিনী'র কথা এখনো আলোচিত হয়ে থাকে। তবে সব চাইতে বিস্ময়কর হল তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী'। সেকালের পদাবলীর অনুকরণে, ভানুসিংহ ঠাকুর রচয়িতা বলে এই কবিতাগুলো প্রকাশিত হল। পরে লেখকের

নাম ও বয়স শুনে পাঠকরা বিশ্বাস করতে চাইল না যে এগুলি একটি ষোলো বছরের ছেলের লেখা। আজ পর্যন্ত লোকে কত আদর করে 'ভানুসিংহের পদাবলী' পড়ে।

অনেকে ভাবে কবিরা বুঝি শুধু ভাব নিয়ে থাকেন, যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবল প্রতিভার মধ্যে সেরকম দুর্বলতার স্থান ছিল না। অল্প বয়স থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর যুক্তি দিয়ে তর্ক করবার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। পরে জমিদারির কাজেও তাঁর আশ্চর্য মেধার পরিচয় পাওয়া যেত।

কিন্তু হলে হবে কি! বাড়ির অভিভাবকরা শুধু তাঁর ঐ সাহিত্যের নবীন খ্যাতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এখনো তাঁদের বড় আশা ছেলেটা হয়তো লেখাপড়া শিখে বড় একটা পদ অলংকৃত করবে। এই আশা নিয়ে সতেরো বছর বয়সে, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁকে বিলেত পাঠানো হল।

ঐরকম সাদাসিধে ভাবে মানুষ হওয়া ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে খানিকটা কায়দাদুরস্ত করে নেওয়া দরকার, এ কথা সকলেরই মনে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে বিলেতে, তাদের কাছেই রবীন্দ্রনাথ গিয়ে উঠবেন, এইরকম ব্যবস্থা হল। আপাতত তাঁকে আমেদাবাদে পাঠানো হল। সেখানে পুরনো একটা প্রাসাদে, যার পায়ের কাছ দিয়ে সবরমতী নদী বয়ে চলেছে, সেইখানে থাকাকালে কিরকম একটা গভীর আকুলতায় তাঁর মনকে পেয়ে বসল। এইখানেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি তাঁর মনের মধ্যে কুঁড়ি ধরেছিল, যদিও লেখা হয়েছিল পরে।

আমেদাবাদে প্রবাসের কালটা দেশী বিদেশী বই পড়ে কেটেছিল, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য! কি একটা বই পড়ে 'ইংরেজদিগের আদবকায়দা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে, 'ভারতী'তে ছাপালেন। এমন-কি, বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার ইচ্ছায় বিস্তর পড়াশুনাও করতে লাগলেন। ক্রমে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পাঁচরকম দেখে নিজের কলমেও একটা জোর এল।

বাংলা বই ভালো মন্দ উপায়ে মেলা পড়েছিলেন সেই শৈশব থেকেই।

একে বাড়িতে বাংলা শিক্ষার ভারি একটা আগ্রহও ছিল, মাস্টারমশাইরাও ছিলেন, তা ছাড়া বারণ না মেনে, লুকিয়ে চুরিয়ে, বড়দের আঁচল থেকে বইয়ের আলমারির চাবি খুলে নিয়ে, কত যে বোধ্য ও দুর্বোধ্য বাংলা বই, পত্রিকা পড়ে শেষ করেছিলেন, তার হিসেব রাখা যায় না। মনের ভিতরটা যেন একটা চষা মাঠের মতো হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সাহিত্যের একটু বীজ পড়লেই চার দিক শ্যামল সবুজ হয়ে ওঠে।

আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই গেলেন, এক সম্ভ্রান্ত পারসী পরিবারে থেকে ইংরেজি বলা-কওয়া সড়গড় করে শেখার অভিপ্রায়ে। এখানে একজন পারসী মেয়ের বিদ্যা ও লাবণ্যরাশি তাঁর মনে একটা গভীর রেখাপাত করেছিল। তাকে উৎসর্গ করে কত সুন্দর সুন্দর গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন নলিনী, বড় রূপবতী গুণময়ী মেয়ে ছিল সে, অকালে তার মৃত্যু হয়।

শেষ অবধি বিলেতে গিয়ে পৌঁছলেন, সোজা ব্রাইটন শহরে, একেবারে মেজোবউঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাঁর ছোট ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও আরো ছোট মেয়ে ইন্দিরা যেখানে বাস করছিলেন সেখানে। ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গভীরভাবে মিশবার সুযোগ এই প্রথম, এর ফলে কাকা ও ভাইপো-ভাইঝির মধ্যে যে স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠল, সেটা আজীবনের সম্পদ হয়ে ছিল।

ছোট শহর ব্রাইটন, সেখানকার একটা পাবলিক স্কুলে ভরতি হয়ে, ইংরেজ সমাজে নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন। বেশ ছিলেন সেখানে, এমন সময় মেজদাদার বন্ধু ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত এসে সব দেখে শুনে বললেন, এখানে রবির না হবে পড়াশুনা না চিনবে বিলেত দেশটা। এই বলে সেখান থেকে ছাড়িয়ে তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে, একটা বাসাবাড়িতে একলা বসিয়ে দিয়ে, লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভরতি করে দিলেন। তারকনাথের ছেলে লোকেনও সেখানে তখন, দুজনের মধ্যে ভারি একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল।

লণ্ডনে তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক মর্লির কাছে পড়েছিলেন, রাষ্ট্রনেতা গ্ল্যাড্‌স্টোন ইত্যাদির বক্তৃতা শুনেছিলেন। সমুদ্রের ধারে বসে 'ভগ্ন-তরী' নামে একটা লম্বা দুঃখের কবিতা লিখেছিলেন। এরই মধ্যে আবার 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে চিঠি প্রকাশ করতে লাগলেন,

তাতে ইঙ্গ-বঙ্গদের যেমনি নিন্দা, ইংরেজ সমাজের গতিশীল জীবনের প্রচণ্ডতা ও স্বাধীনতার তেমনি প্রশংসাও থাকত। এই-সব চিঠি পড়ে কলকাতার গুরুজনরা অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে দেশেই ফিরে আসতে হল। কিন্তু বিলেতের এই দেড়টা বছর তাঁর স্বভাবে ও মতামতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

দেশে ফেরবার দেড়বছর পরে ঐ চিঠিগুলি 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে বই হয়ে বেরোয়। এই বইয়ের ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে যদিও তখন চিঠিপত্রেও সাধু ভাষা ব্যবহার হত, এই চিঠিগুলি একেবারে চলতি ভাষায় লেখা। বইতে এরকম ভাষার চল তখন ছিল না বললেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে কিছু পাস করে এলেন না বলে অনেকে নিরাশ হলেও, সকলে স্বীকার করলেন তাঁর চালচলনের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগেকার সেই লাজুক ভাবটা চলে গেছে, কথাবার্তা সহজ সুন্দর হয়েছে, বিলিতি একটা চাকচিক্য এসেছে, মিষ্টিগলায় চমৎকার বিলিতি সব গান গাইতে পর্যন্ত শিখে এসেছেন। দেশে এসে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের দলে ভিড়ে গেলেন। তাঁরা দেশী-বিদেশী সুরের সঙ্গে বাংলা কথা জুড়ে গাইতেন। এতদিন অক্ষয় চৌধুরী কথা জোগাতেন এখন রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে জুটলেন।

ছাদে ভারি চমৎকার আসর বসত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী নানান গুণে ভূষিতা ছিলেন, বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাইতে সামান্য বড়, তাঁর স্নেহ ছিল কবির জীবনের একটা সম্পদ। বড়ই অল্প বয়সে এর কয়েক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে দুঃখ সারাজীবন কবির মনকে পীড়া দিত।

যতদিন বিলেতে ছিলেন, যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথ বেশি কবিতা রচনা করেন নি, তবে অনেক গদ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' বলে একটা কাব্য শুরু করেছিলেন, দেশে এসে শেষ করেন।

যাঁরাই কবির জীবনী নিয়ে চিন্তা করেছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, যে তাঁর একরকমের মনোভাব বেশি দিন থাকত না, বারে বারে যেন পট পালটাত, এককে সময়ে এককে ধরনের লেখা নিয়ে মেতে উঠতেন।

দেশে ফেরার এক বছর পরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', কবির প্রথম গীতিনাট্য রচিত হয়। ইতিমধ্যে গোটা আষ্টেক ভগবানের গান

লিখেছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' লেখার আবার এক গল্প আছে। ওঁদের বিদ্বজ্জন সমাগম সভা বলে একটা সমিতি ছিল; সেখানকার একটা অধিবেশনে অভিনয় করা হবে বলে, বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য থেকে, রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনি হবার কাহিনী খানিকটা নিয়ে, এই গীতিনাট্য রচনা হয়। অবশ্য কিছু অদল-বদলও ছিল এতে। আগাগোড়া গানে লেখা এই অপূর্ব নাটিকার সমাদর আজ প্রায় আশি বছর হতে চলল, এখনো এতটুকু ম্লান হয় নি। এর মধ্যেও দু-তিনটি গানে বিলিতি সুর দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, বিদ্বজ্জনদের সামনে তো এই নাটকের অভিনয় হল, রবীন্দ্রনাথ নিজে সাজলেন বাল্মীকি, তাঁর ভাইঝি অতিশয় গুণী প্রতিভাদেবী সাজলেন সরস্বতী। বহু গণ্যমান্য দর্শক, বহু নামকরা সাহিত্যিক অভিনয় দেখলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরো কত নামকরা লোক এসেছিলেন। একজন কুড়ি বছরের ছেলে, এই একটি নাটক দিয়ে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে এক নূতন যুগ এনে দিয়েছিলেন। এখন যত গীতিনাট্য শোনা যায়, তাদের প্রথম সূচনা হয়ে গিয়েছিল সেইদিনই।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রায় দু বছর পরে আরেকটি গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' রচনা হল, অভিনয় হল। এর গল্প হল দশরথ আর অন্ধ-মুনির ছেলের কাহিনী থেকে নেওয়া। তবে শুধু গান আর নাটক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ সময়টা কাটান নি, এই সময়ই প্রথম তিনি সাধারণ শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল সংগীত ও ভাব।

১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার বিলেত যাবার জন্যে রওনা হয়েও মাদ্রাজ অবধি গিয়ে ফিরে এলেন। অল্প দিন পরেই তাঁর 'সন্ধ্যা-সংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এ ধরনের ছোট কবিতা, যাতে সুর দেওয়াও চলে, ইংরেজিতে অনেক থাকলেও, বাংলায় বিশেষ ছিল না।

তার পর কিছুদিন মুসৌরিতে বাবার কাছে, কিছুদিন চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে কাটিয়ে, কলকাতায় এসে সদর স্ট্রীটে ওঁদেরই কাছে উঠলেন। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুব দিকে চেয়ে দেখেন গাছের পাতার আড়ালে সূর্য উঠছে আর সমস্ত পৃথিবী যেন কী

একটা অপরূপ সৌন্দর্যে জড়িয়ে গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে রয়েছে। অমনি মনে হল, চোখ থেকে একটা কালো পরদা সরে গেল, নতুন করে জগৎকে দেখতে পেলেন।

সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখলেন। এ কবিতা যে পড়ল সেই বলল এত দিনে কবি নিজেকে বুঝতে পেরেছেন। এখন থেকে আর তার লেখার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা দেখা যায় নি, তাঁর জীবনটাই যেন যেদিকে আলো সেই দিকেই একটা মোড় নিল।

এই অপূর্ব কবিতাটি 'প্রভাত-সংগীতে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বাইশ বছর বয়সে যশোরের বেণী রায়চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। শ্বশুরবাড়িতে ঐ নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হল। মহর্ষিই বিবাহ স্থির করলেন। ওঁদের বাড়িতে সব অনুষ্ঠানেই যেমন হত, সমস্ত ব্যবস্থার খুঁটিনাটিও ঠিক করে দিলেন। কিন্তু নিজে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। নদীপথে বেড়াতে বেড়াতে বাঁকিপুর অবধি এসে খবর পেলেন, তাঁর বড় আদরের বড় জামাই সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। সেইদিনই রবীন্দ্রনাথের বিয়ে, মহর্ষির আর আসা হল না। সোজা বোলপুর চলে গেলেন।

বাড়ির ছোট ছেলের বিয়ে হল, সকলের মনে ভারি আনন্দ। সবাই মিলে একটা নতুন নাটক অভিনয় করবেন ঠিক হল। একটা বারোয়ারী নাটক লেখাও হল, কিন্তু সেটাকে তেমন সুবিধের মনে না হওয়াতে, রবীন্দ্রনাথই 'নলিনী' নাম দিয়ে একখানা নাটক লিখলেন। লেখা হল বটে, কিন্তু সে আর অভিনয় হল না। পরিবারে গভীর শোকের সময় এসে পড়ল।

এক মাসের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর আর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। আদরের বউঠাকরুনকে হারিয়ে কবির সে যে কি কষ্ট হয়েছিল, ভাষায় বলা যায় না। তাঁর উদ্দেশে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে গদ্য কবিতাগুচ্ছ উৎসর্গ করেছিলেন। আর শুধু 'পুষ্পাঞ্জলি' কেন এর আগে ও পরেও অনেক বই কাদম্বরী দেবীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

যাঁদের মধ্যে বিরাট প্রতিভা থাকে, পৃথিবীর দুঃখ শোক কিছুদিনের মতো তাঁদের ব্যাকুল করে তুললেও, ব্যথা বেদনা হয়ে ওঠে তাঁদের মনের সম্পদ। হতাশার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিভা আরো সমৃদ্ধ হয়ে

ওঠে। এত দুঃখ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ যে-সব প্রবন্ধ, কবিতা, গান রচনা করলেন, সেগুলি যেন তাঁর হৃদয়ের রক্ত দিয়ে রাঙা। তারা দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে থাকে নি, তাদের মধ্যে আশা ও আনন্দের কথাও আছে।

'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা এই সময়ে সৃষ্টি। 'কাঙালিনী' নামে কবিতাটিও তখনকার লেখা। তা ছাড়া 'রাজপথের কথা', 'ঘাটের কথা' গদ্যরচনাও এই সময়ে লেখা। এগুলি পড়লেই বোঝা যায় কবির মধ্যে আবার একটা পরিবর্তন আসন্ন, এবার গল্প লেখার দিকে মনটা ঝুঁকছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ধারাটাই গেল বদলে। এতদিন ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে, যখন যেমন সখ হচ্ছে সেইরকম কাজ করছেন, যেখানে মন চায় বেড়াচ্ছেন। যেমনি ছিল রূপ, তেমনি গানের গলা, লেখার খ্যাতি। যেখানে দেখা দিতেন লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। তবে নিন্দাও শুনতে হত।

তার ছিল দুটো কারণ, প্রথম হল গুণীদের হিংসা করবার লোকের কখনো অভাব হয় না। দ্বিতীয় হল তাঁর লেখা, তাঁর কথা, তাঁর মতামতের মধ্যে এমন একটা নতুনত্ব ছিল, দুনিয়াকে দেখবার ঢঙটিই ছিল এত নতুন, যে গোঁড়া মন যাঁদের তাঁরা এই তরুণ লেখককে সইতে পারতেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে অদল-বদল হল। বিয়ে করেছেন তার একটা দায়িত্ব তো ছিলই। তার ওপর বাবা এই সময় থেকে তাঁর ওপর জমিদারি পরিদর্শনের ভার দিলেন। ভারি দক্ষতার সঙ্গে কবি এ কাজ করতেন, সকলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

নৌকো করে গ্রামের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে জমিদারি দেখতে হত। নিজের দেশকে চেনবার জানবার, দেশের মানুষদের বুঝবার, ভালোবাসবার এমন সুযোগ আর কোথায় পেতেন? এর ফল দেখা গেল

তাঁর আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত বহু ছোট গল্পে, 'স্বদেশী সমাজ' ইত্যাদি দীর্ঘ প্রবন্ধে, তাঁর সমস্ত চিন্তা করবার ধরনে। জোড়াসাঁকোর অট্টালিকায় বসে এ-সব কিছুই সম্ভব হত না।

এর উপর আরো দায়িত্ব নিতে হল, আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকতা করতে হল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ছিল ভারি উদার, ভগবানের ভক্তি ছিল সুগভীর, তার অপূর্ব সব ব্রহ্মসংগীতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন যে আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না কখনো। তবে মহর্ষির ছেলের যা যা কর্তব্য তার কোনোটিরই কখনো তিনি অবহেলা করেন নি। তাঁর বাবার অনুপ্রেরণায় দেশে যে একটা নতুন উদার ধর্মজীবনের সূচনা হয়েছে, এ বিষয় তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাঁকে দিয়ে যখনই কোনো কাজ করিয়ে নেবার দরকার হয়েছে, আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন।

তাঁর জীবনের ভারি একটা সৃজনশীলতার সময় এটা। ততদিনে অনেকগুলি বইও রচিত হয়ে গেছে। 'শৈশব-সংগীত', 'আলোচনা', 'রাজর্ষি,' 'মুকুট,' আরো নানান সুগম্ভীর কিংবা হাস্যরসে ভরা রচনা। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে তাঁর বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে; কলকাতায় প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নতুন জাতীয় সংগীত লিখেছেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।

কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি নাটকও লেখা হয়ে গেল। সখী-সমিতি বলে তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীদের এক মহিলা-সমিতি ছিল, তাদের জন্য 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য; তার পর 'রাজা ও রানী'; 'বিসর্জন' লিখলেন। সেগুলি অভিনয়ও হল, ওঁরা নিজেরাই ভূমিকা নিলেন।

বিয়ের পর সাত-আট বছর কেটে গেছে, তখন তাঁর তিনটি ছেলে-মেয়েকে তাদের মায়ের কাছে রেখে, আরেকবার বিলেত ঘুরে এলেন। ফিরে এসে জমিদারির কাজে একেবারে ডুবে যেতে হল। ছড়ানো জমিদারি, পতিসর, শিলাইদা, কুষ্ঠিয়া, পাবনা, কুমারখালি, কটক—সব জায়গায় যেতেন, ভারি একটা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চালাতেন।

এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে মধ্যে সাহিত্য রচনা চলত। অনেকগুলি ছোট গল্প লেখা হল, তার মধ্যে 'পোস্টমাস্টার' গল্প উল্লেখযোগ্য;

'চিত্রাঙ্গদা' লিখলেন, মহাভারত থেকে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গল্প নিয়ে কাব্য-নাট্য। 'গোড়ায় গলদ' নামে সরস এক নাটক লিখলেন, তা ছাড়া 'সোনার তরী'র অনেক কবিতা রচনা করলেন।

কবির হৃদয়ের সেই কোমল লতিকাটিকে এখন আর চেনা যায় না, সে যেন একটা বলিষ্ঠ গাছে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের সমস্ত চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। বহু পত্রিকাতে নানান বিতর্কে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে; হিন্দুবিবাহ, স্ত্রী-মজুর, চাকরির উমেদারি, সব-কিছু নিয়ে প্রবন্ধ বেরিয়েছে। শিক্ষা-বিষয়ক রচনাও অনেক লিখেছেন। 'সাধনা' নামে নতুন পত্রিকা বের করেছেন ভাইপো সুধীন্দ্রনাথ, তাতে বিখ্যাত "শিক্ষার হেরফের' ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধে কবি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নাম দিয়ে বিবিধ বিষয়ে আলোচনার বই লিখেছেন, 'কাবুলিওয়ালা' গল্প লিখেছেন; কচ ও দেবযানীর গল্প নিয়ে 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতা লিখেছেন। আবার মধ্যে মধ্যে সখ করে ছবি আঁকাও অভ্যাস করেছেন।

এত কথার মধ্যে একটা কথা বাদ পড়ে গেছে, সেটা হল রবীন্দ্রনাথ এতদিনের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কি লিখেছিলেন? সকলেই জানেন যে যাঁরা তাঁদের নিজেদের ছোটবেলার কথা মনে রাখতে পারেন, শুধু তাঁরাই ছোটদের জন্য লিখতে পারেন। ছোটবেলার কথা ভালো করে মনে রাখতে হলে, শুধু ঘটনাগুলো মনে করলে চলবে না, সেইসঙ্গে তখনকার মনের ভাবগুলোকেও স্মরণ রাখতে হবে।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' কিংবা 'ছেলেবেলা' পড়েছেন, তাঁরা এ কথাও জানেন যে ছোটবেলাকার কত রাশি রাশি কথাই না তাঁর মনের মধ্যে জমা ছিল। কুড়ি বছর বয়সে ছোটদের জন্য প্রথম কবিতা লেখেন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—রাজ্যের ছোট ছেলের মনের কথা দিয়ে এই কবিতার পদগুলি একেবারে ঠাসা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের বছর দুই পরে তাঁর মেজোবউঠাকরুন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নাম দিয়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে একখানি ছোটদের পত্রিকা বেরোয়। গোড়ায় তাঁদের ইচ্ছা ছিল বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখা দিয়েই কাগজটি চলবে। কিন্তু

সে যে হবার নয়, এ কথা বুঝতে পেরে শেষটা রবীন্দ্রনাথের উপর কাগজ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁর হাতের একটা নতুন দিক খুলে গেল। ছোটদের জন্য কত যে গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা, কবিতা লিখলেন, তার ঠিক নেই।

ছোটদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা ভারি উঁচু ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটরা অনেক শক্ত শক্ত তত্ত্বও বুঝতে পারে। কোনোরকমের খোকামি তাঁর অসহ্য ছিল। আধো আধো ভাষায়, কবিতা লেখা তিনি দেখতে পারতেন না, তাঁর বিশ্বাস ছিল তাতে ছোটদের বুদ্ধিকে অসম্মান করা হয়।

অনেককাল পরে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' বলে তাঁর একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ছোট একটি মেয়েকে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি। সেরকম রসে ভরা চিঠি কেউ কাউকে লিখতে পারে না, আবার তার মধ্যে সহজ ভাষায় কতই-না গম্ভীর গূঢ় কথাও আছে। সেই ছোট মেয়েটি কত আনন্দের সঙ্গে এই চিঠিগুলি পড়ত।

'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা—'হাসিরাশি,' 'পুরনো বট,' 'মা-লক্ষ্মী,' 'আকুল-আহ্বান,' আরো কত—সবগুলিই বুদ্ধিদীপ্ত ও ভাবে ভরপুর, কিন্তু প্রত্যেকটিই ছোটদের উপযুক্ত।

'রাজর্ষি' গল্প, 'মুকুট' নাটকের কথা তো বলাই হয়েছে। ওগুলিও 'বালকে' বেরিয়েছিল। তার পর মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে বেড়াতে যেতেন। সেইরকম একবার গিরিডি থেকে মানুষ-ঠেলা পুশ্-পুশ্ গাড়ি চেপে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন, তার সরস বর্ণনাও 'বালকে' ছেপেছিলেন।

ছোটদের জন্যই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান চিন্তা। স্কুলে পড়তে গিয়ে নিজে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, তাই মনের পিছনে সর্বদা এই ভাবনা থাকত, আনন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির বুকের মাঝখানে কেমন করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়। দিনে দিনে শহরে বাস করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। জমিদারির কাজে তাঁকে প্রায় গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে হয়, কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েরা তো থাকে শহরের সেই কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে, তাই বড় ভাবনা।

১৮৯৪ সালে তাঁর আরেকটি ছেলে হল, তাঁর নাম রাখলেন শমীন্দ্র। এখন তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড় মাধুরীলতা, তার পর রথীন্দ্রনাথ, তার

পর রেণুকা, তার পর মীরা, সব চেয়ে ছোট শমীন্দ্রনাথ। এদের মনের মতো করে মানুষ করাটাই হয়ে উঠল একটা দুশ্চিন্তা। জোড়াসাঁকোর পুরনো নিয়মে যে এদের বড় হয়ে উঠতে দেবেন না, এটা কবি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন। পরে কিছুদিন সবাইকে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন।

মাঝে মাঝে তখন সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধেই মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমা হত। তাঁর মতো যার চরিত্রে সর্বদা একটা প্রচণ্ড পৌরুষ বিরাজ করত, তার পক্ষে পদে পদে ইংরেজ শাসকদের স্পর্ধা ও অবিচার সহ্য করা কঠিন। যখনই এইরকম কোনো ঘটনা তাঁর নজরে পড়ত, তখনই তার প্রবল প্রতিবাদ করতেন। তাঁর ছোট গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র', তাঁর বিখ্যাত সব প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরাজের আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার', 'অপমানের প্রতিকার', আরো কত রচনা এই পৌরুষেরই সাক্ষ্য দিয়েছে।

আসলে রাজনীতি তাঁর ভালো লাগত না, দলাদলিকে চিরকাল ঘৃণা করতেন; কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বে যেখানে আঘাত লাগত, সেখানে চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কবিদের আত্মসম্মান হয় পাহাড়ের মতো বিশাল। তাকে রক্ষা করতে না পারলে তাঁদের কাব্য-সৃষ্টিই বৃথা হয়ে পড়ে। কাব্যের অন্তরে যদি একটা মহান সত্য না থাকে, সে কাব্যের কোনো মূল্য থাকে না। অসত্যের, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ালে, সেই সত্য আর হৃদয়ের মধ্যে বাঁচতে পারে না। তাকে বিদায় নিতে হয়। তাই প্রকৃত যাঁরা কবি, তাঁদের চরিত্রে আশ্চর্য বল ও সাহস থাকে; রবীন্দ্রনাথের যেমন ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাঁর আসল কাজ ছিল না, তাঁর কাজ হল কাব্য রচনা। সে কাজেরও কখনো তিনি অবহেলা করেন নি।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, তার অত ক্ষোভ অভিমানের মধ্যেও 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামে বিখ্যাত গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পের কথা প্রথম তাঁর মনে হয়, প্রথমবার বিলেত যাবার আগে, আমেদাবাদে থাকার সময়। 'জীবন দেবতা' কবিতা লেখেন, 'চৈতালি'র কবিতাগুলো লেখেন, 'কল্পনা'র কবিতা লেখেন, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বলে একটা হাসির নাটক লেখেন। তা ছাড়া 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইত্যাদি কাব্য-নাট্য লেখেন।

সেই যে অনেকদিন আগে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকার সময় মনের মধ্যে থেকে যেন একটা বাধা সরে গিয়েছিল, সেই থেকে ভরা-নদীর জলের মতো যে-সব রচনা তাঁর কলম থেকে বেরোতে লাগল, তার প্রবলতা ও মাধুর্য দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তবু এখনো তাঁর জীবনের আসল কাজের সময় আসে নি। ছোটদের কথা কোনোদিনও ভোলেন নি। দারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' বের করলেন, তার মধ্যে বাংলা দেশে যত ছোটদের ছড়া পেলেন, সব এনে জড়ো করে-ছিলেন। তিনি বলতেন, এই-সব ছড়ার মধ্যে চষা ক্ষেতের ভিজে মাটির গন্ধ, ছোট ছেলের গায়ের মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে।

আশ্চর্য সব রচনা এই সময়কার। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতায় লেখা গল্পগুলি ভোলা যায় না। তাদের মধ্যে যে উদারতা আর মনুষ্যত্বের ইঙ্গিত আছে, সে তো দেশের যত ছেলেমেয়ে, তাদেরই জন্য। 'ক্ষণিকা'র কবিতাও এই সময় লেখা হল। তার পর কবির ভাগনী সরলা দেবী ধরে বসলেন 'ভারতী' পত্রিকার জন্য মজাদার নাটক লিখে দিতে হবে। লিখলেন 'চিরকুমার সভা', কেউ বিয়ে করবে না প্রতিজ্ঞা করে, কেমন সব বিয়ে করে ফেলল তারই হাসির কাহিনী।

যখন লেখাতে পেয়ে বসত, রবীন্দ্রনাথ অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তখন হঠাৎ কাছে গিয়ে বিরক্ত করার সাহস কারো হত না। শোনা যায় খাবার সময় হলে অনেক সময় কাজ রেখে উঠে এসে খাওয়া সেরে নিয়ে, আবার ঠিক যে জায়গা থেকে লেখা ছেড়ে এসেছিলেন, সেইখান থেকে ধরতেন, যেন এর মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

জীবনটা আসলে গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ শান্তিনিকেতনের দিকেই চলেছিল। শিলাইদহে একটা ছোটখাটো পরীক্ষার মতন হয়ে গেল, কয়েকজন মাস্টারমশাইকে আর নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে। সেখানকার জীবনযাত্রাই অন্যরকম। সব-কিছু ছেড়েছুড়ে, ইচ্ছা হলেই, পদ্মার চরে বাঁধা নৌকোয় শুয়ে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকা যায়। কোথাও জনমানুষের সাড়া নেই শুধু অনেক উঁচুতে নীল আকাশে কালো চিল উড়ছে দেখা যায় আর কানের বড় কাছে নদীর জলের কলকল ছলছল শব্দ শোনা যায়। এই দেখে, এই শুনে কবির নিজের কত সময় কেটেছে। এখন ছেলেমেয়েদেরও এই পরিবেশের মধ্যে এনে ফেললেন।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে লরেন্স নামে এক সাহেবও ছিল, সে ইংরেজি পড়াত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শেখাত আর রেশমের পোকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। রেশমের পোকা দিয়ে তার ঘর বোঝাই থাকত, মাঝে মাঝে নিজের খালি গায়ের উপর পোকাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকত আর গা-ময় শুঁয়োপোকার মতো পোকাগুলো হেঁটে বেড়াত। সে এক দেখবার জিনিস ছিল। শোনা যায়, কবির বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নাকি গোড়ায় কুড়িটি রেশমের কীট ওঁদের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন, দেখতে দেখতে তারা ডিম পেড়ে ছানা তুলে লক্ষ লক্ষ পোকার ব্যবস্থা করে ফেলল। তাদের খাবার জোগানোই এক ব্যাপার হয়ে উঠল। আর কি খিদে রে বাবা! দিনরাত শুধু খাই-খাই, আবার তুঁত গাছের পাতা ছাড়া কিছু মুখে দেয় না!

চাষবাসের নানারকম পরীক্ষাও কবি চালিয়েছিলেন, আমেরিকার ভুট্টার, মাদ্রাজের সরু ধানের চাষের পরীক্ষা করা হয়েছিল।

শিলাইদহে জগদানন্দ রায় কবির ছেলেমেয়েদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন। পরে শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও এঁর কাছ থেকে কত শাসন, আর কত আদর পেয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে কোনো একরকম ভাব নিয়ে কবি বেশিদিন পড়ে থাকতে পারতেন না। থাকেন শিলাইদহে, কিন্তু নানান কাজে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় এলেই সাংসারিক কর্তব্য তাঁকে যেন গিলে খেতে চায়, আবার শিলাইদহে ফিরে গিয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিনগুলি কাটে। বড় আদরের ভাইপো বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। বলেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের আখমাড়াই ইত্যাদি কতকগুলি ব্যবসা ছিল, এখন তাদের ভারি দুর্গতি। এক সময় রবীন্দ্রনাথই তাদের এই কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এখন তাদের সমস্ত ঋণভার নিজের উপর নিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। সেই ঋণ শোধ করতেও কবিকে কম কষ্ট পেতে হয় নি।

তবে এ-সব হাঙ্গামায় তাঁর কাব্যপ্রতিভার কোনো ক্ষতি হত না। লোহাকে যেমন পিটলে সে আরো শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি সংসারের আঘাত-প্রতিঘাতে কবির চরিত্রে আরো দৃঢ়তা দেখা যেতে লাগল। •

জীবনে অনেকগুলি গুণী লোকের সঙ্গ পেয়েছিলেন কবি— বঙ্কিমচন্দ্র,

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয় চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী—কত নাম করা যায়? তাঁদের সান্নিধ্য পাওয়াটাও কম ভাগ্যের কথা নয়।

দেশকে জেনেছেন, দেশের লোকদের শ্রদ্ধা করতে পেরেছেন, নিজেও তাঁদের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তার ফলে তাঁর গভীর দেশানুরাগ নানান ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। তখনকার দিনের অভিজাত সমাজে বড় বেশি ইংরেজ-প্রীতি ছিল, পোশাক-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায় সবাই ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ধুতি পাঞ্জাবি পরে, চাদর গায়ে দিয়ে, সব জায়গায় যাওয়া আসা ধরলেন। সভাসমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তখন, রবীন্দ্রনাথ তা সহ্য করেন কি করে? ১৮৯৭ সালে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা সেখানে গিয়ে দাবি করলেন, এমন একটি স্বদেশী অনুষ্ঠান, এর সভার ভাষা হোক স্বদেশী। বেজায় সাহেব যাঁরা, ইংরেজি ছাড়া কথা কন না, তাঁরাও নাকি সেখানে মধুর বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। কবির চরিত্রের এমনি গুণ।

পঞ্চম অধ্যায়

এতদিনে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে রবীন্দ্রনাথের, এখনো মন বসাবার মতো একটা কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেলেন না। সময় কিন্তু কেটে যাচ্ছে। কিছুদিন এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন, আবার ছেড়ে দিয়ে ও পত্রিকা নিয়ে পড়েন। 'হিতবাদী' আর 'সাধনা'র যুগ গেল, এবার 'বঙ্গদর্শন' নতুন করে প্রকাশিত হতে শুরু করল, তার সম্পাদনার ভার পড়ল তাঁর উপর। পৃথিবীরও তখন নানান জায়গায় অশান্তি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'বোয়ার' যুদ্ধ চলেছে ইংরেজ ও ডাচ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে; সেখানে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের সমালোচনাও করছেন, আবার 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলিও লিখছেন। এ-সব কবিতায় প্রাচীন হিন্দুদের আদর্শগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে কবিতা শুনে বৃদ্ধ মহর্ষি কত খুশি

হয়েছিলেন। এ ছাড়া 'চোখের বালি' বলে নতুন ধরনের উপন্যাস লেখা হয়েছে, তাতে ঘটনার চেয়ে চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব নিয়েই বেশি কথা আছে।

সাংসারিক কাজও চলেছে, বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় জামাই ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে, মেজো জামাই ডাক্তার। সবই হল, অথচ যে কাজের ওপর মনে মনে এত আশা, তা শুরু হল না। ভেবে ভেবে কবির মনে হল, যে পরিবেশের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ করা উচিত, শান্তিনিকেতনেই তাকে পাওয়া যাবে। ওখানকার নীল আকাশের পবিত্র আচ্ছাদন ছোটদের মনে যে পবিত্রতা ও আনন্দ এনে দিতে পারবে, আর কোথাও তেমনটি সম্ভব হবে না। মহর্ষির সঙ্গে এই নিয়ে পরামর্শ চলল; তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল, কিন্তু এ কথাও রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হল যে নতুন বিদ্যালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে নিতে হবে, পারিবারিক সম্পত্তি থেকে ওখানকার খরচ চালাবার ব্যবস্থা হবে না। রবীন্দ্রনাথ এতে সম্পূর্ণ রাজি ছিলেন।

এই রাজি হওয়াটা কম সাহসের কথা নয়। তখনকার দিনে বই লিখে আর কারো ঘরে খুব বড় একটা টাকার অঙ্ক আসত না। সামান্য যা আসত, তার ওপর শোনা যায় মাত্র আড়াইশো টাকা ওঁর মাসহারা ছিল। তা ছাড়া ছিল পুরীতে বাড়ি, আর মৃণালিনী দেবীর গহনাগুলি। এ-সবই বিক্রি করে ফেলা হল। তার পর ঝাড়া হাত-পা হয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসলেন। মনে কোনো খেদ থাকল না; এই তো তিনি চেয়েছিলেন; আর মৃণালিনী দেবীও তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণীর কাজ করেছিলেন।

এখনকার শান্তিনিকেতন দেখে তখনকার দিনের আশ্রমের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না। সে সময়কার আশ্রম ছেলে পড়াবার জন্য তৈরি হয় নি, সে ছিল একটি সাধনার স্থান— ব্রহ্মমন্দিরটি, তার পিছনে দোতলা বাড়িখানি, কুয়ো, আমবাগান, কয়েকটা গাছপালা, আর মাটির ঘর। আর এগুলিকে ঘিরে ছিল খোলা মাঠ, সেখানে দৃষ্টি কোথাও বাধা পেত না।

বোলপুরও তখন এত বড় শহর হয়ে ওঠে নি, ধানকল তখনো বসে নি, পথঘাট নিরালা ছিল। আশ্রমের ঐ দোতলা বাড়িটা ছাড়া আর একটিমাত্র পাকা বাড়ি ছিল, সেখানে পুরনো কতকগুলি পত্রিকা ও

বইয়ের সংগ্রহ ছিল। আশ্রমের একজন রক্ষী ছিল, তার নাম দ্বারী সর্দার, সে নাকি আগে ডাকাত ছিল। দ্বারীর ছেলে হরিশ মালির কাজ করত। দোতলা বাড়ির একতলায় কবির ভাইপো দ্বিপেন্দ্রনাথ থাকতেন, উপরতলায় তিনি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলে একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় কয়েকটি মাত্র ছেলে নিয়ে স্কুল তো শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে তার গন্ধ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। জামতলায় ক্লাস নেন কবি, ছেলেদের মাইনে-টাইনে দিতে হয় না—পরে অবিশ্যি সামান্য কিছু দিত তারা, নইলে বিদ্যালয়ের খরচ চালানো দায় হয়ে উঠেছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ছিলেন তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ। সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁরা পয়সাকড়ির ধার ধারতেন না। আরো দুজন তরুণ বয়সের গুণী লোকও এসে জুটলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও কবি সতীশচন্দ্র রায়। পার্থিব লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে এঁরা এলেন। এমনি করে নতুন বিদ্যালয়ের পত্তন হল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল অনেকটা সেকালের তপোবনের আদর্শ নিয়ে। প্রকৃতির বুকে সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন, গুরু শিষ্যের মধ্যে ভারি একটা স্নেহের সম্বন্ধ, শুধু লেখাপড়ার বিষয় নয়, কাজকর্মে প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে। তবে যে নিয়মগুলি একালে অচল, সে-সব আর নতুন বিদ্যালয়ে চালাবার চেষ্টা হল না।

দেখতে দেখতে আরো নতুন কর্মী এসে দাঁড়ালেন, জগদানন্দ রায়, তিনি শেখাতেন অঙ্ক ও বিজ্ঞান। মোহিতচন্দ্র সেন এসে কিছুদিন কাজ করে গেলেন। ক্রমে ক্রমে এলেন নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরো কতজনা।

এ বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছিল অন্যান্য সাধারণ স্কুলের বিপক্ষে যেন একটা প্রতিবাদের মতো। এখানে ছিল অবাধ স্বাধীনতা, যার মধ্যে প্রত্যেকটি ছোট ছেলের মনের পাপড়িগুলো একে একে ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়। বাঁধাধরা নিয়মকানুন ছিল না, কিন্তু সকলেই আশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত। সেবা ও স্বার্থত্যাগ আর কষ্টস্বীকার তাদের জীবনের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একটু অন্যরকমের হলে যা হয়, খুঁত ধরবার লোক জুটল মেলা। কেউ বলে ওখানে বনবাদাড়ের মধ্যে আবার পড়াশুনো হয় নাকি।

যেমনি গুরু তেমনি সব চেলা, লম্বা চুল রেখে খালি পায়ে শুধু কবিতা লেখে আর ন্যাকামি করে। কেউ-বা বললে ঠিক তার উলটো, যত সব অঘামারা বোম্বেটে ছেলের দল ওখানে জুটেছে, পড়াশুনা তো হয় ছাই, শুধু ডানপিটেমি করে ওদের দিন কাটে।

শুধু বাইরের লোক কেন, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব দেখা গিয়েছিল, কিন্তু কোনো কিছুতেই কবিকে দমিয়ে দিতে পারে নি।

খালি পায়ে থাকে সবাই, আলখাল্লা পরে, ভোরে উঠে ঠাণ্ডা কনকনে জলে স্নান করে, নিরামিষ খায়, রাঁধাবাড়া ছাড়া আর সব কাজই প্রায় নিজেরা করে নেয়। বড়রা ছোটদের দেখাশুনা করে, অতিথি কেউ এলে সবাই মিলে তার পরিচর্যায় লেগে যায়। রবীন্দ্রনাথকে সকলে গুরুদেব বলে ডাকে। আর সে যে কি একটা গানের, গল্পের, আনন্দের হাওয়া বয় দিনরাত!

ভোরে ওঠা, সকাল সকাল শোওয়া, চাঁদনি রাতে গান গেয়ে জেগে থাকা, প্রকৃতির সঙ্গে ছয় ঋতুকে ডেকে নেওয়া, সব চাইতে আদিম যে জিনিসগুলো— জল, মাটি, হাওয়া, আলো, আকাশ—সেগুলোকে বুক ভরে ভালোবাসা, মানুষ হয়ে উঠতে আর খুব বেশি কিসেরই-বা দরকার লাগে?

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের খ্যাতি চার দিকে ছড়াতে লাগল, ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল; কাজের পরিমাণ, টাকার সমস্যাও সেইসঙ্গে বাড়তে লাগল। অথচ তাঁর মুখ দেখে সে কথা কারো বুঝবার উপায় ছিল না।

পড়াশুনার একটা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে না দিয়ে, প্রথম দিকে নানারকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। বহুকাল পরে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বলে একটা ছোট পুস্তিকাতে কবি লিখেছিলেন:

"দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে, সেও

এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড় তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃ-প্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল।"

যা মনের মধ্যে থাকে, বাইরের পৃথিবীতে সব সময় তাকে রূপ দেওয়া যায় না। অনেক সময়ই কিছুটা অদল বদল করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, তবে আদর্শটি ছিল ঐরকম।

গোড়া থেকেই কবি ইংরেজি পড়ানো হবে বলে স্থির করেছিলেন, নইলে নানান জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাবে না, তবে বাংলা ভাষাকেই প্রধান আসন দেওয়া হল। শরীর চর্চা, আশ্রমের পরিচর্যা, গাছপালার যত্ন, এও ছিল শিক্ষার অঙ্গ। আশ্রমের তখন নাম ছিল বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

আস্তে আস্তে বিদ্যালয়টি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে লাগল, অনেক ছেলে আসতে লাগল, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের পরবর্তী জীবনে দেশের লোকের সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে গুরুদেবের ঐ শিক্ষার আদর্শটি নিষ্ফল নয়।

জীবনের সব দিনগুলি কারো সুখে কাটে না, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আবার দুঃখের দিন এল। আশ্রম গড়ার সময় মৃণালিনী দেবী নিজের গয়না দিয়েছিলেন, তার পর আশ্রমের গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর স্নেহের স্পর্শে আশ্রমটি হয়ে উঠেছিল বড় একটি পরিবারের মতো যেখানে মায়া-মমতার স্নেহছায়াতে দুঃখের সময় প্রাণ জুড়োয়। সেই মৃণালিনী দেবীর কঠিন অসুখ হল, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হল। কবিকে পাঁচটি সন্তানের একাধারে বাবা মা দুইই হতে হল। স্ত্রীকে মনে করে 'স্মরণ' বলে কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন।

আরো শোক ছিল তাঁর কপালে, মেজো মেয়ে রেণুকা অসুখে পড়ল, তাকে নিয়ে কবি আলমোড়া গেলেন, সেখানে 'শিশু' বইটির কবিতাগুলি লিখলেন, ওগুলি পড়ে মাতৃহারা ছোট ছেলে শমীন্দ্র বড় আনন্দ পেত।

কিন্তু রেণুকাকে বাঁচানো গেল না, মায়ের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তারও মৃত্যু হল।

দুঃখে বুক ভেঙে গেলেও, প্রতিভা কখনো অলস থাকে না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে কবি ধারাবাহিকভাবে 'নৌকাডুবি' নামে একটা উপন্যাস লিখে যেতে লাগলেন। তা ছাড়া অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধও রচনা করলেন।

পরের বছর কবির তরুণ বন্ধু ও সহকর্মী সতীশচন্দ্র রায় বসন্ত হয়ে মারা গেলেন। কবি সমানে লিখে যেতে লাগলেন, যেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বড় তুচ্ছ জিনিস। চিরদিন স্বদেশকে প্রবলভাবে, প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে এসেছেন। সেই ভালোবাসা কত অপূর্ব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেই নবীন বয়সে যখন লিখেছিলেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', তখন থেকেই। কিন্তু দেশের জন্য শুধু কবিতা গান লেখা ছাড়াও আরো বাস্তব কাজ করবার বাসনা তাঁর মনের মধ্যে ছিল। ১৯০৪ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' লিখে, একটা বিশেষ সভায় সেটিকে পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি দেশসেবা কাকে বলে তার একটা সুন্দর চিত্র দিয়েছেন, বিলেতের দেশসেবার সঙ্গে ভারতীয় দেশসেবার আদর্শের তফাত কোথায় দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা দেশের সব বিষয় উন্নতির জন্য সরকারের দিকে চেয়ে থাকে, আমাদের আদর্শ হল নিজেদের অভাব নিজেদের মেটানো।

কতকগুলো এমন যুক্তিযুক্ত কথা আছে এই প্রবন্ধে, যা একজন কবির কাছ থেকে সাধারণত আশা করা যায় না। সেই পরামর্শগুলো এতকাল পরে, ভারত স্বাধীন হবার এতদিন পরে, আস্তে আস্তে কাজে লাগানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাইরের আড়ম্বরের জন্য দেশের টাকা খরচ করা অন্যায়। দেশের দৈন্য ঘোচাতে হলে কুটির-শিল্পগুলিকে সাহায্য করতে হবে। গ্রামগুলির অযত্ন করলে চলবে না, গ্রাম ছেড়ে সব শহরে গিয়েও ভিড় করলে চলবে না। সেকালে সারা শীতকাল গ্রামে গ্রামে মেলা হত, সেখানে নানান জায়গার হাতের কাজ তো বিক্রি হতই, তা ছাড়া কবি-লড়াই, যাত্রাগান, লোকসংগীত ইত্যাদি দিয়ে একটা প্রাণের সাড়া জাগানো হত। এখন সেই-সবের পুনরুদ্ধারের সময় এসেছে। সাতান্ন বছর আগে কবি যে কথা

বলেছিলেন, এখনো আমরা আমাদের নেতাদের মুখে সেই কথাই শুনছি। কবিদের দৃষ্টি এমনই সুদূরগামী হয়।

দেশের জন্য প্রাণে কেমন একটা আকুলতা জেগেছিল নিশ্চয়ই। 'শিবাজী-উৎসব' বলে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সেও গভীর দেশ-প্রেমের প্রেরণাতেই।

দেখতে দেখতে আরো এক বছর কেটে গেল, ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে পিতৃদেবের মৃত্যু হল। দেশের মাথার ওপর থেকে যেন একটা বিশাল বটগাছ পড়ে গেল, যার ছায়াতে বাঙালি সমাজ দীর্ঘকাল নিরাপদে বাস করছিল।

কবির বিদ্যালয়ের এখন বড়ই অর্থাভাব, সর্বদা টাকার চিন্তা করতে হয়। মাত্র দুহাজার টাকা দিয়ে 'হিতবাদী' পত্রিকার মালিকদের কাছে তিনটি উপন্যাস, সমস্ত ছোটগল্পগুলি, ছয়টি নাটক, সমস্ত গান ও অনেকগুলি প্রবন্ধের স্বত্বাধিকার বিক্রি করে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। এ-সব ত্যাগ কিন্তু তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, মাথায় ঘুরছে সব সময় দেশসেবার কথা। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যিকার কাজের কথা।

শিক্ষা নিয়ে তখন বড় মতভেদ চলছে, সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলোকে চারটি আঞ্চলিক ভাষায় ভাগ করার প্রস্তাবে কবি প্রবল আপত্তি জানালেন। এ ছাড়াও দেশী শিল্পের উন্নতির জন্য নানান দিক দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। স্বদেশী জিনিস বিক্রির জন্য একটা দোকান খোলার কাজে যোগ দিলেন। আগরতলায় গিয়ে দেশীয় রাজাদের উদ্দেশ্যে একটা সম্ভাষণ দিলেন, তাতে বললেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেন স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হয়। এই তাঁর আশা। জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে মিলে ভারতীয় শিল্পকলার একটি কেন্দ্র স্থাপনের কাজে শিল্পী হ্যাভেল ও নিজের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেন। এ-সমস্ত দেশসেবার কাজ বৈ তো নয়।

এবার লোকে কবির একটা নতুন পরিচয় পেল। এরকম একজন অক্লান্ত কর্মী বড় একটা চোখে পড়ে না, বিশেষ করে আমাদের দেশে।

শান্তিনিকেতনের একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিজের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন একটা স্থান করে নিয়েছিলেন, যার প্রেরণাতে আশ্রমের জীবনে

যেন কেউ রূপকথার সেই জিয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। কাজ হয়ে উঠেছিল যেন একটা ব্রতের মতন। কী না করতে পারতেন শান্তি-নিকেতনের শিক্ষকরা আর তাঁদের গুরুদেব !

বই দরকার ? বেশ, এই বই লিখে দিচ্ছি। অমনি বসে গেলেন পাঠ্যপুস্তক লিখতে। এই ভাবে সরাসরি ইংরেজি শেখাবার জন্য 'ইংরেজি সোপান' লেখা হয়েছিল।

ছেলেরা উৎসবে অভিনয় করবে ? অমনি অপূর্ব সব নাটক রচনা হয়ে গেল, গুরু শিষ্যে মিলে সে-সব অভিনয় করা হল, দেশের লোকে দেখে শুনে অবাক ! দীর্ঘকাল ধরে কত যে নাটক লিখেছিলেন কবি ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। হালকা বিষয় নিয়ে খুবই কম। মজার কথা থাকলেও ছেলেমানুষী নেই প্রায় একটাতেও। আগেই বলা হয়েছে ছোটদের জন্য লিখতে হলেই, খোকামি দিয়ে বই ভরাতে হবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। বরং সর্বদা বলতেন ছোটদের সামনে উঁচু চিন্তা তুলে ধরলে তারা আপনা থেকেই বড় হয়ে উঠবে।

কত নাটক রচনা করেছিলেন, তার তালিকা দেওয়াই মুশকিল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রাজা ও রানী' 'রাজা', 'নটীর পূজা', 'শ্যামা', 'রথের রশি', 'ফাল্গুনী', 'চণ্ডালিকা', আরো কত ! এর মধ্যে কোনোটির বিষয়বস্তুই ছোটদের জন্য বিশেষ করে নির্বাচিত হয় নি, কিন্তু কোনোটির মর্মবাণী বুঝতে ছোটদের এতটুকু কষ্ট হয় না। লেখা হলে পরে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা এগুলি কত আনন্দের সঙ্গে অভিনয় করেছে। পটভূমিকা, আলোকসজ্জা, মাইক্রো-ফোনের অপেক্ষায় থাকে নি তারা, ফুল পাতা দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে, কণ্ঠের স্বর দিয়ে, সুর দিয়ে, সবাইকে মুগ্ধ করেছে। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখনো অবশ্য এতগুলি নাটক লেখা হয় নি। সে-সব আরো পরের কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া মানে ছিল একটা গানের পরিবেশের মধ্যে পড়ে যাওয়া। প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষুদ্র পরিবর্তন, নীল আকাশের

গায়ে একটুখানি মেঘ ভেসে যাওয়া, গাছের পাতার এতটুকু রঙ বদলানো, দুপুরে ঘন পাতার আড়াল থেকে একটুখানি পাখি ডাকা, অমনি সে-সব গান হয়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ত।

এমন গান আর কেউ কখনো শোনে নি। এ ধরাবাঁধা পথে চলা উচ্চাঙ্গের সংগীত নয়, সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিস, মানে দিয়ে এত ভরপুর, সুর দিয়ে এমন মধুময়, যে সুর কথাকে সমৃদ্ধ করেছে, নাকি কথা করেছে সুরকে, তাই ভাবতে বসে যেতে হয়।

এত গান পৃথিবীতে সম্ভবত আর কেউ রচনা করেন নি। এমন অনুষ্ঠান নেই যার উপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন সুখ এমন দুঃখ নেই, যার মনের কথাটি কবি গানের মধ্যে প্রকাশ করেন নি। আর কিছু না লিখে, শুধু যদি গানগুলি রচনা করে যেতেন, তবুও লোকে নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত।

কোথা থেকে যেন গানগুলি পেতেন; যেমনি কথা তৈরি হল, সুর বসানো হয়ে গেল, অমনি খুঁজে বেড়াতেন কাকে সে সুরটি শিখিয়ে দেওয়া যায়, নইলে নিজেই ভুলে যাবেন। বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনের ঐ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, নামকরা সাহিত্যিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে এমনি এক সৃষ্টির উন্মাদনার সময়ে কবিকে দেখেছিলেন, মত্ত গজের মতো কোথায় পা ফেলছেন না দেখে, জলকাদার মধ্যে দিয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খোঁজে চলেছেন। পাছে গানের সুরটি যায় হারিয়ে, তাই তর্ সইছে না। সে এমন দৃশ্য যা এ জীবনে ভোলা যায় না। সে গানটিতেও এই কথাগুলি আছে, 'হৃদয় আমার হয় বিবাগী, নিভৃত নীলপদ্ম লাগি।'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' গানটি লিখেছিলেন, তার প্রথম স্তবকটিতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সুর শুনে সমস্ত শরীরে শিহরণ না লাগে, এমন মানুষ কমই আছে। নিজেও অজস্র দেশপ্রেমের গান লিখেছেন, বাংলা মাকে কত ভাবে, কত ভাষায় বারংবার প্রণতি জানিয়েছেন।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', এ-সব গান শুনলেও বুকে ভক্তির বান ডাকে। ঐ দ্বিতীয় গানটি রাখী-বন্ধনের উৎসবের জন্য লিখেছিলেন।

সে এক দিন গিয়েছিল। বছরটি হল ১৯০৫, কবির বয়স চুয়াল্লিশ

ইংরেজ সরকার বাংলা দেশকে ভেঙে দু ভাগ করে দিয়েছেন, তাই মনে বড় ব্যথা ; ঐ গান গেয়ে দল বেঁধে গঙ্গাস্নান করে আসা হল, রাখী বাঁধা হল সকলের হাতে, দোকানপাট সেদিন বন্ধ রইল, ঘরে ঘরে অরন্ধন। বিকেলে বিরাট সভা হল, আনন্দমোহন বসু হলেন সভাপতি, কবি তাঁর ইংরেজি ভাষণের বাংলা তখুনি করে দিলেন। তার পর শহরের মধ্যে দিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা বেরোল, তারাও কবির লেখা গান গাইতে গাইতে চলল, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান!' দেশসেবার জন্য সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠেছিল। তার চাইতেও বড় কথা, স্বদেশ সম্বন্ধে যারা কখনো ভাবে নি, তারাও সেদিন থেকে ভাবতে শুরু করল।

ইংরেজরা দুশো বছর এ দেশ শাসন করে গেছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, বিদেশী শাসকরা ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে একটিবার মাত্র ব্যাঘাত পেয়ে, ততদিনে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এবার দেশে যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তার কারণ অনেক গভীর, তার প্রসার অনেক ব্যাপক, কারণ—এতদিনে দেশাত্মবোধ জেগেছে। এখন দেশপ্রেমিকরা যা কিছু করছেন সমস্ত ভেবে চিন্তে, যুক্তির সহায়তা নিয়ে, কেবলমাত্র রাগের মাথায় নয়। এ আরো অনেক গুরুতর ব্যাপার।

সমস্ত দেশটা যেন তার দেড়শো বছরের ঘুম থেকে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠল। যাঁরা তার কানে কানে জাগার মন্ত্র দিয়েছিলেন, কবি ছিলেন তাঁদের একজন। দেশের তরুণরা তাঁর দিকে পথনির্দেশের জন্য চেয়ে থাকত। কিন্তু দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি তিনি আদৌ সইতে পারতেন না। দেশপ্রেমের নাম করে পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করা তাঁকে বড় পীড়া দিত। অনেক পত্রিকাতে নির্ভীক ভাবে যেমন ইংরেজ সরকারের, ইংরেজ ভক্তদের, আবার তেমনি নিস্তেজ আরামপ্রিয় দেশবাসীদের ও সংকীর্ণ-মন গোঁড়াদের সমালোচনা করে অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন। তারাও নানান কাগজে এমন ব্যক্তিগত ও অন্যায় ভাবে তাঁকে আক্রমণ করত যে কবির স্পর্শকাতর হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যেত।

ভালোবাসার লোকও ছিল মেলা। যাঁরা আশ্রমের কাজে লেগে-ছিলেন, তাঁরা যে তাঁর কত বড় বন্ধু ছিলেন, সে কথা তিনি বহুবার

বহুস্থানে লিখে গেছেন ; আর ছিলেন যাঁরা, তাঁর আদর্শবাদের সহায়তা করেছেন, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। তা ছাড়া আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে তাঁর নিবিড় একটি অন্তরঙ্গের দল গড়ে উঠেছিল, তাঁর উপর যাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল, তাঁর ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দলের অগ্রণী।

মহর্ষির ভাই ছিলেন দুজন, মেজো ভাই গিরীন্দ্রনাথ ও ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের যখন মৃত্যু হয় তাঁর বয়স তখন ত্রিশেরও কম। গিরীন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সাল অবধি বেঁচেছিলেন। তাঁর আবার দুই ছেলে, গণেন্দ্র আর গুণেন্দ্র। গণেন্দ্রও যৌবনে মারা যান। গুণেন্দ্রের তিন ছেলে ও কয়েকটি মেয়ে। বড় গুণী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন শিল্পী গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সুনয়নী দেবী। সম্পর্কে তাই অবনীন্দ্র হলেন ভাইপো, বয়সে দশ বছরের ছোট। বড় গভীর ভালোবাসার সম্বন্ধ দুজনার মধ্যে, কাকার ইচ্ছা পালন করেই ভাইপো বড়ো সুখী। কিন্তু নিজেরও কম প্রতিভা ছিল না। তাতে কাকারও কোনো হাত ছিল না, নিজের মতো লিখতেন, ছবি আঁকতেন। এঁদের সকলকে পেয়ে কবির জীবনের একটা বড় ফাঁক ভরে গিয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথরা থাকতেন জোড়াসাঁকোতে একই পাঁচিলের মধ্যে, পাশের বাড়িটিতে, যেখানে আগে দ্বারকানাথের বৈঠকখানা ছিল। ঐ বাড়িতে কত নাচগানের উৎসব হয়েছে। এখন সে বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে রবীন্দ্রভারতীর বাড়ি হয়েছে।

যাদের প্রতিভা থাকে, তাদের চরিত্রের মধ্যে সাধারণত দুটি দিক দেখা যায়, যেন দুটো মানুষ তাদের মনে বাস করছে। একটা মানুষ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ায়, পৃথিবীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অন্য মানুষটা নিজের বুকের মধ্যে একলা বাস করে ; জন্মেছে সে একা, মরবেও সে একা, বেঁচে থাকার কালেও তার মনের সুগভীর নৈঃসঙ্গ কেউ ঘোচাতে পারে না। শিল্পীরা, কবিরা, গাইয়েরা অনেক সময়ই এইরকম হন। রবীন্দ্রনাথও তাই ছিলেন। তাই পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাঁর বড় একটা কিছু করতে পারত না। বারে বারে দেখা যেত এক সময় যাদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা, তাদেরও কেমন অকাতরে ছেড়ে যাচ্ছেন।

কবিদের এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সেই সঙ্গী থাকে, তাঁরা

যাঁকে সত্য বলে জেনেছেন। তাকে বিশ্বাসও বলা যায়, ভগবানও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথেরও সেই সুগভীর বিশ্বাস ছিল, যা তাঁকে দুঃখে বল দিত, সুখে রক্ষা করত। সারাজীবন ধরে যখন যা লিখেছেন, কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি গানে, সবটার মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়, সবই যে তাঁর হৃদয়ের সেই চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। তাই বলে সব সময়ই যে এই কথা বলে গেছেন তাও নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বুদ্ধি-বিবেচনার পরিণতি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মতামতগুলোকেও শুধরে নিয়েছেন। আগে যে কথা বলেছেন, পরে যদি সেটাকে ভুল বলে মনে হয়েছে, তাও তখুনি স্বীকার করেছেন। এতে তাঁর সত্যনিষ্ঠাই বারংবার প্রমাণ হয়েছে। যা তিনি বিশ্বাস করতেন না, সে কথা লেখা বা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য তাঁকে কম কষ্ট পেতে হয় নি, কত সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। জাতীয়তা আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে স্থান নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ক্রমশ লক্ষ্য করলেন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা দেখা দিচ্ছে, মনে হল যেন সাম্প্রদায়িকতার ভাবটাও বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে এও বুঝলেন যে এখানে তাঁর স্থান নেই, তখুনি সরে দাঁড়ালেন। দেশপ্রেম ও দেশের মঙ্গল চিন্তা এতটুকু কমল না, তবুও রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সারা জীবন দেশের কাজ করে গেলেন, কিন্তু আর আন্দোলনে নিজেকে জড়ালেন না। শান্তিনিকেতনে শান্তির আশায় অপেক্ষা করে থাকলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকাতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার'; তাতে তখনকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুর্বলতা কোথায় দেখিয়ে দিয়েছেন, দেশবাসীদের সম্পূর্ণ একটা মনের পরিবর্তন চেয়েছেন, সমাজসেবা দিয়েই দেশের কল্যাণ হয় এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এরকম কথা তখনকার সেই গরম মুহর্তে কেই-বা শুনতে চেয়েছিল। এমন-কি, তাঁর বন্ধু ও সুহৃদ সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রবন্ধের একটা পালটা জবাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু কবির নিঃসঙ্গ পথে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট পাথেয় ছিল।

এর পরই ভারি সমৃদ্ধ একটি সৃষ্টির পর্ব শুরু হয়ে গেল। আঘাত

পেলেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মন ও লেখনী খুলে যেত। তখনকার অপূর্ব সব রচনার মধ্যে একটা প্রচণ্ড বলিষ্ঠতা, একটা অন্ধকার-ভেদ-করা দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দকে তখনই চিনে নিয়ে, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' বলে একটা অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন। 'গোরা' নামে একটা সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন তাতে সবরকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা আছে। 'শারদোৎসব' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' লেখেন, 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা রচনা করতে থাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কর্তব্যগুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যান, তবে সংসারে তাঁর কোনো মোহই ছিল না। ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে দিয়ে জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষিবিদ্যা শিখবার জন্য আমেরিকা পাঠালেন।

নিদারুণ একটা শোকও পেয়েছিলেন, ছোট ছেলে শমীন্দ্র মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে সেইখানেই হঠাৎ মারা যায়। কবিরা কেমন করে গভীরতম দুঃখকে বরণ করে নিতে পারেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে, তাঁর একমাত্র নাতির তরুণ বয়সে মৃত্যুও তাঁকে কম ব্যথা দেয় নি। সেই সময় মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে অপূর্ব একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লিখেছেন,

"শমী যে রাত্রে গেল, তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়ে নি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"

পরম দুঃখকে এমন করে যিনি গ্রহণ করতে পারেন তাঁর মধ্যে যে প্রবল পৌরুষ বিরাজ করছে, সে সব মানুষের নমস্য। রবীন্দ্রনাথ লম্বা চুল রাখতেন, মাঝে মাঝে রঙচঙে জাব্বা-জোব্বা পরতেন, কেউ গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে, তখুনি লজ্জা পেয়ে খুলে ফেলতেন

না। দূরে থেকে এ-সব কথা শুনে লোকে ভাবত কবির বুঝি মেয়েলি স্বভাব। কিন্তু যেমনি কাছে যাওয়া, তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে, তাঁর দৃঢ় বাহুখানির দিকে একবার তাকিয়ে, তাঁর ঐ প্রবল পৌরুষের কাছে সকলে মাথা নত করত। কিন্তু ঐ প্রচণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গে কি অপূর্ব কোমলতাও ছিল, কি সহানুভূতি, কি সমবেদনা, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। শক্তি শুধু তাঁর কলমে ছিল না, তাঁর চরিত্রে তাঁর সমস্ত দেহ মনে বিরাজ করত, তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হত।

কী সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে একবার দেখত সে আর কখনো ভুলত না। কখনো স্বচ্ছ দীঘির জলে সূর্যের আলো পড়লে যেমনি হয়, তেমনি টলমল করত। আবার অন্যায় দেখলে সেই চোখ থেকেই যেন বিদ্যুৎ ঝলকাত, অপরাধীরা ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত।

বড় সুন্দর চেহারা ছিল বুড়ো বয়স অবধি, অমনটি আর দেখা যায় না। মাথায় ছয় ফুটের বেশিই মনে হত, শক্ত সুঠাম দেহখানি, ফরসা রঙ, উঁচু নাক, আয়ত চোখ, কোঁকড়া চুল। কবির যখন চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, তখন লেখক দীনেশ সেন, তাঁকে দেখে একজনকে লিখেছিলেন,

"ঠাকুরবাড়ির প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া, দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল।...দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত।...রবিঠাকুরের বয়স অল্প...কিন্তু স্বভাব স্থির।...তাঁহাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন।"

ঠাকুরবাড়ির সেই 'কালো ছেলে'কে দেখে লোকে এমনি মুগ্ধ হত। তার পর সেই প্রথম দেখা যখন ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াত, তাঁর চরিত্রের শত শত গুণ দেখে মুখে কারো কথা সরত না।

সপ্তম অধ্যায়

কবি নিজে রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়লেও, দেশবাসীরা তাঁকে ছাড়বে কেন? ১৯০৮ সালে পাবনাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অনুষ্ঠানে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হল। তিনি দেশের যুবকদের তাঁর ভাষণে এই কথাই বলেছিলেন যে, যাও, দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে কাজ করো গে যাও, হিন্দু মুসলমানে ভেদ রেখো না, গ্রামের উন্নতি করো, পথ-ঘাট বানাও, বিদ্যালয় স্থাপন করো। সেই তো দেশের সেবা।

ঐ বছরেই মজঃফরপুরে স্বদেশীরা বোমা ফেলেছিল, তার পর কলকাতায় বোমা তৈরির একটি কারখানাও আবিষ্কার হল, শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ দলসহ ধরা পড়লেন। কবি বুঝলেন, শাসকদের অত্যাচারের ফলেই এমন হয়েছে। বীর দেশপ্রেমিকদের শ্রদ্ধা জানালেন, তবু বললেন এ পথ নয়। এই বিষয় 'প্রবাসী'তে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন, 'পথ ও পাথেয়', 'সদুপায়', 'পূর্ব ও পশ্চিম' ইত্যাদি। খ্যাতির বিড়ম্বনাই হল এই যে বিরুদ্ধ সমালোচনার পাত্র হতে হয়। অখ্যাত লোককে কেউ আক্রমণ করতে চায় না, বিখ্যাত সমালোচক সাহিত্যিকরা তো নয়ই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নানান পত্রে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনার তিক্ত সমালোচনা ছাপাতে লাগলেন। সেগুলিতে এমন ব্যঙ্গ মেশানো ছিল যে পুরনো বন্ধুর এই শ্লেষপূর্ণ আলোচনায় কবি বড় দুঃখিত হলেন। শোনা যায় 'সোনার তরী' নামের বিখ্যাত মধুর কবিতাটিও রেহাই পায় নি। যে শব্দগুলি সাধারণের কানে মধু বর্ষায়—'চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'—সেগুলি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপ করেছিলেন। আরো অনেক গুরুতর কথাও বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সব জায়গায় মানে বোঝা যায় না, তা ছাড়া দুর্নীতিতে পূর্ণ ইত্যাদি।

বন্ধুদের অনুরোধে পরে কবি এর একটি উত্তর দিলেও, তাঁর সাহিত্য রচনার উপর এ-সব নির্মমতার কোনো প্রভাব দেখা গেল না।

১৯০৯ সালে কবির ছেলে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় তিন বছর

কৃষিবিদ্যা শিখে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরেই, অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়িনী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে কবি ছেলের বিবাহ দিলেন। 'গোরা' বইখানি কবি ছেলেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এর চাইতে উন্নত পৌরুষের চিত্র কোনো কালে কোনো বাপ তাঁর আদরের পুত্রের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না।

এই-সব ঘটনার বছর খানেক পরে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম অনুবাদ 'মডার্ন রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। এই তর্জমাগুলি লোকেন পালিত করেছিলেন। এতে করে বাংলার বাইরেও কবির গল্পের সমাদর হবার একটা সুযোগ হল।

কবির এখন পঞ্চাশ বছর বয়স। সেবার শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হল; কবির লেখা 'রাজা' অভিনয় হল, নিজে 'ঠাকুরদা' সাজলেন। জীবনের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে, কবি এবার নিজের শৈশব ও প্রথম যৌবনের স্মৃতিকথা লিখে বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনালেন, পরে সেগুলি 'জীবনস্মৃতি' নামে প্রকাশিত হল।

ততদিনে বাগ্‌দেবীর সিংহাসনের পাশেই যেন কবির আসন পাতা হয়ে গেছে। 'অচলায়তন' নাটক লেখা হল ও প্রকাশিত হল, অমনি গোঁড়ারা গেলেন চটে, কারণ এই নাটকে গোঁড়ামির আর অর্থশূন্য নিয়ম পালনের নিন্দা আছে। আবার প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তারও ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

'ডাকঘর' রচনা হল। ছোট ছেলে অমল রোগশয্যায় শুয়ে জানলা দিয়ে কেমন করে পৃথিবীকে ও পৃথিবীকে যিনি চালান তাঁকে চেনে তারই করুণ মধুর নাটিকা; সকলে মুগ্ধ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কলকাতায় সে বছর ভারতীয় জাতীয় অধিবেশন হল। সেই উপলক্ষে কবি তাঁর অবিস্মরণীয় গান 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' রচনা করলেন, সেই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত হয়েছে। সে কি কম গৌরবের কথা।

১৯১১ সালের মে মাসে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে, পরের বছর জানুয়ারি মাসে কলকাতার টাউন হলে মহা ঘটা করে দেশবাসীরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করল। সমস্ত দেশ যেন সেখানে জড়ো হল, তার আগে কখনো কোনো সাহিত্যিককে এ দেশে এমন করে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় নি। কে না গিয়েছিল, যাদের ধন, বল, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্মান,

উচ্চপদ তাঁরা তো ছিলেনই, তার চাইতেও অনেক বড় কথা, হাজার হাজার অখ্যাত স্বদেশবাসীরা কবিকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ভিড় করে এসেছিলেন। এই প্রথম এমনভাবে কবিকে দেশের শিরোমণি বলে স্বীকার করা হল। পুরনো বন্ধু পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অপূর্ব ভাষায় সকলের প্রতিনিধি হয়ে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

দেশের লোকে তো তাঁকে এতদিনে খানিকটা চিনেছেই, অজিত চক্রবর্তী তাঁর কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করে দেশের বাইরেও তাঁর পরিচয়ের পথ খুলে দিয়েছিলেন।

চিরদিন রবীন্দ্রনাথ ঐক্যমন্ত্রে বিশ্বাস করে এসেছেন। হিন্দু মুসলমান ভেদ তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তাঁদের পরিবার ছিল ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয়, হিন্দু ও ব্রাহ্মও যে পৃথক নয়, এই নিয়ে ব্রাহ্মদের কাছেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁর উপর রুষ্ট হয়েছিলেন, 'তত্ত্বকৌমুদী'তে তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলেন।

এই সময় তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' লেখা হয়, তাতে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে ভারতের ধর্মই হল ভিন্ন ভিন্ন মতকে আপন করে নেওয়া।

এত কাজের মধ্যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কিন্তু কোনো অযত্ন হয় নি। বিরুদ্ধবাদীদের প্ররোচনায় কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার এই মত দিয়েছিলেন যে ওখানকার শিক্ষাদীক্ষা সরকারি-কর্মচারীদের ছেলেদের উপযুক্ত নয়। অথচ ঠিক সেই সময়েই ফেল্পস্ নামে একজন আমেরিকান এ দেশে এসে সব দেখে শুনে বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে প্রকৃত মানবতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ক্রমে কবির মনে হতে লাগল তাঁর শিক্ষার আদর্শের কথা দেশ-বিদেশকে জানানো দরকার নইলে কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এই উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে কবি তৃতীয়বার য়ুরোপে গেলেন।

এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভও হয়েছে; এবার যে ইংলণ্ডের পরিচয় পাবার সুযোগ হল, সে সেই তরুণ ছাত্রের চোখে দেখা বিলেতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

গিয়ে তো এক হোটেলে উঠে, শিল্পী রথেন্‌স্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রথেন্‌স্টাইন এর আগে ভারতে এসেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের

সঙ্গে দেখাশুনা হয়েছিল। রথেন্‌স্টাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে, সেগুলি কবি ইয়েটস্‌, সাহিত্যিক স্টপ্‌ফর্ড ব্রুক ও ব্র্যাড্‌লিকে দেখালেন। তাঁরাও উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

রথেন্‌স্টাইনের বাড়িতেই ওখানকার সাহিত্যজগতের যাঁরা নেতা-স্বরূপ, তাঁদের ডেকে ইয়েটস্‌ই কবিতাগুলি পড়ে শোনালেন। সেইখানেই এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে কবির প্রথম দেখা, যে এণ্ড্রুজ পরে এ দেশে এসে কত কাজ করে গেছেন।

এবার কবির সঙ্গে বিলেতের বহু জ্ঞানীগুণী চিন্তাশীল লোকদের পরিচয় হল। ওদের দেশের লোকেরা কেমন করে থাকে, কথা বলে, চিন্তা করে, তাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে কিছু আর তাঁর অজানা রইল না। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' এই দুটি নাটকেরও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল। এমনি করে বিদেশেও কবির অনেক ভক্ত বন্ধু লাভ হল।

তার পর দেশে ফিরে এলেন। এসেই এখানকার কাজ আরো প্রসারিত করলেন। শান্তিনিকেতন থেকে সামান্য দূরে সুরুল গ্রামে পুরনো একটি নীলকুঠির বাড়ি ও জমিজমা কিনে ফেললেন। এইখানেই পরে গ্রাম-উন্নয়নের কেন্দ্র হল।

কিন্তু বিদেশের কাজ তো শেষ হয় নি, সবে মাত্র ইংল্যাণ্ড যাওয়া হয়েছে। সেই বছরের শেষের দিকে আমেরিকা গিয়ে, নানান জায়গায় বক্তৃতা ইত্যাদি দেবার সুযোগ পেলেন।

নভেম্বর মাসে লণ্ডনে তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল। এ বই বাংলা গীতাঞ্জলির হুবহু অনুবাদ নয়, এর মধ্যে 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতিমাল্য' আর 'গীতাঞ্জলি' থেকে কয়েকটি কবিতা বেছে নিয়ে ইংরেজিতে তর্জমা করা হয়েছে। ইংরেজ-পাঠকরা সাদরে বইটিকে গ্রহণ করল। দেখতে দেখতে আরো অনুবাদ বেরোল, 'দি গার্ডেনার' ও 'দি ক্রিসেণ্ট মুন' আর 'চিত্রা' নাম দিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'।

ভাগ্যদেবী যখন কারো উপরে প্রসন্ন হন, ঠিক মনে হয় যেন তাঁকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তখনকার বড়লাট রবীন্দ্রনাথের বিষয় এশিয়ার সভাকবি বলে উল্লেখ করেছিলেন। লাট সাহেবের বাড়িতে সেই সভায় এণ্ড্রুজ সাহেব কবির জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে কবি দেশে ফিরলেন, আর নভেম্বর মাসে শুনলেন, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' রচনার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সুইডেনের একজন মহানুভব ব্যক্তি বছরে বছরে নানান ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন। পাত্র নির্বাচন করেন সুইডিস্ একাডেমি।

সুখবর শুনে দেশের লোকেও আনন্দিত হয়ে উঠল। একদল গেল শান্তিনিকেতনে কবিকে অভিনন্দন জানাতে। তারা গিয়ে দেখল নিজের দেশ যে স্বীকৃতি তাঁকে দেয় নি, বিদেশ থেকে সেই স্বীকৃতি আগে পেয়ে কবির মন তিক্ততায় ভরে আছে। এই নিয়ে কেউ কেউ কবির উপর অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন।

পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই স্কুল-পালানো ছেলেটিকে 'ডি. লিট.' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। কবি নিশ্চয়ই মনে মনে খুব খানিকটা হেসেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ, সুরুলে কেনা সেই কুঠিবাড়িতে একটা বিজ্ঞানাগার খোলা হল। সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আনা হল, গবেষণার কাজ শুরু হল। এ-সব গবেষণা কৃষিবিদ্যা ও কি করে ভালো ফসল হয়, এই-সব বিষয় নিয়ে হত।

কাজের সঙ্গী পেয়েছিলেন কবি এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবকে। মাঝে আবার তাঁরা দুজন একবার আফ্রিকাতে কিছুদিন কাজ করে এলেন। সেখানেও ঘোর অন্যায় ও অশান্তির দিন যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গরা কালো মানুষদের উপর অভাবনীয় অত্যাচার করছে। তার প্রতিবাদ করবার জন্য যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলে একজন ক্ষীণকায় যুবকও ছিলেন। এঁর কাজের সহায়তা করবার জন্যেই ওঁদের আফ্রিকা যাওয়া।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যে কিভাবে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। চমৎকার

বাংলা শিখেছিলেন পিয়ার্সন, এমন-কি, যখন ওখানে 'অচলায়তন' মঞ্চস্থ হল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার্সনও অভিনয় করলেন।

এখন শান্তিনিকেতন বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—যে-ই কবিকে দেখে, প্রথমে তাঁর রচনার মাধুর্যে, তার পর তাঁর দেহের সৌন্দর্যে, তার পরে তাঁর ব্যক্তিত্বের সবলতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এইভাবে একজন আরব কবিও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তাঁর নাম বাস্তানি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তাঁদের আরবী ভাষাতে তর্জমা করেছেন, আবার ঐ আরবী থেকে কবিতাগুলি তখন নানান মধ্য-য়ুরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে। এমনি করে সারা পৃথিবীর লোকে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানল।

এদিকে দেশের লোকে যে বলত শান্তিনিকেতনের ব্যাপারই আলাদা, ওখানে যেমনি গুরু, তার তেমনি চেলা। সে কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যিও ছিল। ওখানেই কবি নিজের মনের আশা, মনের স্বপ্নকে মূর্তি দিতে চেষ্টা করতেন।

বকাঝকা ভালোবাসতেন না। মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলেদের ধরে মাস্টারমশাইরা গুরুদেবের কাছে নিয়ে আসতেন—শাস্তি দেবার জন্যে। গুরুদেব তখন পড়ে যেতেন মহা ফাঁপরে। তাঁর মনে হত যেন তাঁর নিজের ছোটবেলাকার সমস্ত অপরাধগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে গিয়ে, দাঁত বার করে হাসছে। আর শাস্তি দেওয়া হয়ে উঠত না।

কবির বিষয় আরেকটা মজার গল্প শোনা যায়। একবার দারুণ বর্ষা নেমেছে, ছেলেরা পড়াশুনো ছেড়ে, ঘরের আশ্রয় ছেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে, জলে ভিজছে আর গান গাইছে, কিছুতেই বারণ শুনছে না। বেগতিক দেখে মাস্টারমশাইরা গেলেন গুরুদেবের কাছে। তিনি তাঁদের সেখানে বসিয়ে রেখে নিজে গেলেন ছেলেগুলোকে শাসন করতে।

মাস্টারমশাইরা বসে থেকে থেকে শুনতে পেলেন ছেলেদের জলে ভেজার হৈ-চৈ থেমে না গিয়ে যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল, আর ধৈর্য রাখতে না পেরে, তাঁরাও গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, চেলাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুরুও ভিজছেন আর বর্ষার গান গাইছেন। অমন দৃশ্য দেখা কারো ভাগ্যে বড়-একটা ঘটে না।

প্রথম প্রথম লোক সহজে ওখানে ছেলে ভরতি করতে চাইত না, এ কথা ঠিক। কিন্তু কেউ যদি চাইত, তাকে এক কপি ছাপা নিয়মাবলী

পাঠানো হত, যেমন নিরামিষ খেতে হবে, খালি পায়ে থাকতে হবে ইত্যাদি।

সেইসঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে যেতে হবে তারও একটা তালিকা থাকত। তালিকাটিতে থাকত, পাঁচখানা কাপড়, তিনখানা করে গেঞ্জি ও জামা, তার পর বিছানা মশারি—দারুণ মশার উপদ্রব ছিল সেকালে—আবার একজোড়া পট্টবস্ত্রও নিতে হত, উপাসনা ইত্যাদির জন্য। একটা গাড়ু, একখানা করে থালা, বাটি, গেলাস, একটা টিনের তোরঙ্গ। অর্থাৎ কিনা যেটুকু না হলেই নয় সেইটুকুই নিতে হত। বিদ্যালয়ের এমন অবস্থা ছিল না যে সংসারের দরকারি জিনিসটুকুও জোগাতে পারবে। এর উপর এক বাক্স ছুতোরের হাতিয়ার নিতে হত, হাতের কাজ শিখতে হত সকলের। ছাত্ররা বাইরে থেকে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নানান অদ্ভুত গল্প শুনে ভয়ে ভয়ে পৌঁছেই, গুরুদেবকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত।

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ, যিনি পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও তার পরে ঐ শান্তিনিকেতনেরই উপাচার্য হলেন, তিনিও ছিলেন ওখানকার ছাত্র। তাঁর পিসতুতো দাদারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, যাও-না একবার সেখানে, ওদের এক গুরুদেব আছেন, তোমার মতো ছেলেদের পিটিয়ে তিনি সোজা করেন।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে যখন অতিথিশালার দোতলায় উঠে গুরুদেবের সামনে দাঁড়ালেন, দেখলেন বেশ লম্বা চেহারার মধ্যবয়সী একজন লোক, চুলে দাড়িতে পাক ধরেছে, পরনে থান-ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে নাক-ওলটানো লাল চটি, নাকে স্প্রিং লাগানো চশমা, গলার চারি দিকে কালো ফিতে দিয়ে ঝোলানো। হাত দুটি ভারি বলিষ্ঠ, এক কালে এই হাতে পদ্মায় দাঁড় টেনেছেন। আর সে যে কি মিষ্টি গলা! দেখে শুনে সেই মুহূর্তেই এই নতুন ছাত্রটি চিরকালের মতো গুরুদেবের ভক্ত হয়ে গেলেন।

সাধারণ স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম এখানে চলত না, তাই বলে যে এখানকার জীবনে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না, তা নয়। যথাসময়ে পরিপাটি করে নিজেদের কাজ নিজেদের করে নিতে হত। ঘর দোর পরিষ্কার রাখতে হত, জিনিসপত্রের যত্ন করতে হত, কালি কলম পেনসিল নিব সাবান ইত্যাদি বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হত, অভিভাবকরা

দাম দিতেন। কিন্তু পুরনোটার কি হল তার একটা কৈফিয়ত না দিতে পারলে, নতুন জিনিস পাওয়া যেত না।

তক্তপোশে শুত ছেলেরা। বাক্সটা তারই নীচে থাকত। মাস্টার-মশাই একজন ঘরে থাকতেন, দেখাশুনা করতেন। স্বাবলম্বী হতে শেখানো হত, কিন্তু কারো অযত্ন করা হত না।

সব সময় চেষ্টা করা হত যাতে দেশের প্রতি ছেলেদের ভক্তি বাড়ে আর বিলাসিতার দিকে মন না যায়। মাস্টারমশাইদের ভালোবাসা ও ভক্তি করা, বেদমন্ত্র মুখস্থ করা, ভগবানের নাম নিয়ে প্রতিদিনকার পাঠ আরম্ভ করা, এই-সবই ছিল ওখানকার শিক্ষার অঙ্গ। এর ফলে ছেলেদের মনে একটা নিষ্ঠার ও বলিষ্ঠতার সৃষ্টি হত, যা তাদের চিরদিনের পাথেয় হয়ে থাকত।

এমনি করে আস্তে আস্তে ১৯১৪ সাল এসে গেল। নোবেল প্রাইজের পাওয়া একলক্ষ কুড়িহাজার টাকার সবটাই কবি আশ্রমের কাজের জন্য দিয়েছিলেন। লেখার কাজও সমানে চলতে থাকল। ইন্দিরা দেবী হলেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা, কবির বড় আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রূপে গুণে অসাধারণ, তার উপর পরম বিদুষী। তাঁর স্বামীর নাম প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য জগতে 'বীরবল' নাম খ্যাত, উঁচু দরের প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। এঁরা দুজনে ছিলেন কবির বড় প্রিয়পাত্র। 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলোর অধিকাংশ ইন্দিরা দেবীকেই লেখা। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' নামে একটি নতুন মাসিকপত্র বেরোতে লাগল। তাতে কবির অজস্র গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল।

সমালোচকরা, নিন্দুকরা এখনো রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে কথা কইতেন না, তিনিও নির্ভীক ভাবে যাঁরা সমাজসেবার নামে নিজেদের নাম জাহির করে বেড়াতেন তাঁদের সমালোচনা করে যেতে লাগলেন। 'লোকহিত' নামে একটি প্রবন্ধ পড়ে দেখবার মতো।

তার পর বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ, এক দিকে জার্মানি ও তার বন্ধুরা, অপর দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। ভারত তখনো পরাধীন, তার মতামতের অপেক্ষায় কেউ রইল না। যুদ্ধ বাধার খবরে দেশের চিন্তাশীল লোকরা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। কবি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। তার পর এই বিষয়েই 'মা মা হিংসী' নামে

প্রবন্ধ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা কিন্তু ব্যথা-বেদনার মধ্যে থেকে যেন প্রেরণা পেত। এই সময়ে দেড়মাসের মধ্যে 'গীতালি'র একশো গান লিখেছিলেন, 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতা লিখলেন, গোটা দুই ছোট-গল্প লিখলেন, তার একটির ইংরেজি অনুবাদও করলেন।

এবার কবির জীবনে একটি নতুন প্রভাব ও একজন চিরকালের বন্ধুর আগমন হল। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যাঁর কাজের সাহায্য করবার জন্য আফ্রিকা গিয়েছিলেন।

আফ্রিকার ট্র্যান্সভাল প্রদেশে গান্ধীজি 'ফীনিক্স স্কুল' বলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াতে ও অন্যান্য অসুবিধার ও অত্যাচারের কারণে তখনকার মতো আফ্রিকাতে এই বিদ্যালয় চালানো মুশকিল হয়ে উঠেছিল।

এণ্ড্রুজের মুখে কবি ছাত্রদের ও তাদের অধ্যাপকদের শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। এলেন তাঁরা। এখানকার ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজও শুরু হল।

ঐ ছেলেরা অনেক কঠিন জীবনে অভ্যস্ত ছিল, স্বার্থত্যাগও অনেক করেছিল। তাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা চিনি আর ময়দা খাওয়া ছেড়ে দিল। যে পয়সাটা বাঁচল তাই দিয়ে পূর্ববাংলার দুঃস্থ চাষীদের সাহায্য করা হবে, এইরকম স্থির হল।

কবি ঠিক সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, পরে যখন এইভাবে টাকা তোলার কথা শুনলেন, তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, এ ভাবে না তুলে পরিশ্রম করে তুললে ভালো ছিল। অযথা শরীরকে পীড়িত করে সৎকাজে নামতে হয় না, এ কথা কবি অনেক বার বলেছেন। দরকার হলে কষ্ট সইতে পারবে, শরীরকে এমন করে তৈরি করতে হবে; কিন্তু অকারণে শারীরিক যন্ত্রণা ডেকে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতের মধ্যে একটা সহজ যুক্তি ছিল। শরীরকে যদি বেশি কষ্ট করতে হয়, মনটাও কেবল সেই দিকে যায়। কি করে শরীরটা একটু আরাম পায় শুধু এই চিন্তা নিয়েই থাকে, কোনো কাজে তেমন উৎসাহ পায় না। সেইজন্য শরীরকে শক্ত করে তৈরি করলেও, যথাসম্ভব তাকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে হয়, যাতে তার সমস্ত শক্তি সৎকাজে নিয়োজিত হতে পারে।

এই নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে কবির মতে মিলত না। আশ্রম দেখে গান্ধীজি বলেছিলেন, ছেলেরা এ ব্যবস্থায় বড় আরামপ্রিয় হয়ে যাবে, রান্নাঘরে ও অন্যান্য কোনো কাজের জন্যও চাকর রাখা ঠিক নয়। কবি কিন্তু তাতে মত দেন নি, যদিও একবার পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পরের বছর গান্ধীজি এসে তাঁর ছাত্রদের হরিদ্বারে নিয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত গান্ধীজিকে স্মরণ করে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা বছরে একদিন আশ্রমের নোংরা পরিষ্কার করার কাজও নিজেরা করেন।

এর মধ্যে 'ফাল্গুনী' নামে একটা নাটক লেখা হল, 'চতুরঙ্গ' বলে চারটি গল্প একসঙ্গে প্রকাশিত হল, 'সবুজ পত্রে' 'ঘরে বাইরে' বলে একটা নতুন উপন্যাস বেরোতে লাগল। যে-সব সমস্যা নিয়ে কবি নিভৃতে চিন্তা করতেন, সে-সমস্ত গল্প হয়ে নাটক হয়ে প্রস্ফুটিত হত। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' সেই ধরনের গল্প। যে-সব মন্দ নিয়ম সমাজে চলে আসছে বলে লোকেরা মেনে নিচ্ছে, কবি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন এই-সব গল্পের মধ্যে। 'ঘরে বাইরে' হল ঠিক সেই যুগের উপযুক্ত গল্প। আমাদের দেশের মেয়েরা তখন সবে মাত্র উচ্চ শিক্ষার আলো পেয়ে সমাজের কর্মক্ষেত্রে নামতে আরম্ভ করেছেন। আবার অন্য দিকে নিজেদের ঘর-সংসারের প্রতিও তাঁদের অনেক কর্তব্য আছে। এই-সব সমস্যা নিয়ে গল্প।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু শান্তিনিকেতনের মধ্যেই নিজের শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আর বিদেশে সে বিষয় জানিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, তা নয়। শান্তিনিকেতনের মধ্যে কতটুকুই-বা ক্ষেত্র সে কথা জেনে, সারাজীবন তিনি নানান প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে নিজের চিন্তার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এই সময়ে লেখা 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে আবার সেই পুরনো কথাই, অর্থাৎ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথাই বলেছেন। আরেকটি প্রবন্ধও এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'। সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের যুগ, বল প্রয়োগ করে ছাত্রদের তখন শাসন করা হত, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হত, কবি তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, এতে এদেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ বেড়েই যাবে। হয়েছিলও তাই।

এই ভেবে বার বার আশ্চর্য হতে হয় যে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগে কবি যে-সমস্ত সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন আর তার

সমাধানের যে-সব উপায় উল্লেখ করেছেন—যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার, পল্লীগ্রামের উন্নয়ন, কুটির শিল্প ও লোকশিক্ষার উন্নতিসাধন ইত্যাদি, সেই-সব সমস্যা নিয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা আজও মাথা ঘামাচ্ছেন, আর এতদিন পরেও কবির দেখানো সেই-সব পুরনো পথগুলিকে খুলে দেবার কথা ভাবছেন। এইজন্যই লোকে বলে যে কবিদের দিব্যদৃষ্টি থাকে, তাঁরা ভবিষ্যৎ দেখতে পান। আসলে তাঁরা সংসারের বন্ধন মানেন না, স্বার্থের গণ্ডির বাইরে তাকিয়ে থাকেন বলেই আমাদের কাছে যা অন্ধকার, ওঁদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অসাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁরা অনেক সময়ই তাঁদের যারা বিপক্ষ দল বলে পরিচিত, তাদেরও শ্রদ্ধা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে এসেছেন, কিন্তু ইংরেজদের নানান গুণের প্রতি তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন। ইংরেজ সরকারও তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ১৯১৫ সালে, জুন মাসে, কবিকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। এইভাবে প্রকাশ্যে আর এর চাইতে বড় সম্মান তাঁরা কিই-বা দিতে পারতেন?

১৯১৬ সালে কবি আরেকবার বিদেশে গেলেন, এবার পুবমুখী হয়ে ব্রহ্মদেশে, চীনদেশে ও জাপানে। তবে সরকারি আদেশে হংকং থেকেই জাপান যাত্রা করতে হল, অন্যান্য জায়গা আর দেখা হল না। জাপানে কবির বলিষ্ঠ পৌরুষের যে পরিচয় পাওয়া গেল, ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।

তখন জাপানেও সাম্রাজ্যবাদের যুগ চলেছে, চীনে সবে গণতন্ত্র একটুখানি শুরু হয়েছে। জাপানবাসীরা কবিকে খুবই আদর দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কবিদের চোখ হয় অন্যরকমের, সেইখানেই তিনি চীনদেশে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। তাতে ওখানকার কর্তৃপক্ষরা তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু কবি যে কথাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন, তাকেই প্রকাশ করলেন। জাপান ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে পারলেই ক্যানাডা ও আমেরিকা। ক্যানাডা থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। কবি সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ ক্যানাডা ভারতীয়দের প্রতি তখন ন্যায়-বিচার করত না।

ক্যানাডায় না গিয়ে গেলেন আমেরিকাতে। সেখানে কয়েক মাস

ধরে নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন, তার ফলে ভারতের একজন অসাধারণ কবির মুখে আমেরিকার জনসাধারণ ভারতের যে পরিচয় পেল তার প্রতিদানে তাকে যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দিল, সে আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হত না। শুধু ভারতের বাণী দিয়েই কবি থামেন নি, আমেরিকার ভারত-বিদ্বেষের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এগারো বার কবি ভারতের মাটি ছেড়ে বিদেশে গেছেন, আর যেখানেই গেছেন, কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হলেও সেখানকার বেশির ভাগ লোকেরাই ভারতের বন্ধু হয়ে উঠেছে। ব্যবসার জন্য যারা যায়, চাকরি করতে যারা যায়, বিদ্যালাভের আশায় যারা যায়, তাদের কাছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ তারা নিতে যায়, কিছু দিতে যায় না।

নবম অধ্যায়

প্রায় দশ মাস বিদেশ ভ্রমণের পর কবি দেশে ফিরে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো চলছে, কিন্তু সে যুদ্ধ ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সামান্যই আঘাত করেছিল। এসে দেখেন ইতিমধ্যে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর রথীন্দ্রনাথ পাণ্ডা হয়ে জোড়াসাঁকোতে ভারতীয় শিল্পের এক বিদ্যালয় খুলে বসেছেন, তার নাম 'বিচিত্রা'। কবি ঐ সঙ্গে একটা ক্লাব তৈরি করে ফেললেন, তারও নাম 'বিচিত্রা'। দেখতে দেখতে সেখানে কলকাতা শহরের যত জ্ঞানীগুণীরা নিয়মিতভাবে জড়ো হতে লাগলেন। সেই যে অনেকদিন আগে, কবির কৈশোরে ঐ বাড়িতেই বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা হত, এ যেন তারই এক ধাপ উপরে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভার প্রাণকেন্দ্র, কত যে নতুন লেখা এখানে পড়া হত তার ঠিক নেই। তবে কবি তো আর কলকাতায় থাকতেন না, আসতেন যেতেন।

এতদিনে জোড়াসাঁকোর বাড়ির জাঁকজমক অনেকখানি চলে গেছে। তার চেহারাও অনেক পালটে গেছে। এখন যে দোতলা লাল বাড়িটা দেখা যায়, সেটি আগে ছিল না। এই বাড়ি রবীন্দ্রনাথই করিয়েছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের অনেকেই ঐ বাড়ির বাসিন্দা হলেও সব যেন ছাড়া ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কবির ভাইদের পরিবারও অনেক ক্ষেত্রেই এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সবার বড়। তিনি অনেক দিন শান্তিনিকেতনে বাস করে ১৯২৬ সালে মারা যান। তাঁর ছেলে দীপেন্দ্রনাথও সব সময় শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। তাঁর ছেলে দিনেন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে দিন্‌দা বলে পরিচিত ছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে এক-আধটা গান শেখে নি, এমন ছাত্র কম ছিল। কবি গান রচনা করে, তাতে সুর দিয়ে, দিনেন্দ্রনাথকে সুরটি শিখিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকতেন। দিন্‌দা ছিলেন গুরুদেবের সুরের ভাণ্ডারী।

তার পর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আই· সি. এস.। চাকরির জন্য এদিকে ওদিকে ঘুরতে হত। পরে যদিও কলকাতাতেই বাস করতেন, জোড়াসাঁকোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কম।

হেমেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালেই মারা যান, বীরেন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে ঋষির জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ের উপর সুন্দর বাড়ি করে, প্রকৃতিকে সঙ্গী করে নিয়ে থাকতেন। তিনি মারা যান ১৯২৫ সালে। সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন কবির এক বছরের বড়, তার ছোটবেলাকার খেলার সাথী, ১৯২৩ সালে মারা যান। এঁকে জোড়াসাঁকোতেই দেখা যেত।

মাঝে মাঝেই কবিও এসে থাকতেন। তখন সমস্ত বাড়ি যেন জেগে উঠত, সভা, নাটক, গান বাজনা চলত। আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতেন কিংবা হয়তো বিদেশে যেতেন।

যেখানেই থাকুন কবি, তাঁকে ঘিরে থাকত যেন মধুর একটা ঐকতান। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যেটাকে তিনি সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর অচল নিষ্ঠা ছিল। যা বিশ্বাস করতেন না, এমন কথা কখনো লিখতেন না, পাঠকদের চমক লাগাবার জন্য কখনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতেন না। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করার জন্য আলোর চাতুরি কিংবা স্টেজের ঝকমকির দরকার হয় না। প্রত্যেকটি নাটক যেন একেকটি ধ্রুব আদর্শকে অবলম্বন করে লেখা, তারই মহিমায় নাটকও মহীয়ান। যেখানে সামাজিক গল্প কিংবা সামাজিক নাটক লিখেছেন, সেখানেও সমাজের মানুষদের কৃত্রিমতাকেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। কোনো দলাদলির মধ্যে কখনো

যান নি, নিজের কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে কলম হাতে ধরেন নি।

ভারি মধুর রসবোধ ছিল কবির, সেটা ছোটবেলা থেকেই নানান ভাবে প্রকাশ পেত। অল্প বয়সে একবার রাঁচি থেকে ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে কবিতায় একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেরকম রসে ভরা চিঠি আর কোনো কিশোর কাউকে কখনো লিখেছে বলে মনে হয় না।

কথাবার্তার নীচে নীচে সর্বদা যেন একটা রসের নদী বইত। চিঠিপত্রে ধরা পড়ে যেত, চোখে মুখে উচ্ছল হয়ে উঠত, ছোট-বড় ভেদ রাখত না, এক মুহূর্তে সবাইকে অন্তরঙ্গ করে ফেলত। ছোট-ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই রসবোধটা ক্রমাগত প্রকাশ পেত। তাঁর এক ছাত্র রোজ লক্ষ্য করত, ক্লাসের মাঝখানে চাকর এসে গেলাস ভরে কিসের একটা শরবতের মতন জিনিস কবিকে দিয়ে যায়, আর তিনি সেটাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলেন। ভারি লোভ লাগত ছেলেটার। এত লোভ লাগত যে, দেখেই বোঝা যেত। একদিন কবি তাকে বললেন, কি রে, খাবি নাকি? চাকর এসে তাকেও এক গেলাস দিয়ে গেল, আর তাকে পায় কে! টেনে এক চুমুক দিয়ে দেখে শরবত তো নয়, চিরতার জল, বিষ তেতো! কিন্তু গেলাসের রসটা তেতো হলেও কবির রসিকতাটুকুর মিষ্টত্ব আজও ঐ ছেলেটার মুখে লেগে রয়েছে।

এই-সব কারণে যারা তাঁকে ঘিরে থাকত, তারা যেন তাঁর আপন জন হয়ে যেত। কি যে দয়ালু ছিলেন, ভাবা যায় না, কত লোকে তাঁর এই দয়ার সুবিধা নিয়ে নিজেদের স্বার্থটুকু গুছিয়ে নিত।

কিন্তু কবিরা যেখানে বাস করেন, সাধারণ-মানুষের চোখই সেখানে পৌঁছয় না, হাত দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কখনো বাঁধতে পারে নি; যেই কাছে এসেছে, তাঁর স্নেহের ভাগ পেয়েছে, আবার যখন চলে গেছে কোনো দাগ রেখে যায় নি।

যে-সব মহানুভব মানুষেরা নিজেদের জীবনের সমস্ত উচ্চাশা কবির কাজে উৎসর্গ করে দিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে দিন কাটিয়েছিলেন, তাঁরা এ কথা জেনেই এসেছিলেন। তাঁদের নাম করে শেষ করা যায় না। কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে যত ভাগ্যবান ছাত্র তাঁদের কাছে শিক্ষা নিয়েছে, তারা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের কথা মনে করবে। কারণ গুরুদেব যে স্বপ্ন দেখতেন, এঁরাই সেই স্বপ্নকে মূর্তি দিতে চেষ্টা করতেন।

সেই প্রথম দিনের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেই ব্রত তাঁরা পালন করতে চেষ্টা করছেন।

কোনো কাজই কখনো শেষ হয় না, পৃথিবীর মাটিতে একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার কাজ তো আরো শক্ত কথা। জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছিলেন—

"শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে ; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্ম-নিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা···এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।"

কোনো মহৎ কাজই সহজে হবার নয়। কবিও সারাজীবন অক্লান্ত ভাবে তাঁর হৃদয়ের আদর্শের জন্য কাজ করে গেছেন। বাইরের লোকে সব সময় তার মূল্য বোঝে নি।

এদিকে দেশে তখন নানান অশান্তি। একবার যে কোনো দেশের দেশাত্মবোধ জাগে, আর সেখানে শান্তি থাকে না, যতদিন না স্বদেশকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই দেশাত্মবোধ জাগাবার কাজে কবির পিতামহ, পিতা, বড় ভাইরা ও কবি নিজে, নিজেদের নিবেদন করেছিলেন।

তাঁদের চেষ্টাতেই দেশী শিল্প, দেশী সাহিত্য, দেশী আচার-ব্যবহার, দেশী উৎসব ও দেশী সংগীত, দেশী ভাষা খানিকটা মর্যাদা পেয়েছিল। বিদেশের চোখে ভারতবর্ষ খানিকটা সম্মানও পেয়েছিল। কিন্তু কবিকে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

১৯১৭ সালে সবুজ পত্রে 'ভাষার কথা' নামে প্রবন্ধ লিখলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখলেন, 'দেশ দেশ নন্দিত করি' মধুর সংগীত রচনা করলেন। 'তোতা কাহিনী' নাম দিয়ে তখনকার শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের মূঢ়তার বিষয় গল্প লিখলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে অবসর নিলেও দেশের মঙ্গল চিন্তা সর্বদাই তাঁর মনের মধ্যে থাকত। যাঁরাই দেশের জন্য এতটুকু চিন্তা করতেন তাঁদের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল, কখনো বন্ধু রূপে, কখনো প্রতিপক্ষ রূপে। কত লোকের সঙ্গে চেনাজানা ছিল কবির, যেন দেশের নাড়ীর উপর সর্বদা আঙুলটি টিপে

রাখতেন, ক্ষীণতম সাড়াটি যাতে ধরতে পারেন। অনেক আগে সিস্টার নিবেদিতা, তার পরে মাদাম এনি বেসান্ত, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, ফজলুল হক, তিলক মহারাজ, মালবীয়জী, এঁদের সঙ্গে নানান দিক থেকে পরিচিত তো ছিলেনই। তার উপর বিলেত থেকে যাঁরা নানান কাজের ভার নিয়ে এদেশে আসতেন, তাঁরা এদেশের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন না বলে, কবি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতেন, তাঁদের হাতে দেশের যেন বেশি ক্ষতি না হয়।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয় দিয়ে। কবির বয়স এখন সাতান্ন বছর। যুদ্ধ তো শেষ হল, এখন এর ফলাফল কিরকম দাঁড়াবে তাই দেখবার জন্য পৃথিবীর লোকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। বিশেষত ভারতবর্ষের নেতারা।

তার কারণ ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও মিত্রপক্ষীয়রা বলেছিলেন, যে জার্মানি অন্যান্য দুর্বল দেশকে গ্রাস করতে চায়, তাই তারা অস্ত্র ধরেছে। মিত্রপক্ষের যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্য হল ছোট আর দুর্বল দেশসমূহকে রক্ষা করা। ইংল্যাণ্ড এরকম আশাও দিল যে, ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষকে নিজের দেশকে শাসন করতে শিখিয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই আশাতেই বুক বেঁধে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধের শেষে কিন্তু অন্যরকম ব্যাপার দেখা গেল। বিলেতে থাকতেন ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেব, যুদ্ধ বিরতির কয়েক মাস আগে তিনি একটা পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠালেন, যার মধ্যে ভারতের শাসনরীতিতে অনেকটা নতুনত্ব এনে দেবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সেটাতে স্বাধীনতার জন্য দেশটাকে তৈরি করা হবে, নাকি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অমিল ঘটাবার ব্যবস্থা হবে, তাই নিয়ে কথা উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে দেশের কিসের মঙ্গল হবে তাই ভেবেছেন। তার উপর এই যুদ্ধে দেশে দেশে বিরোধ হলে তার ফল যে কতখানি মর্মান্তিক হয়, তাও দেখেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে গিয়ে, সেখানকার লোকদের নিজের চোখে দেখে এসেছেন। তাদের নিজেদের মুখে তাদের কথা শুনেছেন, ভারতের কথা তাদের জানিয়েছেন। কত গভীর বন্ধুত্বের ভিত গেঁথে এসেছেন। ক্রমে তাঁর মনের মধ্যে এই

ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠল যে, কোনো ঝগড়াঝাঁটি বা কাগজপত্রে সই করা চুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হবে না। একমাত্র উপায় হল পরস্পরকে চেনা জানা, পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞান—বিদ্যা আদান-প্রদান, পরস্পরকে ভালোবাসা।

তাই যদি হয়, তা হলে পরস্পরের মনকে জানবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে একটা প্রশান্ত পরিবেশে মেলামেশা করা চাই। পরস্পরের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পড়াশুনো করা চাই। শান্তিনিকেতন ছাড়া এ আর কোথায় হওয়া সম্ভব? এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯১৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, পৌষ উৎসবের সময় বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করা হল।

সেই কত বছর আগে স্কুল পালিয়ে, নির্জন দুপুরে বাংলা সাহিত্যের সমুদ্রের তলা হাতড়িয়ে, আকাশের গভীর নীলে পাখি ওড়া দেখে, কুস্তি করে, ঘোড়ায় চড়ে, মুগুর ভেঁজে, গান বাজনায়, থিয়েটারে যাত্রায় ঘোরাঘুরি করে, একদিন যে ছোট বীজটি কবির মানসলোকে শিকড় নামিয়েছিল এখন সে ডালপালা মেলে পাতায় কুঁড়িতে ফুলেতে ফলেতে অপরূপ হয়ে উঠতে লাগল।

দশম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ সময়টি কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। ১৯১৮ সালের মে মাসে তাঁর বড় মেয়ে বেলা দেবী মারা গেলেন। ডিসেম্বর মাসে প্রিয় সহকর্মী অজিতকুমার চক্রবর্তী মারা গেলেন।

একটানা অনেকটা সময় কবি এবার শান্তিনিকেতনে রইলেন পড়াশুনো ও অধ্যাপনা নিয়ে। তার পর একবার দক্ষিণ ভারত ঘুরে এলেন, নানান জায়গায় বক্তৃতাও দিলেন। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা যেন তাঁর সইত না। ঘুরে বেড়ান, বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে নানান দেশের সাহিত্য পড়েন, দেশ দেখেন, লোক চেনেন।

মনের মধ্যে চিরদিন বিদেশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ সমগ্র একটি পরিপূর্ণ দেশীয় বিদ্যার রূপের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। যেখানেই গোঁড়ামি দেখেছেন—প্রতিবাদ করেছেন, আবার যেখানে বিদেশের অনুকরণ

দেখেছেন সেখানেও প্রতিবাদ করেছেন। এবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাব দেখে মনে বড় পীড়া বোধ করেছিলেন। তবু আনন্দও পেয়েছিলেন প্রচুর, আদরও পেয়েছিলেন, দেশের সংস্কৃতির অনেক দৃষ্টান্তও দেখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণ ভারতে সাহেবিয়ানা কমই দেখা যায়।

তবে একটা বিরুদ্ধ দলও ছিল। কবি চিরদিনই গোড়ামির শত্রু। এখানকার ব্রাহ্মণরা বড় গোঁড়া, জাত মানাটা বড়ই সংকীর্ণ। কবি আবার এর আগেই জাত ভেঙে বিবাহ সমর্থন করে এসেছেন, তাই অনেকে তার উপর অসন্তুষ্টও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত পরিষ্কার করে লিখে খবরের কাগজে ছেপে দিয়েছিলেন। কাকেও কখনো ভয় করেন নি।

দু মাস ঘুরে ঘুরে শেষে শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাড়ি ফিরে এলেন। মনের মধ্যে সব সময় বিশ্বভারতীর চিন্তা ঘোরে। কলকাতায় এসে এম্পায়ার থিয়েটারে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলেন। নিজের দেশে এই প্রথম কবি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। যাঁরা বক্তৃতা শুনতে এলেন তাঁদের আবার টিকিট কিনে বক্তৃতা শুনতে হয়েছিল।

শুধু কাজের মধ্যে দিয়ে সব সময় সব কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তাই কবিকে মাঝে মাঝেই নিজের মতামতগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে হত। এর উদ্দেশ্য ছিল সব কথা দেশের লোককে জানানো। নিজের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, নিজেকে সমর্থন করবার জন্য এ-সব প্রবন্ধ লিখতেন না।

একবার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে যেখানে শুধু হাত পেতে বিদ্যা নিতে হয়, সেখানে আমরা ভিখারির সমান। যেখানে প্রতিদানে কিছু দিতে পারি, সেখানে আমাদের নিজেদের মর্যাদাও বজায় থাকে। বিশ্বভারতীতে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

আরো বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল বিদ্যা উদ্ভাবন করা, দ্বিতীয় কাজ বিদ্যা দান করা। তার মানে শুধু পুরনো বিদ্যা বিলোলেই হবে না, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করা দরকার। তার পর বিদ্যাটাকে হতে হবে আমাদের জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ, তাকে আলাদা করে রাখা একটা বিদেশী পোশাকের মতো মনে করলে চলবে না।

এই-সব উদ্দেশ্য চোখের সামনে রেখে বিশ্বভারতীর শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরি হল। দেশী-বিদেশী জ্ঞানদানেরও ব্যবস্থা রইল, আবার গান বাজনা, শিল্প, গো-পালন, কৃষিবিদ্যা, বস্ত্রবোনা—এ-সবের কথাও মনে রাখা হল।

এমনি করে কাজে-কর্মে দিন যাচ্ছিল। লেখাতে যেন একটু ছেদ পড়েছে মনে হত, যদিও লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। এমন সময় কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত ও ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে মর্মাহত ব্যাকুল করে তুলল।

ব্যাপারটাকে একটু আগে থেকে বলতে হয়। মহাযুদ্ধের পর থেকে সকলে শান্তির আশায় পথ চেয়েছিল ; আর ভারতবর্ষ কতখানি নিরাশ হয়েছিল সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।—স্বাধীনতা যে কেউ উপহারের মতো নিয়ে এসে কোলে ফেলে দেবে না, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, এই কথা মনে করে বিপ্লববাদীরা আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজি এগিয়ে এলেন।

গান্ধীজিও কবির মতো শান্তিতে বিশ্বাস করতেন, অহিংসার বাণী বলতেন। রবীন্দ্রনাথও এই সময় এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'আমাদের জন্য একটা বড় পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ।···যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড় হতে পারব তখন আমাদের মার খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড় হবার পথ না-লড়াই করা, না-দরখাস্ত লেখা'—গান্ধীজিও এই কথা ভেবেই সত্যাগ্রহের মন্ত্র দিয়েছিলেন।

বিপ্লববাদীরা অতটা সংযত ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন না, দেশের নানান জায়গায় তখন আন্দোলন চলছিল। আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য দেশবাসীর উপরে অত্যাচার হচ্ছে। তার প্রত্যুত্তরে আরো আন্দোলন। দেশের লোকে ক্ষেপে উঠেছে।

ইংরেজ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, বিপ্লববাদীদের দমন করবার জন্য রৌলট অ্যাক্ট নামে নতুন আইন করলেন। তাতে দেশবাসীদের ন্যায়সংগত অধিকার ও জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

গান্ধীজি তো প্রতিবাদ করবেনই। তাঁর পরামর্শ মতো নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করা স্থির হল। দেশ জুড়ে একটা প্রতিবাদ উঠল। আন্দোলনও বেড়ে গেল। শেষ অবধি পাঞ্জাবে সামরিক

শাসনের ব্যবস্থা হল। প্রায়ই ভারতবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ও শাসন-কর্তাদের মারামারির কথা শোনা যেতে লাগল অথচ কাগজে সঠিক খবর ছাপানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এণ্ড্রুজ সাহেব ও গান্ধীজিকে দিল্লী যেতেই দেওয়া হল না, ফলে পাঞ্জাবে কবে কি হচ্ছে বাকি দেশটা সময় মতো তার খবর পায় না।

প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে হাজার হাজার লোক জালিয়ান-ওয়ালাবাগ উদ্যানে জড়ো হতেন। এ বছরও তাই হলেন, পুলিশ বারণ করল না। কিন্তু শহরের মিলিটারি শাসক জেনারেল ডায়ার, নব্বইজন সৈনিক নিয়ে, নিরস্ত্র অসহায় জনতার উপর গুলি চালালেন। তার ফলে তিনশো উনআশিজন মারা গেলেন, আর কত যে আহত হলেন, তার ঠিক নেই।

খবরটা চেপে রাখবার চেষ্টা হল কিন্তু কেমন করে জানি কয়েক দিনের মধ্যে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। দুঃখে, অপমানে দেশের লোকের বাক্‌রোধ হবার জোগাড়। ভাষা এল ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি তাঁর 'স্যার' উপাধি ঘৃণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে একখানি অবিস্মরণীয় চিঠিতে অত্যাচারী শাসনকর্তার হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করাও যে ভারতবাসীর পক্ষে অসম্মান, এই কথা লিখে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। সমস্ত দেশের লোক ধন্য ধন্য করেছিল আর ইংরেজ সরকার ভারি ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কাজে মন দিলেন। সেখানকার কাজের প্রসার যেমন বেড়েছে, দায়িত্বও বেড়েছে। কবি দেশের প্রাচীন ধর্মকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, আধুনিক শিক্ষার আলোকেও তার চাইতে কম করেন না। শান্তিনিকেতনে একটি ছোট ছাপাখানা হল, বিজলিবাতির ব্যবস্থা হল। ছোট আশ্রমের মুষ্টিমেয় বাসিন্দার জন্য সেই যথেষ্ট। অধ্যাপকদের সপরিবারে বাস করার জন্য 'গুরুপল্লী' নাম দিয়ে এক সারি খড়ের চালের কুটির তৈরি হল।

রবীন্দ্রনাথের মনে এই সময় কেমন একটা শূন্যতার পর্ব এসেছিল, শূন্যতা এই দিক দিয়ে যে নতুন ধরনের কিছু লিখলেন না। কবছর ধরে পুরনো কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, 'রাজা' নাটক ভেঙে 'অরূপ-রতন' লিখলেন, পুরনো ভাব নিয়ে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় 'কথিকা' লিখলেন, পরে যাকে 'লিপিকা' নামে সবাই জানে। এরই ভাষা থেকে

পরে কবি গদ্যছন্দে কবিতা লেখার প্রেরণা পান। আর লিখলেন শত শত গান, তা ছাড়া ছেলেদের পড়বার জন্য অনেক বই।

বিষয়-আশয়ও খানিকটা না দেখলে চলে না। কবির প্রতিভা এতই বলিষ্ঠ যে, তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড কার্যকারী দিক মাঝে মাঝে সকলকে অবাক করে দিত।

মহর্ষি মারা যাবার সময় জমিদারি দেখাশোনার যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, তাতে করে জমিদারির ভার পড়েছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপর, বাকিরা পেতেন মাসহারা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্বটুকু অপর দুজনকে দিয়ে দিলেন। কাজেই জমিদারি দেখাশুনো করতেন রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে কবিরই ছিল দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি ; সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্বান কিন্তু বড় খেয়ালী। কবি ক্রমশ লক্ষ্য করতে লাগলেন যে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির ততটা ধার ধারেন না, কিন্তু টাকা দিয়ে ব্যবসা করার সখ আছে, ফট্‌কার বাজারে টাকা খেলান। তাই দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে কবি শেষপর্যন্ত জমিদারি ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। পরে দেখা গেল যা আশঙ্কা করেছিলেন ঠিক তাই হল। সুরেন্দ্রনাথের অংশের কিছুই আর বাকি থাকল না। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধির নিন্দা করতেন। তাঁরা বলতেন, সত্যিকারের কবিরা পার্থিব বিষয়ের ধার ধারেন না। এ কথার কোনোই মূল্য নেই, কারণ যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে কবি হোক বা যাই হোক, সেই বুদ্ধির আলোতেই সে জগৎ সংসারকে দেখবে। বোকামি কখনো প্রশংসনীয় হতে পারে না।

এই-সব নানান সাংসারিক চিন্তা কবির জীবনে এসে ভিড় করত, কিন্তু তাঁর প্রবল প্রতিভা কখনো কোনো বাধা মানে নি।

ওদিকে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়ে গেছে, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য বিদ্যাভবন খোলা হয়েছে, পরে সেখানে তিব্বতী ও চীনা ভাষা শেখারও ব্যবস্থা হল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই বিভাগের ভার নিলেন।

পুজোর ছুটিতে কবি গেলেন আসামে হাওয়া বদল করতে। ফিরে এসে মণিপুরী নাচ শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। আসামী মহিলাদের ঘরে বসে তাঁতে মুগা ও রেশম বোনা দেখে ভারি খুশি হয়ে শান্তি-

নিকেতনেও যাতে ঐরকম হয় তার চেষ্টা করলেন। দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

গান্ধীজি এই সময় নিমন্ত্রণ করে কবিকে গুজরাটে নিয়ে গেলেন। সবরমতী আশ্রমে কবি একদিন থেকে এলেন। তার পর ওদিকে নানান জায়গায় ঘুরে ১৯২০ সালের মে মাসে কলকাতায় এলেন।

এই যে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এর অনেকগুলি কারণ ছিল। একে তো ছিল অন্তরের তাগিদ। বেছে বেছে বাউলদের দেশে আশ্রম ফেঁদেছেন, সেখানকার হাওয়াতে যেন কি একটা ছিল। লোকে বলত ঐ শুকনো লাল মাটির দেশে যারা থাকে, তাদের ভবঘুরে হয়ে বাউলদের মতো গান গেয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কবির বেলায় কতকটা তাই হয়েছিল মনে হয়।

তা ছাড়া আরেকটা কারণও ছিল। আশ্রমের চিরকাল টাকা পয়সার অভাব। এই অভাব মেটাবার ভার কবি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেলে দেশের লোকে তাঁর আশ্রমের কথা জানতে পারবে, হয়তো ছাত্র পাঠাবে, সহযোগিতা করবে, আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। এবার যেমন লিম্বডির রাজা দশহাজার টাকা দান করলেন। নিজের জন্য কিছুই চাইতেন না রবীন্দ্রনাথ। এত কাজের মধ্যেও নিজের চিঠিপত্র ইত্যাদি নিজেই লিখতেন। কেউ চিঠি লিখলে তার উত্তর না দেওয়াকে তিনি সৌজন্যের অভাব মনে করতেন, ফলে কাজ বেড়ে যেত, সময় কুলিয়ে ওঠা দায় মনে হত। তবুও বহুদিন পর্যন্ত অর্থাভাবের জন্য চিঠিপত্র ইত্যাদির ভার নেবার লোক রাখতে পারেন নি।

সে বছর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার বিলেতে গেলেন। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে শিল্পী রথেন্‌স্টাইন, নিকোলাস রোরিক, সাহিত্যিক বার্নার্ড শ প্রমুখের সঙ্গে দেখা হল। পিয়ার্সনের সঙ্গেও তিন বছর ছাড়াছাড়ির পর আবার দেখা হল। আগা খাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জাহাজেই। বিখ্যাত সামরিক নেতা কর্নেল লরেন্সের সঙ্গে দেখা হল, অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক, কবি লরেন্স বিনিয়ন—বিলেতের বাছা বাছা সব গুণীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কপালটা ছিল ভালো। তাঁর জীবনকালে পৃথিবীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের

সঙ্গে তাঁর চেনাজানা হয়েছিল, তা ছাড়া এমন বহুজনার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল, পরে যাঁরা নানান ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে কবি ফ্রান্সে গেলেন, সেখানেও কত জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে পরিচয় হল—সুপণ্ডিত সিলভাঁ লেভি, যিনি পরে এদেশে এসে কাজ করেছিলেন, কবি কঁটেস মোয়াই ইত্যাদি। ফ্রান্স থেকে হল্যাণ্ডে তার পর বেলজিয়াম, আবার ফ্রান্স।

কবির বড় ইচ্ছা আমেরিকা যাবার, কিন্তু সেখানে খানিকটা আগ্রহের অভাব দেখা গেল; এমন স্পষ্ট-বক্তা কবির উপর যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন সে তো জানা কথা। গেলেন তবু আমেরিকা, সঙ্গে পিয়ার্সন সাহেব। আমেরিকাতে নানান জায়গায় বক্তৃতা দিলেও বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলা হল না। তার কারণ কবি ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে থাকেন, তার থেকে তাঁদের কারো কারো ধারণা হয়েছিল যে জার্মানির প্রতি তাঁর নিশ্চয় খুব সহানুভূতি আছে। এঁরা দলে ভারী, এঁদের ক্ষমতাও ছিল, কাজেই আমেরিকাতে ভারতের প্রতি সহানুভূতির এবার অভাব দেখা গেল। কবি কিন্তু তাদের খুশি করবার জন্য নিজেকে ছোট করলেন না। আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন, বিখ্যাত লেখক রোঁম্যা রোলাঁর সঙ্গে আলাপ হল। প্যারিসের একজন ধনী ভারতীয় মুক্তার ব্যবসায়ী বিশ্বভারতীকে তাঁর চমৎকার পুস্তক-সংগ্রহ দান করলেন। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের নানান জায়গায় ঘুরে বক্তৃতা দিলেন, স্ট্রাসবুর্গ, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সুইডেনের প্রাচীন উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভিয়েনাতে, প্রাহাতে। এইভাবে ন-দশ মাস বিদেশে ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় ভারতের শান্তির ও সাম্যের বাণী পৌঁছে দিয়ে, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে এলেন।

দেশে ফিরে এসে দেখেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন চলেছে, তার মূলমন্ত্র হল ইংরেজ শাসন-কর্তাদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করা হবে না। এই অসহযোগ আন্দোলনের মেলা ডালপালা দেখা দিয়েছে ততদিনে। গান্ধীজি এর মধ্যে একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা স্থির করেছেন আর ছাত্রদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পাঠানো হবে না। কলকাতার কলেজ ছেড়ে দিয়ে একদল যুবক সুরুলে গিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের কাজই ভালো তাঁদের মতে।

কবি বিদেশেই অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুনে এসেছেন, এ বিষয় চিন্তা করবারও অনেক সময় পেয়েছেন। কোনোদিনও কবি ভয়ে বা লজ্জায়, বা লাভের আশায়, বা বন্ধুত্বের খাতিরে, নিজে যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন তাকে খর্ব করেন নি। এবারও করলেন না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন না। এর মধ্যে যে বিদ্বেষের বীজ লুকিয়ে অছে, তাই থেকে যে কি নিদারুণ অশান্তির ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হবে, বার বার সেই বিষয়ে দেশবাসীদের সাবধান করে দিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসহযোগ আন্দোলন যে কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে সে কথা সকলকে মনে করিয়ে দিলেন। এর থেকে যে কবির জীবনের ব্রত দেশে দেশে যাতে মিলন হয়, পৃথিবী জুড়ে যাতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে অস্বীকার করা হবে। বন্ধুরা অনেকে অসন্তুষ্ট হলেন। গান্ধীজি নিজে এ-সব ব্যক্তিগত মতভেদের উপরে থাকতেন, তিনি কবির এই সতর্কতা দেখে তাঁর নাম দিলেন 'মহা-প্রতিহারী'। এই নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন ভেঙে যায় নি। এর পরে গান্ধীজি জোড়াসাঁকোতে এসে কবি আর এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দেশের অবস্থা নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের কাজে কবি আবার ডুবে গেলেন। পাঁচ বছর পরে

পিয়ার্সন সাহেব আবার ফিরে এসেছেন। এল্‌মহার্স্ট নামে একজন ধনী ইংরেজ বন্ধু এসেছেন। ইনি খালি হাতেও আসে নি, তাঁর ভাবী স্ত্রীর কাছ থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশহাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করে এসেছেন। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভিও এসেছেন শিক্ষকতা করতে।

দু বছর আগে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পরিকল্পনা হয়েছিল, কিছু কাজও আরম্ভ হয়েছিল। এবার নিয়মাবলী তৈরি করে প্রকাশ্য সভায় উদ্বোধন হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ হলেন যুগ্ম-সচিব। কবি নিজে অকাতরে দান করলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িঘর, পুস্তকাগার, জমিজমা, বাংলা বইয়ের স্বত্ব আর অনেক টাকা।

কবির এখন বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে। কাজ অনেক হয়েছে, নতুন লেখাও হয়েছে কিছু কিছু, যেমন 'মুক্তধারা' নাটক। তা ছাড়া শান্তি-নিকেতন থেকে কিছুদূরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। অনেকে বলেন, এই হল বিশ্বভারতীর আসল কাজ। দেশের জাতীয় জীবনকে যদি নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, তা হলে এখানেই তা সম্ভব, শান্তিনিকেতনে ততটা নয়। সেখানকার ব্যাপার অনেকটা সৌখিন, পড়াশুনো, গান-বাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনে গেলে দেশের মাটির উপর পা নামিয়ে রাখতে হয়, তা নইলে দেশের আসল সেবা করা হয় না।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ শাসনকর্তারা গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিলেন। কবির সে কি দুঃখ। 'মুক্তধারা' অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করছিলেন, সব বন্ধ করে দিলেন।

তার পর আবার এল একটা ঘুরে বেড়াবার পালা। এবার দেশের মধ্যেই নানান জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এখন লোকে তাঁকে খানিকটা বুঝতে শিখেছে। দেশেও যেমন, বিদেশেও তেমন, মানুষের মনে যেন কবি একটুখানি রঙ দিতে পেরেছেন। আর তাঁর শান্তির মন্ত্র নিয়ে লোকে তেমন বিদ্রূপ করে না। এই যে শান্তির একমাত্র পথ সে কথা অনেকে মেনে নিয়েছে। বিদেশেও তাঁকে শান্তির দূত নামে লোকে জানে। ভিন্নকে নিয়ে এসে এক করার মন্ত্র শেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোকে শান্তিনিকেতনে আসে, চিঠিপত্র লেখে। যুদ্ধক্ষত মৃতপ্রায় পৃথিবীতে যেন একটু একটু প্রাণের সঞ্চার দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

তো আসলে রাষ্ট্রীয় দূত বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দূত নন, তিনি মর্মে মর্মে কবি। পার্থিব কাজ কর্ম যাই করুন-না কেন, অন্তর থেকে যে মুহূর্তে তাগাদা আসে, অমনি কণ্ঠ গান গেয়ে ওঠে।

দেশে এমন নিদারুণ অশান্তির সময় যাচ্ছে, তার মধ্যে ঐ বছরই প্রথম বর্ষামঙ্গল উৎসবের অনুষ্ঠান হল। অনেকে কবির এই খেয়ালের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে পারলেন না। এই দুঃখের দিনে গান-বাজনার উৎসব করতে কি করে যে কবির মন চাইল, অনেক অন্তরঙ্গ আত্মীয়-বন্ধুরাও বুঝলেন না। কবিদের যে অন্তর্লোকে বাস, সেখানে এঁদের কারো পদার্পণ করার ক্ষমতা নেই, কি করেই-বা বুঝবেন? এ-সব উৎসব অনুষ্ঠান দিয়েই যে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির আরাধনা করতেন, তাই-বা কে বুঝত?

রবীন্দ্রনাথ সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালন করে যেতেন, কিন্তু নিজে জানতেন ও-সব তাঁর আসল কাজ নয়, এমন-কি, এ কথাও বলেছেন—এ আমার কাজ নয়, এ হল আমার কাজ-কাজ খেলা। তবে খেলাই হোক আর যাই হোক, সে কাজ তার ষোলো-আনা পাওনার জায়গায় আঠারো-আনাই আদায় করে নিত।

আশ্রমের কথাই ধরা যাক-না। কেমন করে কবির দিন কাটত সেখানে? সকালে উঠে পড়ানো, দুপুরে খানিকটা লেখাপড়া, তার পর আবার পড়ানো, বিকেলে মেলা অতিথি-অভ্যাগতদের আগমন হত; প্রায়ই এটা ওটা পড়ে শোনাতেন, নিজের লেখা থেকে কিংবা বিশ্বসাহিত্য থেকে, তার পর ছেলেদের ঘরে গিয়ে তাদের খেলায় যোগ দিতেন। তার পর সবাই চলে গেলে গভীর রাত পর্যন্ত আবার লেখাপড়া।

এর মধ্যে আবার আশ্রমের কারো অসুখবিসুখ হলে তাকে গিয়ে দেখে আসতেন। মাঝে মাঝে নিজে ওষুধ দিতেন, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে অনেক সময় নাকি ভালো ওষুধই দিতেন। কিন্তু এ-সবেতে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে উঠত। এই সময় একজনকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এবার দেশে এসে অবধি আমার শান্তি নেই, বিরাম নেই! আজকাল তাই কেবলই ইচ্ছা করে চার দিকের বেড়া সমস্ত ভেঙে চুরে ফেলে সেই আমার অল্প-বয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই।'

রাতে এরকম লিখতেন, আবার পরদিন ভোরে উঠে ছাত্রদের নিয়ে জামগাছের তলায় হয়তো বসে যেতেন। আসলে যাদের মধ্যে প্রতিভা

থাকে তারা শান্তি পায় না কখনো, তাদের প্রতিভাই তাদের চিরদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তারা সর্বদা এমন একটা নিখুঁত জগতের স্বপ্নে বিভোর থাকে যে, এই মাটির পৃথিবীর এক কোণে তিষ্ঠনো তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের হাতে পায়ে চোখে মনে হৃদয়ে নিরন্তর একটা যাযাবর পাখি যেন ডানা ঝাপটায়।

এক জায়গায় বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এক বাড়িতে পর্যন্ত বেশিদিন থাকতে পারতেন না। ঘর বদলাতেন, ঘরের আসবাব পালটাতেন। ছোটবেলা যে জোড়াসাঁকোতে জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, সর্বদাই তাকে ছেড়ে যেতে ব্যস্ত থাকতেন।

তাই বলে শিলাইদাতেও টিকতে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে বাসা বাঁধলেন, কিন্তু নিজেই বলতেন যে সেখানেও থেকে থেকে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠত, তখন আর সমুদ্র পাড়ি না দিয়ে উপায় থাকত না।

আবার বিদেশে গিয়েই দেশে ফেরার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠত। চিঠিপত্র পড়ে বোঝা যেত যে, আশ্রমের ছবিটি তার সমস্ত ছোটখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে সদাই তাঁর চোখের সামনে জেগে থাকত। সেখানকার প্রিয়জনদের চিঠি লিখতেন, ঐ লতাগাছটার নীচে বাঁশের ঝাঁঝরি করে দে, নইলে ও পড়ে যাবে ; সেই কোণটাতে নানারকম গাছপালা এলোপাতাড়ি লাগিয়ে দে, ওখানে একটা বন হয়ে উঠুক—এমনি ধারা কত কি !

আবার আশ্রমের মধ্যেই একই বাড়িতে থাকাও সইত না। গোড়াতে বাড়ি বদলানোর কোনো উপায় ছিল না, বাড়িই ছিল না বিশেষ, তার উপর টাকাও হাতে ছিল না। প্রথমে এসে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দোতলা বাড়িটির উপরতলায় থাকতেন। তার পর 'দেহলী' বলে একটা ছোট দোতলা বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। বাড়িটি শালবীথিকার মাথায়, ছেলেদের যাওয়া-আসার পথেই। খেলাধুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে তারা শুনতে পেত কে যেন গলা খাঁকারি দিচ্ছে, অমনি বুঝতে পারত গুরুদেব তাঁর দোতলার ঘরে বসে লিখছেন।

এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আর সে বাড়িতে ওঠেন নি। এখন যাকে উত্তরায়ণ বলা হয়, তার মধ্যে বিশাল একটা অট্টালিকা আছে, তারই পাশে কোণার্ক বলে একটা একতলা বাড়ি আছে। তখন এ-সব কিছুই ছিল না। এসে দেখেন যেখানে কোণার্ক সেখানে তাঁর জন্য দুটি মাটির ঘর করা হয়েছে। খোয়া দিয়ে তার মেঝে হয়েছে,

দরমার বেড়া। এখন আর ও ঘরের কিছুই বাকি নেই।

আরো বাড়ি হল আশ্রমের, এখন যেখানে শিশুবিভাগ, সেই পাকা বাড়িটি হল। গুরুদেবই স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকেন না, আশ্রমই-বা থাকে কি করে?

এমনি করে দুটো-চারটে বাড়ি তৈরি হয়, আশ্রম আরো বড় হয়। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথও মারা গেলেন। একে একে মাথার উপরে যাঁরা স্নেহচ্ছায়া দিয়েছিলেন, তাঁরা বিদায় নিতে লাগলেন। কিন্তু কাজ তো আর তাই বলে বন্ধ থাকতে পারে না। ঐ বছরেই বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি নাম দিয়ে বিশ্বভারতীর নিজস্ব পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হল। বিশ্বভারতীর কণ্ঠে ভাষা চাই, নইলে পাঁচজনে তার বিষয় জানবে শুনবে কি করে? ইংরেজি ভাষায় ছাপা হয় এ কাগজ, মাতৃভাষায় কুলিয়ে ওঠে না বলে নয়। বাংলা ভাষা ক'জনাই-বা জানে? বিশ্বভারতীর কথা জানাতে হলে যাঁরা অবাঙালি তাঁদেরই তো আগে জানাতে হয়, তা হলে ইংরেজি ভাষাতেই কাগজ ছাপতে হয়।

কিন্তু শুধু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য জানিয়ে কবিকে নিশ্চিন্ত থাকতে হয় নি। বিশ্বভারতীর বিরাট খরচ, তার টাকা সংগ্রহ করতে হত। নিজেই হেসে বলতেন, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়েছি। কিন্তু এ ঝুলি যে কবির মনে কত পীড়া দিত মাঝে মাঝে সে কথাও প্রকাশ না করে পারতেন না। একবার লিখেছিলেন, 'আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হাতে নিয়ে বললে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্তও নয় তৃপ্তিকরও নয়।...জীবনের পূর্বাহ্ন সোনার স্বপ্ন নিয়ে অতীত হয়েচে, জীবনের সায়াহ্ন সোনার সন্ধান নিয়ে তিতো হয়ে উঠল।'

টিকিট বিক্রি করে, বক্তৃতা দিয়ে টাকা তোলা হত তখন। নাটক অভিনয় মাঝে মাঝে হত, বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে কিংবা কলকাতায়। শান্তিনিকেতনে অবিশ্যি টাকা নেওয়া হত না। পরে নানান জায়গায় অভিনয়, নৃত্যনাট্য, গানের আসর করে টাকা তোলা হত। অনেক সময় শুভাকাঙ্ক্ষীরা অর্থ দানও করতেন। কবির পক্ষে এ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যে কত কষ্টের, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তার উপরে মনে মনে মাঝে মাঝে বড়ই ভাবনা হত এ ভাবে বিশ্বভারতীর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি না। এ বিষয়ে এই

কথা লিখেছিলেন, 'মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল।'

১৯২২ সালের শেষের দিকে এইরকম আরেকবার বেরিয়ে পড়লেন, দক্ষিণ ভারতে, পশ্চিম ভারতে, সিংহলে। দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার আর কিছু টাকা সংগ্রহ হল বটে কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে আরেকবার তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হল। এবারও সবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি কারাগারে, সবরমতী অন্ধকার। কিন্তু আশায় বুক বেঁধে গান্ধীজির শিষ্যরা কেমন কাজ করে চলেছেন দেখে কবি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজ-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কলকাতার 'বিচিত্রা'ভবনে ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা হল। সেপ্টেম্বরে একটা দুঃসংবাদ এল, ইতালিতে রেল দুর্ঘটনায় পিয়ার্সন সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নামে শান্তিনিকেতনে একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হল। এমনি করে ভালোয় মন্দয় বছরটা শেষ হল।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরের বছর ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার চীন জাপান ঘুরে এলেন। অবিশ্যি এতদিন তিনি একটানা শান্তিনিকেতনেই ছিলেন মনে করলে ভুল হবে, দেশের মধ্যেই এদিকে-ওদিকে হাওয়া বদল করেছেন। লিখেছেনও কিছু কিছু। বসন্তোৎসবের মিষ্টি গাছপালার গানগুলি যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হল, বাষট্টির উপর কবির বয়স তখন। ঐ বয়সে যুবক জয়সিংহ সেজে সে যে কি সুন্দর অভিনয় করলেন, তা ভুলবার নয়।

বিশ্বভারতীর কাজের আরম্ভটি বড় শুভ হয়েছে দেখা গেল। দেশ-বিদেশ থেকে কত মনীষী পণ্ডিত এলেন কাজ করতে, চিঠি লিখলেন, বই পাঠালেন। চেক মনীষী লেস্‌লি, জর্মান পণ্ডিত উইন্‌টারনিট্‌স্‌, ফরাসী বেনোয়ার নাম না করলে অন্যায় হয়। আরো অনেকে এসেছিলেন নানান দেশ থেকে। বিশ্বভারতীর দু বছর কেটে গেছে।

এবারকার বিদেশ-যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল। একজন মহানুভব ভারতবাসী খরচপত্রের জন্য টাকা দান করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে কবির সঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পী নন্দলাল বসু, ও এল্মহার্স্ট গেলেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগও সহযাত্রী হলেন। এতে বিদেশের লোকেরা ভারতের আরেকটু বেশি পরিচয়ের সুযোগ পেল। কবির মনের সেই তো বাসনা।

চীন দেশেই এবার কবির জন্মদিনের উৎসব হয়েছিল। ওখানে কবির বইয়ের নামে 'দি ক্রেসেণ্ট মুন' বলে একটা সভা ছিল, তারাই সব আয়োজন করেছিলেন। ইংরেজিতে সম্বর্ধনা হল, রবীন্দ্রনাথকে ওঁরা চু-চেন-তান উপাধি দিলেন, তার মানে হল 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত'। এই নামটা একটা মূল্যবান পাথরে খোদাই করে ওঁর হাতে দেওয়া হল। উৎসবে ওদেশের জ্ঞানীগুণীরা অনেকে এসেছিলেন, শেষে কবিকে নানান উপহার দেওয়া হয়েছিল। বহুকাল পরে এ কথা মনে করে কবি লিখেছিলেন,

> 'একদা গিয়েছি চীন দেশে,
> অচেনা যাহারা
> ললাটে দিয়েছে চিহ্ন, 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।...
> ধরিনু চীনের নাম, পরিনু চীনের বেশবাস।
> এ কথা বুঝিনু মনে,
> যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।'

এইজন্যই কবির বারে বারে বিদেশ যাওয়া, যাতে তাঁর জীবনের কাজ, জগতে মৈত্রী আনা, সেই কাজ এক ধরনের অমরত্ব পায়। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এতদিন তাঁর রচনার অনুবাদ বেরিয়ে গেছে।

চীনের তখন নব জাগরণ, কবি তাই দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন, আবার ওদের য়ুরোপ-প্রীতির নিন্দাও করেছিলেন।

কবির এই ভ্রমণের একটা ফল হল, এশিয়ার অনেকগুলি দেশের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব স্থাপিত হল; এশিয়াটিক এসোসিয়েশন বলে একটা সংঘ গড়ে উঠল। তাতে আমেরিকা কিন্তু খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে তাদের তেমন সদ্ভাব এমনিতেই নেই, আবার একজন এশিয়ার কবির প্রেরণায় এরা যদি দল বেঁধে বলীয়ান হয়ে ওঠে তবে তো মুশকিল!

ভারতে চীনা ভাষা, চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর হয়, এই ছিল কবির মনের সাধ। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই শান্তিনিকেতনে চীনা শিক্ষা এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। অনেক চীনা ভাষায় পণ্ডিত অধ্যাপক সেখানে কাজ করেছেন। আমাদের দেশেরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতী চীনা ভাষা ও সাহিত্যে কম পাণ্ডিত্য অর্জন করেন নি।

দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু মাস থাকলেন, তার পর আবার ঝোলা নিয়ে পাড়ি দিলেন। এবার গেলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। এই দুই মাসের মধ্যে 'রক্তকরবী' নাটক লেখা হল। এই নাটকে যন্ত্রকে বড় বেশি ভক্তি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। যন্ত্র দিয়ে যত কাজই করা যাক-না কেন, প্রাণের ও সৌন্দর্যের কোমল স্পর্শ না থাকলে সবই ব্যর্থ হয়, এই কথাই সম্ভবত কবি বলতে চেয়েছেন। কথাটা অবিশ্যি তাঁর মনে নতুন করে উদয় হয় নি। 'মুক্তধারা' যখন লিখেছিলেন তখনো এই কথাই মনে ছিল, তবে এবার চীনে জাপানে গিয়ে সেখানকার নব জাগরণের মধ্যে যেন বড় বেশি যন্ত্রে বিশ্বাস দেখেছিলেন, হয়তো তাই থেকেই এই নাটিকার জন্ম।

যাই হোক, গেলেন কবি দক্ষিণ আমেরিকাতে, সঙ্গে গেলেন রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও তাঁদের তিন বছরের পালিতা কন্যা নন্দিনী, যার বিষয় কবি লিখেছিলেন—'তিন বছরের প্রিয়া'। আর ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষত্বই হল এখানে ইংরেজ ও জার্মান ইত্যাদি দেশের কোনো প্রভাব নেই, আছে স্পেনের। এখানে এককালে স্পেনের খুব বড় উপনিবেশ ছিল। এখানকার আচার-ব্যবহারই অন্য রকমের। এবার যাবার আগে কেন জানি কবির মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি বাঙালি মেয়ে ওঁকে যাত্রার দিন-পঞ্জিকা রাখতে বলেছিল, সেই থেকে 'যাত্রী' লেখা হল।

প্যারিসে রথীন্দ্রনাথরা থেকে গেলেন। প্রতিমা দেবী ইউরোপীয় মৃৎশিল্প শিখতে আরম্ভ করলেন, পরে শ্রীনিকেতনে এই বিদ্যা কাজে লেগেছিল। ওদিকে কবি আর এল্মহার্স্ট সাহেব দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করলেন। কবির শরীর এবার খুব ভালো ছিল না। তবু জাহাজে বসে কাব্যরচনা চলতে লাগল। পথও অনেকখানি, তাই এই তিন সপ্তাহের পথে 'পূরবী'র তেইশখানি অপূর্ব কবিতা লেখা হয়ে গেল।

ঐ যে দিন-পঞ্জিকাটি শুরু হয়েছিল, সেটি কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছে বন্ধ হয়ে গেল। আর গদ্য ছুঁলেন না, সেই ফেরার পথের আগে।

পথে এতই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, সে সময় যে-সব কবিতা লিখলেন, তার মধ্যেও তার ছাপ পড়ে গেল। কবির মন যেন বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ। এ সেই নৈঃসঙ্গ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের চিরজীবনের যে সাথী হয়ে থাকে, কারণ তাঁদের চিন্তা-রাজ্যে সাধারণ মানুষের পৌঁছবার সাধ্য নেই। সঙ্গী সেখানে থাকে শুধু কবি তাঁর জীবনে যেটুকুকে সত্য বলে জেনেছেন। এই নৈঃসঙ্গের কথা মনে করেই 'যাত্রী'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

জাহাজ থেকে নামলেন তাঁরা তিন সপ্তাহ পরে, আর্জেনটাইন দেশের প্রধান নগর বুয়েনস এয়ার্সে; গিয়ে একটা হোটেলে উঠলেন। শরীর এত খারাপ যে তখন আর পেরুর দিকে রওনা হওয়া গেল না। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারাও আদর-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। একটা বাগান বাড়িতে কবির থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন।

সেখানে ভিক্টোরিয়া দ্য-এস্ট্রাডা নামে একজন মহীয়সী নারীর সেবা-যত্নে কবি আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। ভিক্টোরিয়ার নাম দিলেন 'বিজয়া'—'পূরবী' বইখানি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকেই উৎসর্গ করলেন। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনেও প্রফুল্লতা দেখা দিল। কত যে মধুর কবিতা রচনা করলেন তার ঠিক নেই।

শরীর ভালো হলে দু-একটা উৎসবে যোগ দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু পেরু যাওয়ার পথে বড় অসুবিধা, সেখানে যাওয়া হল না। অবশেষে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আবার য়ুরোপে যাত্রা করলেন। শোনা যায় ভিক্টোরিয়া কবিকে একটি আরাম-কেদারা উপহার দিয়েছিলেন, সে আর কেবিনের সরু দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢোকে না। শেষটা কেবিনের দরজার কব্জা খুলে ফেলে চেয়ারটা ঢোকানো হল। সে কেদারা এখনো শান্তিনিকেতনে আছে।

ফেরার পথে কবি ইতালিতে নেমে মুসোলিনীর সঙ্গে আলাপ করলেন। মুসোলিনী তখন ওখানকার একরকম কর্তা বলা চলে। দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার নানান কথা তাঁর মুখে। তাঁর বিষয়ে শুনে কবি বড় খুশি হয়েছিলেন, মুসোলিনীর ভারি প্রশংসাও

করেছিলেন। তাতে আবার মুসোলিনীর শত্রুরা চটে গিয়েছিল।

পরে কিন্তু কবি বুঝেছিলেন যে, মুসোলিনীর সহানুভূতিশূন্য ও উদ্ধত মতবাদ অন্য কোনো লোকের কিংবা জাতির কোনো অধিকারই মানে না। মুসোলিনী সম্বন্ধে কবির তখন মত বদলায়, আর চিরদিনের সত্যের পূজারী তখুনি সে কথাও প্রকাশ করেন। তাতে ইতালীয়রা গেল চটে। শুধু মুসোলিনী নিজে বিশেষ কিছু বললেন না।

এদিকে শরীরটা আবার মন্দের দিকে গেল। অবশেষে ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরে এলেন। তখন শান্তিনিকেতনে মহাসমারোহে বসন্তকাল এসেছে। কবির কণ্ঠেও গান এল। 'বসন্ত উৎসব' করার আয়োজন হল আমবাগানে, কিন্তু অকালে এমনি ঝড়বৃষ্টি এল যে উৎসব হল কলাভবনের নতুন বাড়িতে।

দেশে এলেই নানান ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণমাত্রায় চলেছে, ইংরেজ সরকার দমন-নীতি ধরেছেন; সামান্য কারণে, বিনা বিচারে যুবকদের সব ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গান্ধীজি এতদিনে ছাড়া পেয়ে গেছেন, তিনি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে চরকা আন্দোলন শুরু করছেন।

গান্ধীজির মতে চরকাই দেশের একমাত্র ভরসা, যন্ত্রপাতি ত্যাগ করে ঘরে ঘরে চরকা বসুক। কবিও যন্ত্র দেবতাকে বেশি ভক্তি করেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলত, প্রয়োজন-মতো যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করলে দেশের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। সেবার যখন দলে দলে দেশ-সেবক যুবকরা পড়াশুনো ছেড়ে দেশের কাজে লেগেছিল, কবি তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, বিদ্যা ত্যাগ করে দেশ-সেবা হয় না। এবারও তেমনি মুক্তকণ্ঠে নিজের মত জানালেন। অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে নানান অযথা নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে যতই তর্ক-বিতর্ক হোক-না কেন, গান্ধীজি কখনো তাঁকে ভুল বোঝেন নি। ঐ বছরই মে মাসে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের আরো দুজন এবার চলে গেলেন; বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মারা গেলেন আর তার অল্পকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়ষট্টি।

এই সময় কবিতা রচনা হয়েছিল অনেক, গদ্যে লেখা কম। তবে পুরনো লেখা নতুন করে কিছু লিখেছিলেন, গল্পকে নাটক করেছিলেন।

'গোড়ায় গলদ' হল 'শেষরক্ষা', 'কর্মফল' হল 'শোধ-বোধ', 'শেষের রাত্রি' হল 'গৃহপ্রবেশ'। বার বার দেখা যায় কবির জীবনে কখনো বহু নতুন কবিতা লেখা হচ্ছে, গদ্যের অভাব ; কখনো-বা ঠিক তার উলটো।

সারা বছর ধরে শান্তিনিকেতনে যেন ঋতুরাজকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করেছেন কবি। বসন্তোৎসব হল, বৃক্ষরোপণ হল, বর্ষামঙ্গল হল। তার মধ্যে আবার একবার লক্ষ্ণৌ হয়ে পূর্ববঙ্গে গেলেন। ঢাকায় অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল, দেশের লোকের কাছে মনের কথাটি বলবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। রাজনীতির দলাদলি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, নিজেরও অপর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সাম্যে ও মৈত্রীতে বিশ্বাস করেন, জনসাধারণের মনের কাছে পৌঁছতে চান ; সাধারণ লোকে যে তাঁর কথা সাদরে গ্রহণ করবে এতে আর আশ্চর্য কি ?

ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন, সেখানকার লোকদেরও কবিকে দেখবার জন্য সে কি ব্যগ্রতা! ঢাকাতেও যেমন, এখানেও তেমনি মেয়েদের কাছে তাঁর মনের এই কথা বলেছিলেন, যে অতিথি-সেবাই হল মেয়েদের কাজ। এতকাল মেয়েরা ঘরের অতিথির সেবা করে এসেছে, এবার তেমনি করে বিশ্বের অতিথিদের সেবাতেও যোগ দিক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুমিল্লাতে নমঃশূদ্রদের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে মনের মধ্যে সম্ভবত আরেকটা গাছের বীজ অঙ্কুরিত হল। লোকে মাঝে মাঝে নিন্দা করে বলত, রবি ঠাকুর হল গিয়ে সৌখিন কবি, সেজেগুজে অট্টালিকায় বসে নানারকম সখের বাণী দেন, নাচগান নিয়ে মেতে থাকেন, বার বার বিলেতে যান হাওয়া খেতে, নাটক নভেল যা লেখেন সেও বড়লোকদের সমস্যা নিয়ে। দেশের মাটিতে কাদা মেখে যারা খেটে খায়, তাদের ধার ধারেন না রবি ঠাকুর। গান যা লেখেন, কবিতা যা লেখেন সেও এমন সব গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে, এমনি মার্জিত ভাষায়

যে, দেশের কোটি কোটি জেলে জোলা চাষা মজুরদের তার একবর্ণ বোঝার সাধ্য নেই।

কথাটা যে কত ভুল, সে আর কে বলবে। রবীন্দ্রনাথ একের মন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। দেশ বললে গোটা দেশটাকেই বুঝতেন, বড়লোক গরিবলোক আলাদা করে ভাবতেন না। যে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কথা নিয়ে লিখতেন, সে সব মানুষেরই অন্তরের কথা, গরিব বড়লোক বলে কিছু নেই সেখানে। কাজের বেলাতে যে কুটিরশিল্প উদ্ধার করা, গ্রামের উন্নতি করা, লোকসংগীত খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা, এ-সবই দেশের জনসাধারণের জন্য, বড়লোকদের জন্য নয়।

যারা তাঁকে চিনত, তারা জানত তাঁর মনে এতটুকু বিলাসিতা ছিল না। এ নইলে চলবে না ও নইলে চলবে না, এমনি কথা তিনি কখনো বলতেন না। যখন যেমন দরকার পড়েছে, সেই ভাবে থেকেছেন। কুটিরেও যেমন, রাজপ্রাসাদেও তেমনই। ভালো খাব, ভালো পরব, পাঁচজনে আমায় মাথায় করে রাখবে—এ তাঁর জীবনের উচ্চাশা ছিল না। সারা জীবন কেবল এই কথাই ভেবেছেন, যা করতে এসেছি এই জগতে, সে বুঝি আর হল না।

কি করতে এসেছিলেন তিনি? কি উদ্দেশ্য নিয়ে মহামানবরা জন্মান? সে কি মানবজাতিকে সুখী করে দেবার জন্য? তা তো মনে হয় না, জন্তু-জানোয়ারেরাও তো পেট ভরে খেতে পেলে, শরীরে আরাম পেলে, পরম সুখে দিন কাটায়। সে ধরনের সুখ তো কবিরা কখনো কামনা করেন না। রবীন্দ্রনাথও বারে বারে দুঃখ ভোগ করবার শক্তি চেয়েছেন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস চেয়েছেন। মানুষের জীবনের প্রতি ভক্তি চেয়েছেন। মানুষ যদি অন্ধ, সংকীর্ণ, নীচ, নিষ্ঠুর হয়, তা হলে যে মনুষ্যত্বের অসম্মান হয়, তাই সারাজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, মানুষরা যেন সুন্দরভাবে উপযুক্তভাবে বাঁচতে পারে। যেখানে যা-কিছু সুন্দর আছে, সব সংগ্রহ করে এনে মানুষদের দিতে চেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে-সব নিতে পারার যোগ্য হতেও বলেছেন। সেইজন্য সাধনা করতে বলেছেন।

একটুখানি গুণের পরিচয় পেলেই সে মানুষকে মাথায় করে রেখেছেন, সে যেন বিশ্বভারতীর কাজে লাগে তার চেষ্টা করেছেন।

গান দিয়ে, শিল্প দিয়ে, সাধনা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে জীবনটাকে কবি

মধুময় করতে চাইতেন। যারা এটুকু বুঝত না তাদেরই মন্দ ভাগ্য। গুরুদেব কোনোদিনও সখের জীবন যাপন করেন নি। সৌখিনতা ছিল তাঁর পায়ের পাদুকা, যার উপরে থাকত সমগ্র মানুষটা, পুজোর মন্দিরে ঢোকবার সময় তাকে বাইরে খুলে ফেলে রেখে ঢুকতেন।

বিদেশেও এই যে ঘন ঘন যাওয়া, এর মধ্যে মনের চঞ্চলতাও যতখানি ছিল, কোথায় কোন উন্নততর জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়, এ বাসনাও ততখানি ছিল। আর বিশ্বভারতীর অভাব মেটাবার প্রয়োজন তো ছিলই।

১৯২৬ সালে নিমন্ত্রিত হয়ে আরেকবার ইতালি গিয়েছিলেন। গতবারের ইতালির রাজশক্তির নিন্দা করা সত্ত্বেও, ইতালি থেকে তাঁকে ডেকেছিল বলে অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কবি তবু গিয়েছিলেন আর মুসোলিনীর কাছ থেকে অনেক সৌজন্য পেয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাই প্রায় ওঁদের ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল দেখে খুশিও হয়েছিলেন। মুসোলিনীর নিন্দা করা সত্ত্বেও তিনি ভালো ব্যবহারই করেছিলেন। অনেকে বলেছিল, মুসোলিনী পৃথিবীর চোখে নিজের আসন আরেকটু উঁচু করতে চান বলে ভারতের কবিকে এত আদর দেখানো!

ইতালি থেকে রবীন্দ্রনাথ আবার ইংল্যাণ্ড গেলেন, তার পর নরওয়ে, জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, তুর্কি হয়ে ঈজিপ্ট, তার পরে আবার নিজের দেশে। যেখানেই গেলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হল, জনসাধারণকেও নিজের আদর্শের কথা, নিজের দেশের কথা বলতে পারলেন, কত যে আদর পেলেন। এখানে ওখানে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে তাঁরা কেউ কেউ কবিকে অনুরোধ করতেন একটা গাছ পুঁতে দিয়ে যেতে। সে-সব গাছের কোনো কোনোটি এখন বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠে বাঙালি কবির মৈত্রীর কথা সেই বিদেশের লোকদের মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এমনি করে সেকালের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানও একজন কবির হাত দিয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় কবি 'বনবাণী'র কবিতা-গুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ও যেন বই নয়, সবুজ গাছের উৎসব, পড়লে হৃদয় মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। দেশে ফিরে এসে দেখেন শান্তি নেই কোথাও। দিল্লিতে সেবার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হলেন। তাই শুনে কবির কত দুঃখ। পশু-বল যেখানেই প্রয়োগ করা হয়, সেখানেই

মনুষ্যত্বের অপমান হয়, এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। দুর্বলের উপরে বলবান অত্যাচার করেই থাকে, দুর্বল যদি শুধু কাঁদুনি গায় সে অত্যাচার বেড়েই চলে। কাজেই দুর্বলকে সবল হতে হবে। নিজের সম্মান রক্ষার ভার নিজেকে নিতে হবে। এ কথা কবি বহুবার বলেছেন। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে বহুকাল আগেও এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাণ বাঁচাতে হলে প্রাণশক্তি চাই।

নিজের ছিল প্রচণ্ড শক্তি, কি দেহের কি মনের। বয়স ক্রমশ সত্তরের দিকে চলেছে তবুও প্রতিভা তেমনি বলিষ্ঠ। দীর্ঘ শরীরটা যেন সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছে কিন্তু যৌবনের দীপ্ত তেজ এখনো তার কাছে হার মেনে যায়। গলা তুলে কথা কইলে কড়ি-বরগা রিম্-ঝিম্ করে ওঠে। গানের গলা তেমনি আর নেই, কিন্তু গানের প্রতিভার যেন হাজার পাপড়ি একে একে খুলে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ' নাম দিয়ে নতুন ধরনের নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা করলেন।

ওদিকে 'বিচিত্রা' বলে নতুন একটা পত্রিকা বেরুচ্ছে, তার জন্য নতুন নতুন রচনা হচ্ছে। এই পত্রিকাতেই নতুন উপন্যাস, 'তিন পুরুষ' বেরুল, পরে তার নাম হল 'যোগাযোগ'। এই উপন্যাসে কবি কেমন সুন্দর করে দেখিয়েছেন পিতামহদের জীবনের ধারা পুত্রকন্যার কাছে এসে অন্য রূপ নিচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় পুরুষ যেই জন্ম নিল, অমনি তার জন্য সবাই তাদের দাবি ছেড়ে দিচ্ছে।

১৯২৭ সালে আরেকবার বিদেশ যাত্রা। এই নিয়ে হল নয় বার দেশের মাটি ছেড়ে যাওয়া। এবার গেলেন পুব সাগরে, মালয়, জাভা, বলি, শ্যামদেশ। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, আরো কেউ কেউ। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে-সব দেশের লোকেরা ভারতের কবিকে অভ্যর্থনা করল। কবির মনে পড়ল ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ এই প্রথম নয়। বহু যুগ আগে ভারতীয় বণিকরা আসত বাণিজ্য করতে, ধর্মগুরুরা এখানে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করেছিলেন, এখানে ভারতীয়রা এসে বসবাসও করেছেন। আবার এতকাল পরে কবি এসেছেন ভারতের বাণিজ্য নিয়ে নয়, ভারতের উদাত্ত বাণী নিয়ে। এখানে এসে এদের আপনজন বলে চিনতে পেরেছেন। 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' নামের কবিতায় এই মনের ভাবের অনেকখানি প্রকাশ করেছিলেন

মাস পুরে যাবার আগেই কবি আবার দেশে ফিরেছেন, 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যকে নতুন করে সাজিয়ে তার নাম দিয়েছেন 'ঋতুরঙ্গ'। কলকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়ও হল। কাজের চাকা ঘুরেই চলেছে, আরো কত বিদেশী এলেন গেলেন। তারই মধ্যে কবির সাতষট্টি বছর বয়স হল। জন্মদিনে কবিকে ওজন করা হল, দাঁড়িপাল্লার এক দিকে ওঁর নিজের লেখা বই দিয়ে। তার পর সে-সব বই বিলিয়ে দেওয়া হল।

আরেকবার বক্তৃতা দেবার জন্য এই সময় বিলেত যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শরীর খারাপ বলে আর যাওয়া হল না। তার বদলে পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। সিংহল, ব্যাঙ্গালোর বেড়ালেন। ব্যাঙ্গালোরে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসখানি শেষ করলেন। বিদেশ গেলেন আবার দুবছর পরেই, ক্যানাডার নিমন্ত্রণে। জাপান হয়ে গেলেন, ক্যানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রেও গেলেন, কয়েকটি বিখ্যাত জায়গায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন। এমন সময় ওঁর পাসপোর্ট গেল হারিয়ে। এমন বিশ্ব-বিখ্যাত কবির পাসপোর্ট হারানো ব্যাপার নিয়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষ এমনি হাঙ্গামা বাধালেন, যে শেষ অবধি তিতিবিরক্ত হয়ে কবি আবার জাপান যাত্রা করেছিলেন। তার পর আবার দেশে ফিরলেন।

দেশে যখনই থাকেন কাজেকর্মে একেবারে ডুবে যান। এখানে ওখানে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাপতিত্ব করছেন, কাব্যরচনা করছেন, নাটক লিখছেন, সেগুলি অভিনয় করাচ্ছেন। প্রথম প্রথম শুধু গানের নাটক লিখতেন, তার পর মুখের কথার সঙ্গে গান জুড়লেন, শেষে নাটকের সঙ্গে গান ও নাচ দুইই যোগ করলেন। 'রাজা ও রানী' ভেঙে হল 'তপতী'। জোড়াসাঁকোতে টিকিট বেচে 'তপতী' অভিনয় হল, আটষট্টি বছর বয়স কবির, তিনি সাজলেন যুবক বিক্রম। দেখে লোকে মুগ্ধ হল। দেখতে দেখতে বিশ্বভারতীর কাজ একেবারে জমে উঠেছে। জাপান থেকে যুযুৎসু শেখাতে অধ্যাপক তাকাগাকি এসেছেন। পড়াশুনো পুরোদমে চলেছে।

তারই মধ্যে কবি হঠাৎ ছবি আঁকতে শুরু করে দিলেন। অনভ্যস্ত হাতের কাঁচা ছবি নয়, পাকা ওস্তাদের অদ্ভুত কল্পনার সব মূর্তি, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা। এ-সব ছবির মধ্যে ভারি একটা বলিষ্ঠতা

আছে, হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয়। কিন্তু কবির গদ্যে, কাব্যে গানে, নৃত্যের ছন্দে যেমন একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়, সব যেন একসঙ্গে ঐকতানের মতো বেজে ওঠে, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার বিরোধ থাকে না, এ ছবি আঁকা ঠিক তার উলটো।

এরা হল কবির খেয়ালের উদ্ভট সব ছবি, মনের পেছনে কোথায় যেন বছরের পর বছর বন্ধ ছিল। হঠাৎ কবি চাবিগাছি নিয়ে দোর খুলে দিয়েছেন তারাও অমনি হুড়্‌মুড়্‌ করে একেবারে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

অদ্ভুত সে ছবি আঁকা, কালো অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেন কোথাও আলো ফুটেছে, কোথাও-বা প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক যুগের জানোয়ার কি পাখি হঠাৎ যেন বেঁচে উঠেছে, আশ্চর্য মানুষরা অন্ধকারের পরদা ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কথায় সে-সব ছবির বর্ণনা দেওয়া শক্ত। পৃথিবীতে ও ধরনের জন্তু মানুষ কেউ কখনো দেখে নি, কিন্তু তাদের মধ্যে এমনি একটি অসাধারণ শক্তি আছে, যে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক্‌ করে ওঠে।

কুঁড়েমির সময় যে এ-সব আঁকতেন তাও নয়, কে যেন তাঁকে ধরে আঁকিয়ে নিত। আঁকার তাগিদ যেই-না মনের মধ্যে এল, আর কাগজ পেনসিল তুলি রঙের অপেক্ষায় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হাতের কাছে যা পেতেন, বইয়ের মলাট, ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো, সাধারণ কালি কলম, তাই দিয়েই আশ্চর্য সব ছবি এঁকে ফেলতেন। ছোটবেলায় নাকি ছবি আঁকার সখ ছিল, হয়তো-বা তারই পরিপূর্ণ ফল।

চতুর্দশ অধ্যায়

উনসত্তর বছর বয়সে আরেকবার য়ুরোপ গেলেন। প্যারিসে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হল। য়ুরোপের শিল্পজ্ঞরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একজন বৃদ্ধ ভারতীয় কবি যে এ ধরনের ছবি আঁকতে পারে, এ তাঁদের কল্পনাতেও কখনো আসে নি।

সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে গতবার অসুস্থতার জন্য যার প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বক্তৃতাগুলি দিলেন। এখানেও

ছবির প্রদর্শনী হল।

ওদিকে দেশের খবর কিন্তু তেমন ভালো নয়। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। ডাণ্ডি মার্চের বছর সেটা, তার পর গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, চট্টগ্রামে স্বদেশীরা অস্ত্রাগার লুঠ করেছে, শোলাপুরে সামরিক শাসন চলেছে, আইন করে জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গান্ধী-টুপি পরা পর্যন্ত অন্যায় কাজ বলে ধরা হচ্ছে।

এ-সব খবর শুনে কবির প্রাণ একেবারে উতলা হয়ে উঠল। অত দূরে থেকে কিই-বা করতে পারেন? ওখানকার পত্রিকাদিতেও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভারতের সম্মান রক্ষা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় বিলেতে 'গোল টেবিলের বৈঠক' বসল। সেখানে ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা হবে। গান্ধীজিকেও নিমন্ত্রণ করা হল, কিন্তু তিনি এমন কতকগুলি সর্ত দিলেন, যাতে ইংরেজ সরকার রাজি হলেন না। কবির বড় দুঃখ, গান্ধীজি এসে ভারতবর্ষের দিকটা বললে যেন ভালোই হত। আবার এ কথাও বললেন যে নিজের মনের সংশয়ের চেয়ে গান্ধীজির সংকল্পের উপর যেন তাঁর বেশি আস্থা থাকে এই তিনি চান।

এবার ইংল্যাণ্ড থেকে জর্মানি, ডেনমার্ক, রাশিয়া, আমেরিকা হয়ে এগারো মাস পরে দেশে ফিরেছিলেন। রাশিয়ার সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার ও সমবায়নীতি তাঁর ভালো লেগেছিল। জন্ম হয়েছিল জমিদার বংশে, কিন্তু এই জমিদারি প্রথার উপর ক্রমে মনে ঘৃণা জমে যাচ্ছিল। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে একটা চিঠিতে সে কথা লিখেও ছিলেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে আরো মতামত জানা যায়।

গুণীদের মন হয় বড় সূক্ষ্ম। চিন্তারাজ্যের এতটুকু বাতাসের দোলাতে সাড়া দেয়। যে গুণগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, তারা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সারা জীবন ধরে তিনি যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন, পড়েছিলেন, ভেবেছিলেন, যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন, যে-সব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, এমন-কি, যে-সব স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ-সমস্তর মধ্য থেকে কণা কণা আহরণ করে নিয়ে। একদিনে তিনি জন্মান নি, যতদিন বেঁচেছিলেন, বারে বারে যেন কোথা থেকে নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে নতুন নতুন তারুণ্যে বিভূষিত হয়ে উঠতেন। সত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখ থেকে মুখ থেকে এমন একটা উজ্জ্বল তারুণ্য উদ্‌ভাসিত হত, যা

যে-কোনো যুবকের তারুণ্যকে লজ্জা দিত। এই তারুণ্যের মূলে ছিল তাঁর ঐ জানবার, বুঝবার, গ্রহণ করবার, কাজে লাগাবার অসাধারণ ক্ষমতা।

এবার বিদেশে যাবার আগে পর্যন্ত, বিদ্যালয়ের অনেক কাজের ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন আর এমন দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছিলেন যে দেখে অবাক হতে হত। শরীর খারাপ হয়ে মাঝে কলকাতায় এসেছিলেন, বেশ কিছুদিন চিকিৎসকদের হাতেও থাকতে হয়েছিল, তার পর হঠাৎ শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। একজন বন্ধুকে লিখলেন—কাজে আমার ক্ষতি করে না, কাজই আমার প্রাণ।

এতদিনে এ কথা পৃথিবীতে সর্বজন-স্বীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহাপুরুষ গান্ধীজি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। সত্তর বছর বয়স হয়েছে কবির, দেশের লোকে ঘটা করে তাঁর জয়ন্তী উৎসব করল।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীরা শুভকামনা পাঠালেন, কলকাতার টাউন হলের সামনে, রাজপথকে সাজিয়ে রাজসভার মতো করা হল, সেখানে হাজার হাজার লোকে মিলে কবির সম্বর্ধনা করলেন। ছবির প্রদর্শনী হল, মেলা বসল, নাট্যাভিনয় হল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যে দেশের লোকে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে সকলেই সে কথা বুঝল।

তারই মধ্যে খবর এল গান্ধীজি ও অন্যান্য দেশনেতারা আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখুনি কবি আনন্দোৎসব বন্ধ করে দিলেন।

মন বড় খারাপ, কলকাতার কাছে গঙ্গার তীরে খড়দহে একটা ভাড়াবাড়িতে কিছুদিন থাকলেন। এখানে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। সে-সব পরে ছাপা হল 'বিচিত্রিতা' 'বীথিকা' 'পরিশেষ' ইত্যাদিতে। 'বিচিত্রিতা' বইখানির একটা কাহিনী আছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কয়েকটি ভালো ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল, ঐ ছবিগুলিকে ভাষা দেবেন। খড়দহে ঐ ছবিগুলি দেখে 'বিচিত্রিতা'র কবিতা রচনা হল।

এই খড়দহ থেকেই কবি সে বছর ২৬শে জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখেছিলেন, তবে এ দেশের ইংরেজ সরকার সে চিঠি যথাস্থানে

পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হতে দেন নি।

গান্ধীজিকে স্মরণ করে কবি তাঁর বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটিও এখানে বসে রচনা করেছিলেন। এদিকে পারস্য দেশের অধিপতি, লোকে যাঁকে 'শাহ' বলে, কবিকে তাঁদের দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন, সে নিমন্ত্রণ কবি না গ্রহণ করে কি করেন, সেখানে তো কখনো যাওয়া হয় নি। এবার এরোপ্লেনে গেলেন। সেখানকার সে রাজকীয় আতিথ্য কল্পনা করা যায় না, গোলাপ ফুল দিয়ে তাঁরা পথঘাট ঢেকে ফেলেছিলেন। দেখবার শুনবারও অনেক কিছু ছিল, পুরনো শহরের ভগ্নাবশেষ, হাফেজের কবর ইত্যাদি। সেখান থেকে ইরাকে, আরবদেশে গেলেন। নতুন একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন হল স্বাধীন দুটি মুসলমান রাজ্যের সঙ্গে। ইরান থেকে একজন অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসে মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবেন স্থির হল। এমনি করে বিশ্বভারতীর বাণীকে কবি দেশ-দেশান্তরে পৌঁছে দিতেন।

দেশে এসে অল্প কদিনের মধ্যে নিদারুণ দুঃখ পেতে হল। তাঁর একমাত্র নাতি, তাঁর সব চাইতে ছোট মেয়ে মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল বিদেশে। জীবনের অন্যান্য শোকের আঘাতকে যেমন বুক পেতে নিয়েছিলেন, একেও তেমনি নিলেন। লোকের সামনে নিজের শোককে বড় করে দেখানোর মধ্যে এমন একটা মানসিক দৈন্য আছে যে কবির পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন, এমন-কি, বন্ধুরা সে বছর বর্ষামঙ্গল উৎসব বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, কবি তাঁদের বারণ করলেন।

কর্মক্ষেত্রে আবার অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। কবি এবার কিছু টাকা রোজগার করবার উপায় দেখলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রামতনু লাহিড়ীর স্মৃতিতে যে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃতামালা হয়, তারই আসন অলংকৃত করতে অনুরোধ করলেন। সে বছরের 'কমলা লেকচার' দিতেও তিনি নিমন্ত্রিত হলেন।

তা ছাড়া নিজের লেখা তো ছিলই। ওদিকে দেশের দিকেও না তাকালেই নয়। গান্ধীজি তাঁর হরিজন আন্দোলন চালাচ্ছেন। ইংরেজ রাজ এ দেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন, গান্ধীজি তার প্রতিবাদ স্বরূপ আবার অনশনে আছেন। এ-সব সংবাদে কবির মন উদ্‌বিগ্ন, ব্যাকুল।

হরিজন আন্দোলন তাঁর বড় মনের মতো জিনিস। মানুষে মানুষে ভেদ রাখাকে কবি চিরকাল ঘৃণা করেছেন, সেই ভেদ অনেক জায়গায় এত বেশি যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভগবানের মন্দিরে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হত না। তাই নিয়ে গান্ধীজি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন। কবির হৃদয়ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা পেত, তিনি 'রথের রশি', 'চণ্ডালিকা' লিখে কতকটা নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। 'রথের রশি'র গল্পে রথের চাকা গেছে বসে, কেউ আর তাকে চালাতে পারে না, না রাজা, না সৈনিক, না পুরোহিত—শেষকালে মজুররা এসে যেই-না দড়িতে হাত লাগাল, অমনি গড়্‌গড়্‌ করে রথ এগিয়ে চলল। আর কবি হলেন তাদেরই বন্ধু।

সারা জীবন যা-কিছু লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সবটার মধ্যে যেন একটা উদারতার বাণী আছে। শেষ বয়সের রচনা 'শাপমোচনে' 'তাসের দেশে'ও সে মনোভাব ম্লান হয় নি।

কবি বুড়ো হলে হবে কি, আসলে দেশ বা কালের বাধাগুলো তাঁর কাছে কিছু নয়। এই বয়সে কয়েকটা গল্প আর নাটিকা লিখলেন, যা একজন আধুনিক যুবকের লেখা হতে পারত, যেমন 'মালঞ্চ', 'দুই বোন', 'বাঁশরি'।

এখন ১৯৩৩ সাল, গান্ধীজি এখনো জেলে, সেখান থেকে 'হরিজন' পত্রিকা চালাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'মেথর' কবিতার অনুবাদ পাঠালেন।

জেলে গান্ধীজি আবার অনশন ব্রত পালন করেছেন, তার কারণ ওঁর নিজের কয়েকজন কর্মীর নৈতিক অবনতি। রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, আসলে এ ধরনের উপবাসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, এও এক ধরনের বল প্রয়োগ করা, তবে শরীরের উপর না করে, মনের উপর। কবি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন, মানুষকে ভালোর দিকে নিতে হলে, তাকে আগে ভালোর আদর্শটাকে বোঝাতে হবে, সে নিজে থেকে যখন ভালোটাকে গ্রহণ করবে, তখনই সেটা সার্থক হবে, তার আগে নয়।

এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজি মুক্তি পেলেন। বাইরে এসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তুলে নিলেন, নিজের সমস্ত শক্তি লাগালেন অস্পৃশ্যতা দূর করবার কাজে।

এদিকে শান্তিনিকেতনেও বিশ্বভারতীর কাজ চলেছে। কর্মীদের মধ্যে অদল-বদল তো হবেই। এর আগে কলেজ খোলা হয়েছে, বিশাল 'উদয়ন' বাড়ি তৈরি হয়েছে, তবে কবি সব সময় সেখানে থাকেন না। 'কোণার্কে'র মাটির বাড়িরও অনেক রদ-বদল হয়েছে। কবির পঁচাত্তর বছর যখন বয়স তখন মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' উঠেছে সেখানে বড় নিরিবিলিতে দিন কাটাতে পারবেন, এই ছিল কবির মনের আশা। কিন্তু সে আর হল কই? মাটির বাড়িতে কবি-সম্রাট বাস করছেন, দলে দলে লোক আসত তাই দেখতে। গান্ধীজিও একবার এই বাড়িতে বাস করে গেছেন। খুব ভালো লেগেছিল তাঁর।

কিন্তু 'শ্যামলী'তেও মন বসে নি কবির, মন তাঁর কোথাও বসবার নয়। শ্যামলীর পরে 'পুনশ্চ' বলে আরেকটা বাড়ি হল। তার চেহারা ঠিক শ্যামলীর উলটো। শ্যামলী যেন গাঁয়ের মেয়ে, ঘোমটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে, ঠাণ্ডা, কোমল, চুপচাপ স্বভাবটি। আর 'পুনশ্চ' সাদা উজ্জ্বল, মাঝখানে একটি বড় ঘর, চার দিকে কাচে-মোড়া বারান্দা, যেন চোখ মেলে চাইছে, বাইরেটাকে ভিতরে আসবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঠিক মনে হত যেন তাই দেখে গাছরা সব কাছাকাছি এসেছে; আকন্দ ফুলরা একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির।

'পুনশ্চ'র পরেও আরেকটা বাড়ি হয়ে ছিল, তার নাম সবাই বলে 'উদীচী'। দোতলা পাকা বাড়ি, বাইরে দিয়ে তার সিঁড়ি, ভারি ছিমছাম দেখতে; সিঁড়ি বেয়ে লতাগাছে ফুল ধরে থাকে। এই বাড়িতেই শেষের দিকে কবি ছিলেন।

তবে যে সময়ের কথা হচ্ছিল, তখন সবেমাত্র 'শ্যামলী' তৈরি হয়েছে। 'শ্যামলী'র নামে কবি কবিতাও লিখেছেন, শ্যামলীর সামনে দাঁড়িয়ে কবির বিখ্যাত ছবি কে না দেখেছে?

পঞ্চদশ অধ্যায়

কবির এতটা বয়স হলেও কাজ থামল না। ১৯৩৩, ১৯৩৪ সালেও দেশের মধ্যে বেড়ানো বন্ধ হল না, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, সিংহল। 'শেষ সপ্তক' কবিতার বই প্রকাশিত হল, কলকাতায় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন করলেন ; কাশী গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিলেন ; কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে 'রাজা' অভিনয় হল, নিজে ঠাকুরদা সাজলেন ; নানান আলোচনা-সভায় যোগ দিলেন ; 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্য করে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে দেখালেন ; আবার বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা তুলতে বেরুলেন।

বুড়ো বয়সে টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঘুরে বেড়াতে দেখে গান্ধীজি বড় দুঃখিত হলেন। কবিকে অমন করে বেড়াতে বারণ করে নিজের ভক্তবন্ধুদের মধ্যে থেকে ষাট হাজার টাকা তুলে দান করলেন। পরে এক সময় কবি তাঁকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলেছিলেন, গান্ধীজিকে ভার নিতে অনুরোধ করেছিলেন। অনেকদিন পরে যে স্বাধীন ভারতের সরকার বিশ্বভারতীর ভার নিয়েছেন, সেও গান্ধীজির এই পুরনো প্রতিশ্রুতির জন্যই।

১৯৩৭ সালে কবির বয়স ছিয়াত্তর পার হয়ে গেছে, তখনো সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। এইবার গুরুতর রোগে ধরেছিল তাঁকে, বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তাঁকে সারিয়ে তুললেন। দেশের গণ্যমান্য লোক কত যে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

ওদিকে শান্তিনিকেতনের কাজ আরো বাড়তে লাগল। সংগীতভবন, কলাভবন, চীনাভবন, হিন্দীভবন, একে একে সব হল। ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে হিন্দীভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, কিন্তু কবির সেদিন শরীর ভালো নয় তাই নিজে সেটা দেখতে পেলেন না। পরের বছর জানুয়ারিতে জহরলাল নেহরু নিজে এসে হিন্দীভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন, এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুশোকও আরো পেতে হয়েছিল। তাঁর চিরদিনের গানের

ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বড় আদরের আত্মীয়, অকালে মারা গেলেন। বন্ধুদের দলে ফাঁক দেখা দিতে লাগল, তবু কবির কাজের আর শেষ নেই। কবির মন চিরকাল অন্য জগতে বাস করে, এই সময় তিনি তাঁর সেক্রেটারি কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্য ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড় !'

ঐ ফুল ফোটানোর আর অন্ত নেই। আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে, নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র খসড়া তৈরি করছেন, 'গীতবিতানে'র নতুন সংস্করণ হবে, তাই দেখে দিচ্ছেন। 'গীতবিতান' প্রকাশন যে কি বিরাট কাজ সাধারণ লোকের সে বিষয় কোনো ধারণাই নেই। প্রত্যেকটি গান সাজিয়ে গুছিয়ে তোলাই এক ব্যাপার। দেড়হাজার গান নিখুঁত-ভাবে গুছিয়ে ছাপানো সে কি বিরাট কাজ, সে ভাবা যায় না।

এ ছাড়া অতিথি-আপ্যায়ন তো ছিলই নিত্য কর্তব্য। শুধু যে লাট বড়লাট শান্তিনিকেতনের আতিথ্য নেন তা নয়, যে বিদেশীই ভারতবর্ষ দেখতে আসেন, প্রায় প্রত্যেকেই একবার শান্তিনিকেতন দেখে না গেলে এ দেশ দেখা সম্পূর্ণ হল না মনে করেন। এঁদের সুযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করাও কম কথা নয়। কবি নিজে সমস্ত খুঁটিনাটির কথা ভেবে রাখতেন। সে বছর গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং গেলেন। কালিম্পং হল হিমালয়ের পাদদেশে ছোট শহর, দার্জিলিং-এর মতো অত উঁচুতে নয় বলে অত ঠাণ্ডাও নয়। কালিম্পং থেকে মংপুতে গিয়ে মাস দেড়েক লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি হয়ে কাটালেন। সে সময়ের কথা মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে পাওয়া যায়।

বয়স কবির কিছু করতে পারে নি, সমানে লিখে যাচ্ছেন। কবিতা তো বটেই, তার উপর বাংলা ভাষার বিষয় একখানি বই। আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে, সামনে একটা বোর্ড নিয়ে, তার উপর লেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। কবির সেটা পছন্দ হল না, চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে না লিখলে তাঁর নাকি লেখা আসে না !

আলস্য তাঁর ধারে কাছে ঠাঁই পায় না, ভোর থেকে লেখাপড়া চলে ; কখনো-বা গভীরভাবে চিন্তা করেন, বই পড়েন বিদেশ থেকে অমিয়

চক্রবর্তী বই পাঠান, সে-সব পড়েন। চিঠিপত্রও লেখেন, তবে ফরমায়েসী কবিতা, নামকরণ ইত্যাদিতে আজকাল বিরক্তি আসে। কোনো লেখক কবির রচনা সম্বন্ধেই বই লিখেছেন, সেটি পড়ে নিজের মতামত লিখছেন, বলছেন, 'অত ব্যাখ্যা করে কোন কবিতা ভালো কোনটা মন্দ তা প্রমাণ করতে হয় না, কাব্যজগতে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছামতো ভালো মন্দ খুঁজে বের করুক, তাদের শুধু একটু পথ দেখিয়ে দিয়ো।' আবার মাঝে মাঝে মৃত্যু আর মৃত্যুর পরের অজানালোকের কথাও যেন কবির মনে পড়ে।

দু মাস পাহাড়ে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখন ছুটি শেষ হয়ে গেছে। আবার কাজের চাকা ঘুরতে থাকে।

এরই মধ্যে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ এল। পুরনো সব স্নেহের বন্ধন একে একে খুলে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ বয়সে শোক আর কবিকে তেমন স্পর্শ করতে পারে না, তবু মনে দুঃখ পান বৈকি!

লেখাও চলছে, কিছু কিছু কবিতা, পুরনো গল্প ভেঙে নাটিকা, তার মধ্যে প্রচুর রসের খোরাক। কিন্তু কবির বয়স হয়েছে আটাত্তরের উপরে, চোখে যেন একটু কম দেখছেন। তবুও সে বছরও গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করলেন। তার পর পুজোর ছুটি এল, কবি শান্তিনিকেতনেই থেকে গেলেন।

সময়টা ভালো ছিল না, ১৯৩৮ সাল, আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। কবি যেন আগে থাকতেই তার আভাস পাচ্ছেন, সমস্ত য়ুরোপ যে তাঁর চেনা। অশান্তির হাওয়া ক্রমে ছড়াতে থাকে, কবি লিখেছেন, 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা। তার মধ্যে বলেছেন,

> 'যদি এ ভুবনে থাকে আজও তেজ
> কল্যাণশক্তির,
> ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
> পূর্ণ করিয়া শেষে
> নূতন জীবন নূতন আলোকে
> জাগিবে নূতন দেশে।'

এই কল্যাণশক্তিতে কবি চিরদিন বিশ্বাস রেখে এসেছেন, সুখে দুঃখে নিজের নিভৃত অন্তর্লোকে সেই তো তাঁর চিরদিনের একমাত্র সহায়।

পুজোর ছুটিও শেষ হয়ে যায়। আশ্রমে এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক

স্কাউট নায়কদের শিক্ষা শিবির হয়েছে। তাদের কবি বললেন, কখনো বুড়ো হয়ো না। আমার চুল পেকে গেছে তবু বুড়ো হই নি, তার কারণ এই পৃথিবীটাকে, এই জীবনটাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।

আরো পাঁচরকমের কাজ এসে কবিকে ঘিরে ধরে! মনটা যতই না দূরে দূরে বিচরণ করতে চায়, আশ্রমের হাজাররকম প্রয়োজন এসে দরজার কড়া নাড়ে।

কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হল। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট. তিনি তার দ্বার উন্মোচন করলেন। অসুস্থতাব জন্য কবি আসতে পারলেন না, নিজের ভাষণ লিখে পাঠালেন। তবে শান্তিনিকেতনের উৎসবাদিতে নিজেই আসেন ; রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন করা হল, সাতই পৌষের উৎসব হল, কবি উপাসনা করলেন, সভা ইত্যাদিতে যোগ দিলেন। এল্‌মহার্স্ট সাহেব এণ্ড্রুজ সাহেব দুজনেই এবার এসেছিলেন। কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্রও এলেন।

পরের বছরও যথারীতি বসন্তোৎসব হল। নববর্ষের পরদিন কবি কলকাতা হয়ে পুরী গেলেন। সেখানে বড় শান্তিতে আরামে ছিলেন। কেউ তাঁকে কোনো সভাতে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি।

পুরী থেকে ফিরে আবার মংপুতে গিয়ে একমাস কাটিয়ে এলেন। বই পড়েন, কবিতা কিছু কিছু লেখেন, অনেক আলাপ-আলোচনা করেন, গৃহস্বামিনীর আদর-যত্নে আরামে থাকেন।

একমাস পরে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন তখনো গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, কিন্তু কাজের অন্ত নেই। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা ব্যবস্থা করছেন কবির সঙ্গে বারে বারে তাঁদের পরামর্শ করতে হচ্ছে ; ভূমিকাটাও লিখে দিচ্ছেন কবি। পুরনো অনেক লেখাকে কবি বাদ দিতে চান, এঁদের সঙ্গে সব সময় মতে মেলে না। এ বিষয় কবি বলেছেন, জীবনের সব কাজকে পেছনে টেনে বেড়াতে হয় না, মানুষদের পূর্বপুরুষদের তো একটা করে লেজও ছিল, ইতিহাসের সঙ্গে মানুষরা কি সেটাকেও টেনে বেড়াবে নাকি ?

তবে নতুন লেখা এই সময় বড় একটা লেখেন নি, কয়েকটি অপূর্ব কবিতা ও গান ছাড়া।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা, কবির সেই 'তিন বছরের প্রিয়া'র বিবাহ হল শান্তিনিকেতনে, মহা ঘটা করে।

তার পরে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজি এলেন কস্তুরীবাঈকে সঙ্গে নিয়ে। কত যে দীর্ঘদিনের কত প্রীতির কথা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা হয়েছিল দুজনার মধ্যে, বাইরের লোকের কাছে সে-সব বলাও যায় না। গান্ধীজি এবার দিল্লী ফিরেই আশ্রমের দায়িত্বের কথা সেখানে সকলকে জানান, তখন থেকেই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও একটা দায়িত্ববোধ এসেছিল।

আশি বছর প্রায় বয়স কবির, তবু স্থির হয়ে বসবার লোক তিনি নন। মংপুতে আরেকবার গিয়েছিলেন, তার পর মেদিনীপুরে আবার সিউড়ি, বাঁকুড়াতে। লোকেও ডাকে, তিনিও অমনি সাড়া দেন।

১৯৪০ সালে এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃত্যু হল। কবি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আরেকজনকে হারালেন। সে বছরটা ছিল ছাড়াছাড়ির বছর, আদরের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ গেলেন, প্রিয় সহকর্মী কালীমোহন ঘোষও গেলেন।

তবু শান্তিনিকেতনের কাজ করে যাচ্ছেন, লিখছেন, অন্যের লেখা দেখে দিচ্ছেন, এমন-কি, বড় ছেলেদের পড়াচ্ছেন।

ঐ বছর আগস্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দিলেন।

কিন্তু সময় তো কাউকে ছেড়ে দেয় না। প্রায় আশি বছরের কবিকেও না। চোখের দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি কমে গেছে। চলে ফিরে বেড়াতে আর পারেন না, তবু একটা ঠেলা চেয়ার-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। লেখেনও। ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি' এই সময়ে লেখা।

কবি একটা কিছু মনে মনে স্থির করলে তাঁর মত বদলানো খুব সহজ ছিল না। এ বছরও একরকম জোর করে কালিম্পং গেলেন, সকলের মানা সত্ত্বেও। সেখানে সাতদিন পরে এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল।

কিছুদিন গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলেন, তার মধ্যে মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন, অন্যরা লিখে নেয়। কানের কাছে জোরে কথা না বললে শুনতে পান না। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা অমলিন। 'রোগশয্যায়ে'র কবিতা এই সময় লেখা। তার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে 'আরোগ্যে'র কবিতা লিখতে থাকেন, 'রোগশয্যায়ে'রও কিছু বাকি ছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

এবার শরীর আর কিছুতেই যেন জোড়া লাগে না। পৃথিবীর আলো, যে আলোতে তিনি জগৎকে এত সুন্দর করে দেখেছিলেন, সে আলো যেন চোখ থেকে ক্রমে সরে যেতে লাগল। তবুও জগতের যিনি পালক, তাঁর উপর বিশ্বাস যায় নি। 'রোগশয্যায়'তে লিখেছিলেন,

'অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।'

পৃথিবীর শব্দ, যে শব্দের মধুর ঝংকার সারাজীবন মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন, সেও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। প্রাণের জ্যোতি কিন্তু এতটুকু ম্লান হল না। কেবলই বই পড়া শুনছেন, নিজে আর পড়তে পারেন না। আশ্চর্য কবিতা, প্রবন্ধ লেখাচ্ছেন, নিজের হাতে লেখা মুশকিল। অফুরন্ত প্রতিভা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে না।

শরীরের নানান কষ্ট, কিন্তু মুখে হাসি। যেন বুঝতে পেরেছেন ঘাটে এবার যাবার নৌকো এসে লাগবে। তোড়জোড় করছেন, যাকে যা বলবার বলে নিচ্ছেন।

শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসব বন্ধ হচ্ছে না, দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছে কবিকে দর্শন করতে। সূর্যাস্তের সময় যেন আকাশে লালের সোনালীর অপূর্ব বাহার!

পৌষ উৎসব হল, কবির জীবনের শেষ উৎসব, উঠে যোগ দিতে পারলেন না, ভাষণ পাঠালেন। শান্তিনিকেতনে আছেন, অথচ আমবাগানে সবার সঙ্গে গিয়ে জুটতে পারছেন না, কবির সে কি দুঃখ!

তার পরে আবার নববর্ষ এল, নতুন গান লিখে দিলেন। শান্তিনিকেতনে ঐদিনে কবির জন্মোৎসব করা হয়, তার জন্য ভাষণ দিলেন।

'জন্মদিনে' কবিতার বই এ সময় বেরুল, এই তাঁর শেষ কবিতার বই। ছোটবেলাকার স্মৃতি দিয়ে তৈরি 'গল্পসল্প'ও বেরুল। এমনি

করে যারা বাঁচতে জানে, তাদের জীবন পরিপূর্ণতা পায়। সম্পূর্ণ সুন্দর একটা বালার মতো ঘুরে এসে জীবনের আরম্ভটি আর শেষটি কাছাকাছি এসে যায়, যেন বালার মুখ দুটি।

চোখে ভালো দেখেন না, কানে ভালো শোনেন না, তবু মনটা হীরের মতো উজ্জ্বল। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে এ সময় যে-সব কথা বলেছিলেন, পরে সে-সব যেন ভবিষ্যৎ-বাণীর মতো ফলে গেল।

জীবনের শেষের কয়েকটি বছর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ছায়ায় কেটেছিল। শেষপর্যন্ত তাই নিয়ে চিন্তা করতেন। মিস্ রাথবোন বলে এক ইংরেজ মহিলা পত্রিকাতে ভারতবর্ষের নামে অপমানকর কথা লিখেছিলেন, শেষশয্যা থেকেও কবি তখনই তার প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন, এমনি ছিল তাঁর চরিত্রের তেজ।

কিন্তু শেষপর্যন্ত শরীর আর পারল না, কলকাতায় এলেন অস্ত্র করাবার জন্য। সেই তাঁর শান্তিনিকেতন ছেড়ে চিরকালের মতো চলে আসা। শেষবারের মতো আশ্রমের পথঘাট চেয়ে চেয়ে চোখ ভরে দেখে নিলেন। পথে রেলে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল, তবু সহযাত্রীদের সঙ্গে রসের কথা বলতে ছাড়েন নি। যতদিন রোগশয্যায় পড়ে থেকেছেন, যাদের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন, ছড়ায় গল্পে তাদের দিনগুলোকে মধুময় করে দিতেন। জীবনে কখনো কারো সেবা নিতে চাইতেন না। এরা যে তাঁর সেবা করতে পেরে ধন্য হয়ে যাচ্ছে কবির সে কথা মনেও হত না। খালি ভাবতেন ওঁর সেবা করতে গিয়ে ওদের না কষ্ট হয়।

কলকাতায় এসেছিলেন ৯ই শ্রাবণ। অস্ত্রোপচারের কয়েকদিন পর থেকেই শরীরের অবস্থা ক্রমে মন্দের দিকে যেতে লাগল। অবশেষে বাইশে শ্রাবণ রাখী-পূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছুক্ষণ পরে যে সুন্দর চোখ দিয়ে সৃষ্টির এত রূপ দেখেছিলেন, সে চোখ চিরকালের মতো বুজলেন।

এমন মৃত্যু কম দেখা যায়। শান্ত সমাহিত সুন্দর। যাঁরা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, মুখের ভাবের এতটুকু পরিবর্তন নেই; শুধু এই নিশ্বাস পড়ছিল, এই নিশ্বাস পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নৌকো ঘাটে এসে লাগল; যেমনি খালি হাতে আশি বছর আগে কবি এসেছিলেন, তেমনি খালি হাতে নিঃশব্দে গিয়ে যেন নৌকোতে উঠে বসলেন। সমস্ত আকাশ, বাতাস, পৃথিবী আলোয় আলোময় হয়ে রইল।

এই পুস্তকের উপাদান প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত :

রবীন্দ্রজীবনী, চার খণ্ড ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ প্রমথনাথ বিশী
শান্তিনিকেতন ॥ সুধীরঞ্জন দাশ
ঘরোয়া ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জোড়াসাঁকোর ধারে ॥ ঐ
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ॥ মৈত্রেয়ী দেবী
জীবনস্মৃতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছেলেবেলা ॥ ঐ
ছিন্নপত্র ॥ ঐ
ভানুসিংহের পত্রাবলী ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ॥ ঐ
চিঠিপত্র ॥ ঐ

ছেলেবেলার গল্প

সূচীপত্র

গণ্‌শার চিঠি ১৭৭
দিন দুপুরে ১৮১
গুপের বাহাদুরি ১৮৫
নতুন ছেলে নটবর ১৮৮
লাল নীল মাছ ১৯৪
গুপের গুপ্তধন ১৯৬
বদ্যিনাথের বড়ি ২০১
ভূতের ছানা ২০৬
সর্বনেশে মাদুলি ২০৯
সিঁড়ির মোড়ে বিপদ ২১৫
ঘোতন কোথায় ২১৭
নটেমামা ২২৫
হারানো জিনিস ২৩১
গুপ্তধন ২৩৪
টাকা চুরির খেলা ২৩৮
আচার ২৪৫
বাঘের চোখ ২৪৮
হরিনারায়ণ ২৫৪

গণ্শার চিঠি

ভাই সন্দেশ, অনেকদিন পর তোমায় চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কী যে সব ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম ভাই খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয়ে যেত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক্ হয়ে কড়া পড়ে যেত!

আজকাল আমি মামাবাড়ি থাকি। আমার মনে হয় ওঁরা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখি নি, কিন্তু মন্‌দা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর শেষের দিকে গুটিকতক টিম্‌টিম্ করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু বাবা সুবিধের কথা নয়। ছেলে-গুলো ভাই যায় কোথা? মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটাও ভাই কিরকম যেন! সরু-ঠ্যাং পেন্টেলুন উনি কক্ষনো ধোপার বাড়ি দেন না। সাদা কালো চৌকো কাটা কোট পরছেন তো পরছেনই! আবার চুলগুলো সামনের দিকে ক্ষুদে-ক্ষুদে, পিছনের দিকে লম্বা মতন, মধ্যিখানে দাঁড় করানো! মাঝের গোঁফ বেঁটেখাটো, পাশের গোঁফ ঝুলোঝুলো! ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কিসের চামড়া, কিসের তেলে চুবিয়ে, কিসের লোম দিয়ে সেলাই করা! ও বাবাগো, মাগো! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে! মান্‌কে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভিতর সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই গা নাচাচ্ছেন! পরের সপ্তাহে মান্‌কে আবার দেখেছে

ঘরের ভিতর ছটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে ; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের কচ্ছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে ; মাস্টারমশাই সেফ্‌টিপিন দিয়ে কান চুলকোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে নটা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন!

তা ছাড়া সেই যে বিভু আরশুল্লা পুষত, একবার গুবরে পোকাও খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে—মাস্টারমশাইয়ের বাক্সে হলদেটে তুলট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। ওঁর লেবুগাছে মাকড়সারা কেন জানি জাল বোনে না ; পেঁপেগাছে সেই গোল-চোখ চক্‌চকে জন্তু নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে মাস্টারমশাইয়ের রোগা গিন্নি মোটা বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে দিন-রাত ওৎ পেতে থাকেন। কিন্তু কিছু বলা যায় না! মন্‌দা তো ও-বাড়ি কোনোমতেই যায় না, মেজোও বাড়ির ছায়াটি মাড়ায় না, আর ছোট ছেলে ধনা, তার তো ও-বাড়ির হাওয়া গায়ে লাগলেই সর্দি-কাশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ও-বাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা সজনে ডাঁটা নেয় না!

মা কিন্তু ওদের কুমড়ো ডাঁটা দিব্যি খান ; আর বড়মামা তো ওঁরই দাদা, ঐ একই ধাত! ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কি ম্যাজিক, কি মন্তর-পড়া এ-সব একেবারে বিশ্বাস করেন না! কে জানে কোনদিন হয়তো কানে ধরে ঐ ইস্কুলেই আমাকে ভর্তি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারা জীবন ব্যা-ব্যা করে নটে চিবুব? ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড়মামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন, পাথরের উপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি!—কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ!—কান্না পেয়ে গেল ভাই!

এদ্দিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে! বড়মামা যখন তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচর্‌ ফ্যাচর্‌ হাসেন। বুঝছি গতিক ভালো নয়। দু-একবার তিনতলার ছাদে গিয়ে ব্যা-ব্যা করে
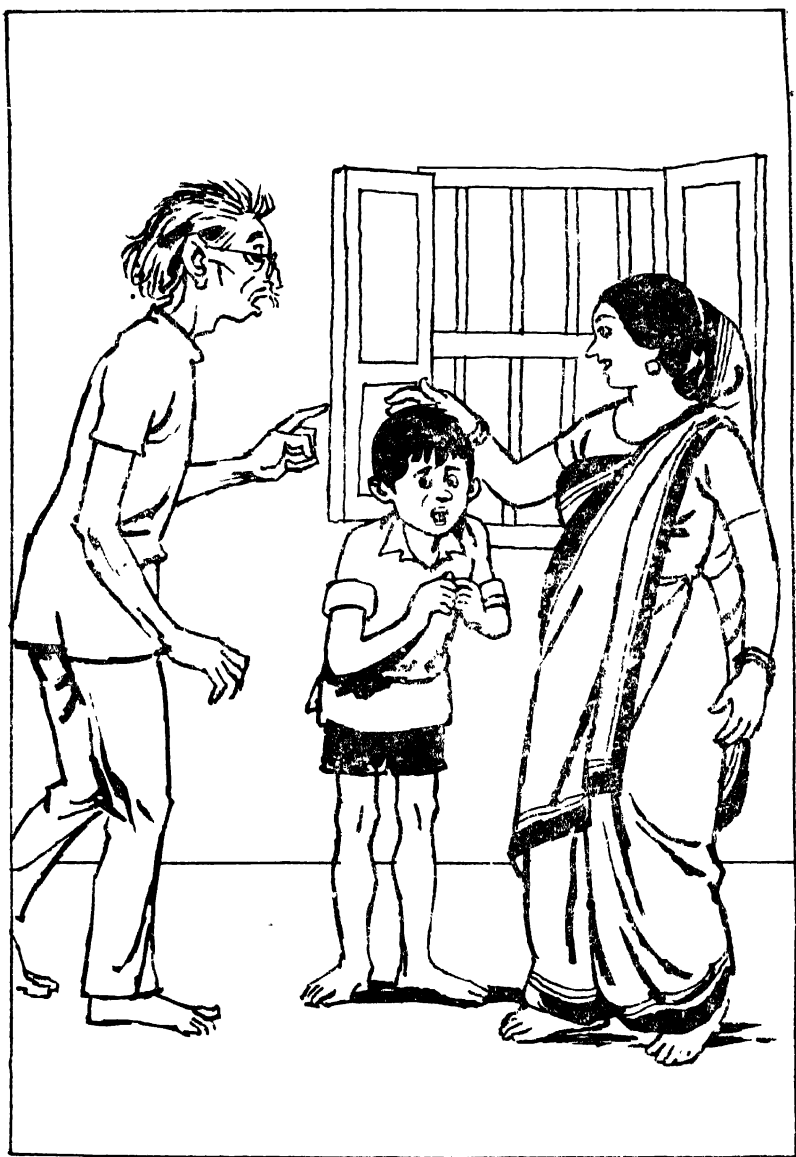
গিন্নি মাথায় হাত বুলিয়ে শিং আছে কিনা [illegible] বললেন
"তোমার মতন আমার একটি খোকা ছিল।"

ডেকে দেখেছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না গোটাকতক দুব্বো ঘাস চিবিয়ে দেখেছি—বদ খেতে, তাতে আবার ছোট্ট শুঁয়োপোকা ছিল! খোকনকে বলেছি গালায় দড়ি বেঁধে একটু টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজি হল না। এদিকে অভ্যেস না থাকলে কি যে হবে তাও তো জানি না!

এই-সব নানা কারণে এতকাল চিঠি লিখতে পারি নি বুঝতেই তো পারছ।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর্ সইল না। 'কেডস্' পায়ে দিয়ে সুট্সুট্ মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বেড়া টপ্কে, ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে, জানলার গরাদ খিম্চে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়িমাছের মতন ডাণ্ডার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারলাম।

দেখলাম মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে হুঁকো খেতে চেষ্টা করছেন, আর গিন্নি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন—কোনোটা আস্ত উঠছে, গিন্নি হাসছেন ; কোনোটা আধ-খ্যাঁচড়া উঠছে, গিন্নি দাঁত কিড়্মিড়্ করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বলে সমস্তক্ষণ বকবক করছেন ভাই, বড় ভালো লাগল।

কিন্তু আনন্দের চোটে যেই খচ্মচ্ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চম্কে বললেন, 'ওটা কি রে?' ভাবলুম এবার তো গেছি! কান ধরে ঝুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নখ দিয়ে খিম্চে দিয়ে গিরগিটির মতন মুখ করে বললেন—"ও বাঁদর!" বললুম, "আজ্ঞে সার্, ছাগল বানাবেন না সার্!" বললেন, "বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?" গিন্নিও ফিস্ফিস্ করে যেন বললেন, "ওটিকে রাখো, আমি পুষব।"

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিন্নি মাথায় হাত বুলিয়ে শিং আছে কি না দেখে বললেন, "তোমার মতন আমার একটি খোকা ছিল।" জিজ্ঞেস করলুম, "তার কি হল?" বললেন, "তার এখন দাড়ি গজিয়েছে।" বলে বড়-বড় বাতাসা খেতে দিলেন। তার পর বাড়ি চলে গেলাম। জিগ্গেস করতে সাহস হল না, দাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরও গজিয়েছিল কি না।

ইস্কুলের কথা এখনো কিছু ঠিক হয় নি, এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিয়ো না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে টোঁয়াড়ে খোঁজ কোরো। ইতি—

তোমাদের গণ্শা

দিন দুপুরে

দুপুরবেলা বাড়িসুদ্ধ সব্বাই ঘুমোচ্ছে। বাবা ঘুমোচ্ছেন, মা ঘুমোচ্ছেন, মেজোমামা পর্যন্ত খবরের কাগজে মুখ ঢাকা দিয়ে বেজায় ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু টুনুর আর ঘুমই আসে না। তাকিয়ে দেখল হাবুটা অবধি চোখ বুজে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে। তাকে ডাকা চলে না, মেজোমামা যদি জেগে যান!

টুনু শুয়ে শুয়ে ভাবছে বাবার নতুন ঘোড়া খুব সুন্দর হলেও দাদামশাইয়ের বুড়ো ঘোড়া লালুর কাছে লাগে না। লালু কত কালের পুরনো, সেই কবে মেজোমামা যখন ইস্কুলে যেতেন তখনকার। কিরকম প্রভুভক্ত! ওর গায়ে কি জোর! ভাবতে ভাবতে টুনুর মনে হল—বাদলা দিন বলে বাবা আবার আজ ঘোড়ায় চড়তে বারণ করেছেন। বড়দের যদি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে। আচ্ছা, আজকের দিনই যদি ঘোড়া না চড়বে, তো চড়বে কবে!

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই টুনুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো গোলমাল হয়ে গেল। দেখল দাদামশাইয়ের বুড়ো ঘোড়া লালু কেমন যেন মুচকি হাসতে হাসতে উঠোন পার হয়ে বাবার নতুন ঘোড়া রতনের আস্তাবলে ঢুকল। টুনু উঠে এসে জানলার আড়ালে দাঁড়াল। একটু বাদেই রতন লালু দুজনেই আস্তাবলের কোণ ঘুরে কোথায় যেন চলে গেল।

টুনু ডাকল—"ও কেশরী, ও সই-ই-স! লালু রতন যে পালিয়ে গেল!" কিন্তু গলা দিয়ে আর স্বরই বেরুল না। বাইরে এসে ইদিক-উদিক তাকিয়ে যখন কেশরী সিং কিম্বা সইসের পাত্তা পেল না, টুনু নিজেই চলল আস্তাবলের কোণ ঘুরে রতন লালুর পিছন পিছন।

কি আশ্চর্য! আস্তাবলের পিছনে সেই-সব ধোপাদের কুঁড়ে ঘর, তার সামনে নোংরা মাঠে ধোপাদের গাধা বাঁধা থাকত, আর ময়লা দড়িতে সাহেবদের কোট পেন্টেলুন রোদে শুকুত, সেই-সব গেল কোথায়? টুনু দেখল দুপাশে গা ঘেঁষে ঘেঁষে সারি সারি দোকান। কোনোটা আলু-

কাবলির, কোনোটা লাল-নীল পেনসিলের, কোনোটা কাচের মার্বেলের। চারি দিকে দোকানে দোকানে বড়-বড় নোটিস ঝোলানো।—

< এগ্‌জিবিশন এইদিকে

আর একটা দাড়িমুখো মোটকা বুড়ো একটা ফুটো বালতি পিটোচ্ছে আর ষাঁড়ের মতন গলায় চ্যাঁচাচ্ছে—"পয়সা না ফেলেই ঢুকে যান! পয়সা-টয়সা কিচ্ছু চাই না, গেলেই বাঁচি!"

টুনু আরো এগ্‌জিবিশন দেখেছিল, কতরকম আশ্চর্য জিনিস থাকে সেখানে: দোকান, বাতিওয়ালা থাম, বায়স্কোপ, নাগরদোলা, গোলক-ধাঁধা!

তাই টুনু তাড়াতাড়ি চলল, মাঝপথে একটা ষণ্ডামার্কা লোক পথ আগলে বলল, "এইয়ো!" টুনু তাকে দেখতেই পেল না, পায়ের ফাঁক দিয়ে সুট্ করে গলে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা মস্ত খোলা জায়গায় উপস্থিত হল, তার যেদিকে তাকায় কেবল ঘোড়া! বড় ঘোড়া, ছোট ঘোড়া, সাহেবের ঘোড়া, গাড়োয়ানের ঘোড়া, ভালো ঘোড়া, বিশ্রী ঘোড়া। আবার একটা মড়াখেকো হলদে ঘোড়া, ওলটানো টবে চড়ে গ্যাঁস্‌গেঁসে গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে:

"হে ব্যাকুল ঘোড়াভাই-ভগিনী, আজ আপনারা কিসের জন্য এখানে আসিয়াছেন? পুরাকালে আপনারা বন-বাদাড়ে সুখে বিচরণ করিতেন, এই দুষ্ট মানুষগুলাই তো আপনাদের পাকড়াও করিয়া বিশ্রী গাড়িতে জুতিয়াছে। পায়ে নাল বাঁধাইয়া, পিঠে জিন চড়াইয়া, দুই পাশে অভদ্র-ভাবে ঠ্যাং ঝুলাইয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ছিঃ! ছিঃ! আপনারা কি করিয়া এই দুপেয়েদের কুৎসিত চেহারা সহ্য করেন?"

পিছন থেকে গাড়োয়ানদের ছোট-ছোট ঘোড়াগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "কক্ষনো সইব না! সইব না! সইব না! মিটিং করে, রেজলিউশন্ করে, দানা না খেয়ে মানুষদের জব্দ করব!"

হলদে ঘোড়া ঠ্যাং তুলে ওদের চুপ করিয়ে দিল। টুনুর মনে হল সে নিজের ছাড়া আর কারুর গলার আওয়াজ সইতে পারে না।

এক কোণে লালু রতন দাঁড়িয়েছিল, হলদে ঘোড়া হঠাৎ লালুকে বলল, "আপনি প্রবীণ ব্যক্তি! আপনি কিছু বলুন।" বলবামাত্র লালু

লালু টব থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে
বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করল...

তড়বড় করে টব থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করল :

"বহুকাল ধরে আমি চৌধুরীদের বাড়িতে থাকি। তাদের মতন ছোটলোক আর জগতে নেই—" টুনুর শুনে ভারি দুঃখ হল। "তার উপর তারা এমন নিরেট মুখ্যু যে বড়বাবু পর্যন্ত সামান্য—যাক আমি কখনো কারো নিন্দে করি না। ওদের বাড়ির ছেলেগুলো আহাম্মুকের একশেষ। আমি শিক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছে করে ওদের কাপড় রোদে দিলে মাড়িয়ে দিই, জানলা দিয়ে ঘরে মুখ বাড়াই, বোকারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে চিনি খেতে দেয়, আর কেউ যখন দেখছে না গিন্নির হিসেবের খাতা চিবিয়ে রাখি। তা ছাড়া নোংরা জিব দিয়ে ওদের সইসের মুখ চেটে দিই, ছোট ছেলে একা পেলেই তেড়ে গিয়ে পা মাড়িয়ে দিই, এইরকম নানা উপায়ে জাতির মান রক্ষা করি।

"সব চেয়ে বিশ্রী ওদের টুনু আর হাবু বলে দুটো পোষা বাঁদর। অমন বদ চেহারার বাঁদর কেউ যে পোষে জানতাম না। ওরা আমাদের ঘুমের সময়ে এসে ঘেমো হাতে উলটো করে আমাদের গায়ে হাত বুলোয়, এমন ঘেন্না করে যে কী বলব! আবার পাতায় করে যত অখাদ্য জিনিস এনে গদগদ হয়ে শুয়োরের মতো ছুঁচলো মুখ করে, চুক্‌চুক্ শব্দ করে খাওয়াতে চেষ্টা করে—ইচ্ছে করে দিই ছেঁচে! কিন্তু অমন নিকৃষ্ট জীবকে মারতেও ঘেন্না করে।"

টুনু বিশ্বাসঘাতক লালুর কথায় অবাক হয়ে গেল, এমন অকৃতজ্ঞতা দেখে তার বড্ড কান্না পেল! ছি, লালুর জন্য দাদামশাই ভালো দানা আনান—সে কথা কই লালু তো বলল না! রতনের নতুন জিনের কথাও বোধ করি সে ভুলে গেছে! টুনু প্রতিজ্ঞা করল আর কখনো আস্তাবলের দিকে যাবে না, ঘোড়া চড়তেও সে চাইবে না। লালুকে সে কত ভালোবাসে আর লালুর তাকে নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে! টুনু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেই চমকে দেখল, সে কখন জানি মেজোমামার ঘরে এসে শুয়ে রয়েছে আর লালুটাও ইতিমধ্যে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেজোমামার হাত থেকে চিনি খাচ্ছে!

টুনুর বড্ড রাগ হল, ডেকে বলল, "দিয়ো না ওকে মেজোমামা, ও

বলেছে আমরা আহাম্মুক ছোটলোক, নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে!" মেজোমামা "আহাঃ!" বলে টুনুকে চুপ করিয়ে দিয়ে একমনে চিনি খাওয়াতে লাগলেন। টুনু হাঁ করে দেখল লালু দিব্যি চিনি সাবাড় করল, কিন্তু যাবার সময় মনে হল চোখ টিপে জিব বের করে বিশ্রী ভেংচে গেল! কিন্তু সে কথা কাকেই-বা বলে!

গুপের বাহাদুরি

আমার মামাতো ভাই গুপে বলল, "জানিস, একবার শুধু আমার জন্য আমাদের বাড়ির দশহাজার টাকার গয়না চোরের হাত থেকে বেঁচে গেছল।" শুনে আমরা হেসেই কুটোপাটি, কারণ গুপে কুকুরকে ভয় করে, গোরুকে ভয় করে, ভূতকে ভয় করে, চোরকে ভয় করে, মাতালকে ভয় করে। গুপে রেগে বলল, "কি? তোদের বিশ্বাস হল না বুঝি? তবে শোন্—

"গত বছর শীতের ছুটিতে আমার মামার বাড়ি গেছি, বড়মামিমার মেয়ের বিয়ে। সে-সব তোরা ভাবতেই পারিস না। সাতদিন আগে থাকতে রসুনচৌকি বসেছে, বড়-বড় কানাৎ ফেলা হয়েছে, ভিয়েন বসেছে, ঘিয়ের আর মিষ্টির গন্ধে রাজ্যের কুকুর এসে জুটেছে। আত্মীয়-স্বজনও যে যেখানে ছিল, ছেলেপুলে-সুদ্ধ এসে সব জমা হয়েছে। মেজদার আবার সবে টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, অঙ্কে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি, তাই নিয়ে ওরই মধ্যে বকাবকি রাগারাগি, চিলেকোঠায় গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা।

"বুঝতেই তো পারছিস আমার মামার বাড়ির ওরা ভীষণ বড়লোক। খাওয়ার যা ব্যবস্থা! দুধের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, রুই মাছের পাহাড় জমে যাচ্ছে, আমরা খেয়ে কূল পাচ্ছি না। এমনি সময় মেজোমামা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বউদি, গয়নাগাঁটি সব তোমরা একটু আগলে রেখো কিন্তু। এ অঞ্চলে ভীষণ চুরি হচ্ছে।' যেখান থেকে যত মাসি-খুড়ি এসেছিলেন সকলের হাতে এই মোটা-মোটা তাগা, গলায় ভারী ভারী বিছে হার, আর বাক্স-বোঝাই রঙবেরঙের পাথর বসানো সব

চুড়ি বালা, কানের ঝুম্‌কো। সবার তো মুখ প্যাঁশপানা হয়ে গেল। যে-যার বাক্সে আরেকটা করে তালা লাগাল।

"রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে মেজোমামার শালা বঙ্কুদা বেশ আসর জমিয়ে বসে রাজ্যের চোরের গল্প বলতে আরম্ভ করল, শুনে সকলের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল। বড়মামা বললেন, 'তা বাপু মন্দ বলিস নি, আজকাল ভালোমানুষের চেয়ে চোর-ছ্যাঁচড়েরই সংখ্যা ঢের বেশি, এমন-কি, ওরা এখন পরস্পরের কাছ থেকে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে তো আর বলিস্‌ কেন?' আমরা তো হাঁ, সে আবার কি? বড়মামা হেসে বললেন—'তাও জানিস না? এই তো গেল বছর আমাদের রেলের আপিসের ছোটসাহেব করেছে কি, সব রেজিস্টারি চিঠি-ফিঠি থেকে মেলা টাকা সরিয়েছে। এখন রাখে কোথায়, ওদিকে আবার তাই নিয়ে খোঁজখবর ধর-পাকড় চলছে, ব্যাঙ্কেও রাখা যায় না জানাজানির ভয়ে, আবার ঘরেও রাখা যায় না ধরা পড়বার ভয়ে, চোরের ভয়ে। শেষটা করল কি, টাকাগুলোকে একটা ছোট প্যাকিং-কেসে ভরে ম্যাক্লুস্কিগঞ্জে মেমসাহেবের কাছে পার্শেল করে দিল। উপরে লিখে দিল, 'সাধারণ লোহার পেরেক।' যখন সেখানে পৌঁছল তখন মেমসায়েব খুলে দেখে, ওমা কি সর্বনাশ! সত্যি-সত্যি পেরেক ভর্তি, টাকা-কড়ি হাওয়া! কি ফ্যাসাদ বল দিকিনি, না পারে পুলিসে খবর দিতে, না পারে কাগজে ছাপতে!'

"বঙ্কুদাটাকে আমরা দুচক্ষে দেখতে পারি না, সারাক্ষণ শুধু চাল মারে, যেন কোথাকার খাঞ্জাখাঁ এলেন। এদিকে ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ, কোথায় কোন ফিকিরে কার কাছ থেকে কি হাতানো যায়, সর্বদা সেই তালেই আছে! আর আমাদের পেছনে সারাক্ষণ লাগবে। বড়মামা একটা গোটা গল্প বলে দেবেন, সে ওর সইবে কেন? অমনি বলে বসল—'ও আর এমন কি? কথায় বলে পুকুর-চুরি, তা—আমাদের ওতরপাড়ার কাছে পুকুর-চুরি ঠিক না হলেও গোটা একটা বাড়ি যে চুরি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বুঝলেন বড়দা, ওতরপাড়ার ব্যাপারই আলাদা। এই যুদ্ধের সময় একেবারে গঙ্গার ধারে বাঁশবনের জমিদারের তিন পুরুষের পুরনো বাড়িটা, দশবছর খালি থাকবার পর ভাড়া হয়ে গেল। চমৎকার লোক গোপেনবাবু, ব্যবসা করে মেলা টাকা করেছেন। বাগবাজারে জমিদারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনবছরের জন্য বাড়ি

ভাড়া নিয়ে, দেখতে দেখতে রঙ-টঙ করে, জঙ্গল সাফ করিয়ে তার ভোল বদলে দিলেন। লোকটিও ভারি অমায়িক, দেখতে দেখতে পাড়ার একটি মাতব্বর হয়ে উঠলেন। স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট, দুর্গা-পুজো কমিটির পাণ্ডা, কথায় কথায় পাঁচ টাকা চাঁদা ফেলে দেন, দশ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে দেন। গিন্নিও খাসা লোক, সকলের মুখে তাঁদের প্রশংসা ধরে না।"

গুপে এই অবধি বলতেই আমরা বললাম, "আরে তুই কি করে গয়না বাঁচালি তাই বল-না।" রাগে গর্ গর্ করতে করতে গুপে বলল, "আরে গোড়া থেকেই শোন্-না। বুঝলি তার পর বঙ্কুদা বলতে লাগল— 'মাসকাবারে গোপেনবাবু নিজে বাগবাজারে গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসেন। সেখানেও তাঁর ভারি খাতির। শেষে একদিন পাড়ার ক্লাবে বললেন, 'বাড়িটা কিনেই ফেললাম হে, একেবারে সের দরে ইঁট কাঠ বেচে, নতুন করে বাড়ি ফাঁদব, কি বলেন? সবাই মহা খুশি। দেখতে দেখতে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল। দশহাজার টাকা দিয়ে গোপেনবাবু পোড়োবাড়ি বেচে দিলেন, চমৎকার সব পুরনো কাঠের কড়ি বর্গা, দরজা জানলা, সস্তাই হল। কন্ট্রাক্টর পাড়ারই লোক, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল দুমাসের মধ্যে বাড়ি ভেঙে লোহালক্কড় ইঁটকাঠ সরিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে উনি নিজে গিন্নিকে নিয়ে বদ্যিনাথে হাওয়া বদলাতে যাবেন। ফিরে এসে যা লেখাপড়া দরকার সব হবে।'

"দশহাজার টাকা নিয়ে গোপেনবাবুরা বদ্যিনাথ গেলেন। ইতিমধ্যে কন্ট্রাক্টর বাড়ি চেঁছেপুছে নিয়ে গেল। এমনি সময় একদিন স্বয়ং জমিদারবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। কি সর্বনাশ, বাড়ি কোথায় গেল? আর বাড়ি কোত্থেকে আসবে? গোপেনবাবুও একেবারে নিখোঁজ।

"বঙ্কুদা গল্প শেষ করে একটিপ নস্যি নিল। এমন সময় মামাদের সরকারমশাই বড় একটা লাল শালুর পুঁটলি এনে বড়মামার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ধরুন, সিন্দুকে তুলুন, এর মধ্যে দশহাজার টাকার গয়না আছে।' বড়মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওমা, তাই তো। এই গুপে, যা তো বাবা, এই পুঁটলিটা তোর বড়মামিমাকে দিয়ে আয় এখনই সিন্দুকে তুলে ফেলুক।' গেলাম ছুটে। বড়মামিমা ছোটখুকিকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই অর্ধেক ঘুমুচ্ছেন। সিন্দুকের চাবি আমাকে

দিয়ে বললেন,—'তুমি তো বাবা সিন্দুক খুলতে জানো, তুলেই রাখো না, লক্ষ্মীসোনা !'

"পরদিন সকালে মহা হৈ-চৈ ! ঐ অত বড় লোহার সিন্দুক, রাতা-রাতি তাকে কে খুলে ফেলেছে, দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে, ভিতরে খালি ! কান্নাকাটি, রাগারাগি লেগে গেল। বড়মামা পুলিসে খবর দিতে যাবেন বলে চটি পায়ে দিচ্ছেন, বঙ্কুদা, ছোটমামা সবাই চেঁচামেচি করছেন ; এমনি সময় আমি গুটিগুটি গিয়ে বড়মামার হাতে লাল সালুর পুঁটুলি ও সিন্দুকের চাবিগাছি দিলাম।

" 'এ্যাঁ, এ কোথায় পেলি ?'

" 'ইয়ে—ওটাকে আমার লেপের মধ্যে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিনা।' বড়মামিমা দরজার কাছ থেকে বললেন, 'সেকি রে, সিন্দুকে তুলিস নি নাকি ?...'

"আমি কিছু বলবার আগেই, বড়খুকিটা এমনি পাজি, বলে উঠল—'হ্যাঁ, ও একা-একা গিয়ে সিন্দুকে তুলল আর কি ! ভূতের ভয় নেই ?' বড়মামা-টামা সবাই হো হো করে হাসতে লাগলেন। শুধু বঙ্কুদা চাপা গলায় বলল—'ইডিয়ট ! কোনো কিছুর জন্য যদি নির্ভর করা যায় ! স্টুপিড্ কোথাকার !' "

নতুন ছেলে নটবর

সেই ছেলেটা প্রথম যেদিন মাস্টারমশাইয়ের পিছন পিছন ক্লাসে ঢুকল, গায়ে নীল ডোরাকাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফপ্যান্ট, চুলগুলো লম্বা হয়ে নোটানোটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তেল-চুক্‌চুকে আহ্লাদে-আহ্লাদে বোকা মতন ভাবখানা—দেখেই আমার গায়ে জ্বর এল ! আবার আমোদও লাগল, একে নিয়ে বেশ একটু রগড় করা যাবে মনে করে।

ছেলেটার পায়ে ফিতে দেওয়া কালো জুতো একটু কিচ্‌কিচ্ করছিল, তাইতে নগা তাকে শুনিয়ে বলল, "জুতোর দামটা বুঝি আসছে মাসে দেওয়া হবে ?"

ছেলেটা কিন্তু কিছু না বলে খাতা পেনসিল নিয়ে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে চুপ করে বসল। মাস্টারমশাই বললেন, "ওহে নটবরচন্দ্র, বছরের মাঝখানে এয়েচো, ভালো করে পড়াশোনা কোরো।" নাম শুনে আমরা তো হেসেই কুটোপাটি, নগা তক্ষুনি তার নাম দিয়ে ফেলল—'লটবহর'। সত্যি নগার মতন রসিক ছেলে খুঁজে পাওয়া দায়!

টিফিনের সময় নটবরচন্দ্র একটা ছোট্ট বইয়ের মতন টিনের বাক্স খুলে লুচি আলুর দম খেয়ে, হাত চাটতে চাটতে বার বার আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাই-না দেখে নগা বললে, "কি রে ছোঁড়া, মানুষ দেখে বুঝি অভ্যেস নেই?"

আমরা তাগ করেছিলাম, চটেমটে ছেলেটা কী করে দেখব। ছেলেটা কিন্তু খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখে হাত দিয়ে বিশ্রীরকম ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হাসতে লাগল। নগা রেগে বলল—"অত হাসির কথা কি হল শুনতে পারি?"

ছেলেটা অমনি নরম সুরে বলল—"কিছু মনে কোরো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয় নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজোমামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কেবল ঐ ওকে ছাড়া"—বলে আমাকে দেখিয়ে দিল।

নগারা রেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল, আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না, অল্প হেসে জিগ্‌গেস করলাম—"আর আমাকে দেখে কিসের কথা মনে হচ্ছে?"

সে অম্লানবদনে বললে—"মুলতানী গোরুর কথা।" ভীষণ রাগ হল। ভাবলাম ছোটবেলা থেকে এই যে শ্যামবাবুর কাছে স্যাণ্ডো শিখেছি সে কি মিছিমিছি! তেড়ে গিয়ে এইসা এক প্যাঁচ কষে দেবার চেণ্টা করলাম যে কি বলব! সে কিন্তু কি একটা ছোটলোকি কায়দা করে এক সেকেণ্ডে আমাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক তক্ষুনি ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, নইলে বিষম সাজা দিতাম।

ক্লাসের পর বাড়ি যাবার পথে তার জন্য ওৎ পেতে রইলাম, আমি আর একটা ছেলে। দেখা হতেই সে হাসিমুখে বলল, "কি হে, চীনাবাদাম খেতে আপত্তি আছে?" আমরা আর কি করি, একেবারে তো আর অভদ্র হতে পারি না, তাই চীনাবাদাম নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম—"দ্যাখ্, নতুন ছেলে এসেছিস, নতুন ছেলের মতো থাকবি,

আজ দয়া করে তোর চীনাবাদাম খেলুম বলে মনে করিস না যে দুপুরের কথা ভুলে গেছি।”

সে বললে, “রাগ কোরো না ভাই। আমি যদি জানতাম অমন হোঁতকা শরীর নিয়েও তুমি এমন ল্যাদাড়ে তবে কি আর কষ্ট করে জনসোনিয়ান প্যাঁচ লাগাতাম, এই এমনি দুআঙুলে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতাম।” এই বলে আমাকে কি একটা কায়দা করে চিৎপাত করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সে তো হাওয়া! এর থেকেই বোঝা গেল সে কী ভীষণ ছেলে! সারারাত মাথা ঘামিয়েও তাকে জব্দ করার উপায় দেখলুম না। পরদিন সকালে ছোটমামা বললে, “কি রে ভোঁদা মুখ শুকনো কেন? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? রোজ বলি অত খাস নি।” যা বুদ্ধি এদের! বললুম—“যে বিষয়ে কিছু বোঝ না, সে বিষয়ে কিছু বলতে এসো না।”

নটবরকে না পারতে পারি, তাই বলে যে অন্যদেরও এক কথায় চুপ করিয়ে দিতে পারি না, এ কথা যেন কেউ মনে না করে। হাবুটার কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। নিজের বেলা তো খুব বুদ্ধি খোলে, কিন্তু আমি যখন সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম সে উলটে বললে, “তুই আর তোর নগা না বগা, দুটি মানিকজোড়! আমার কাছে যে বড় পরামর্শ চাইতে এসেছিস! ওরে ছোঁড়া, আগে পরামর্শ নেবার মতন একটু বুদ্ধি গজা!”

নাক সিঁটকে চলে এলুম। হ্যাঁ! পরামর্শ আবার কি! মেয়েদের সঙ্গে আবার পরামর্শ! জানো কেবল হি হি করে হাসতে আর কালো গায়ে লাল জামা চড়িয়ে সঙ সাজতে! সাধে কি মুনি-ঋষিরা ওদের বিষয় ঐ-সব লিখে গেছেন!

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফার্স্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাস্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল! বোকার মতন মুখ করে থাকলে সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। পড়ত ওর ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো, তবে দেখা যেত! যাই হোক, একদিনেই নাম করবার তার এমন কিছু তাড়াহুড়ো ছিল না।

নগা বলল—“ব্যাটা খোশামুদে!”

ছেলেটা শুনে বলল, “ছিঃ, হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে।”

রাগে নগা হাতের মুঠো খুব তাড়াতাড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে লাগল। গেল বছর যদি ওর টাইফয়েড না হত নিশ্চয় সেদিন একটা কিছু হয়ে যেত।

এমনি করে কদ্দিন যেতে পারে! শেষটা একদিন গবুই এক বিষম ফন্দি বার করল। গবুটা দেখতে রোগা পট্‌কা, আর প্রত্যেক পরীক্ষায়, প্রত্যেক বিষয়ে লাস্ট হলে কি হবে, ছেলেটার খুব বুদ্ধি আছে। সেদিন ক্লাসে এসেই সে নগাকে কানে কানে কি বলল! তাই-না শুনে উৎসাহের চোটে নগা অঙ্কটঙ্ক ভুল করে কোণে দাঁড়িয়ে একাকার! তাতে বরং একদিক দিয়ে সুবিধেই হল, নগা কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মতলবটা দিব্যি পাকিয়ে নিল।

সেইদিনই টিফিনের সময় নটবরকে ডেকে নগা বলল, "ভাই নটবর, যা হবার তা হয়ে গেছে, একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, হেডমাস্টারকে তাই একটু সাহায্য করা চাই! তুমি ক্লাসের ভালো ছেলে, তুমি বললে দেখাবেও ভালো, তা ছাড়া তোমার মতন গুছিয়ে কেই-বা বলতে পারবে?"

নটবর খুশি হয়ে বলল—"তা তো বটেই! ক্লাসের অর্ধেক ছেলে তোতলা, আর বাকিগুলো একেবারে গবুচন্দ্র।"

নগা আশ্চর্যরকম ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বলল—"তা, তুমি গিয়ে তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবে যে তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে তুমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সাহায্য করতে চাও। এই একটু সম্মান দেখাবার জন্য আর কি! বুঝলে তো? ভালো করে বুঝিয়ে বোলো, এই কাল ওঁর বাবা মারা গেছেন কি না।"

নটবর হাঁ করে শুনে বলল—"আহা, তাই নাকি? তোমরা ভেবো না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করে থাকলে ফল টের পাবে।" বলে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেল। তার ঐ 'টের পাওয়া'র কথাটা আমার ভালো লাগল না। 'টের পাওয়া' বলতে আমরা অন্য মানে বুঝি। সে যাই হোক গে। ক্লাসের ঘণ্টা পড়বামাত্র নটবর ছুটতে ছুটতে এসে বলল—"হেডমাস্টার রাজি হয়েছেন। তোমাদের কজনকে এক্ষুনি ডেকেছেন কি সব কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তোমরা কি করে জানলে তাও জিগ্‌গেস করছিলেন। মনে হল খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা এক্ষুনি যাও।"

আমরা প্রথম তো অবাক! শ্রাদ্ধের কথাটা গবুর সম্পূর্ণ বানানো।

'কি, ব্যাপার কি তোমাদের ? ক্লাস নেই নাকি, এখানে যে বড় দঙ্গল বেঁধে এসেছ ?''

কোথায় নটবর ইয়াকি দেবার জন্য মার খাবে, না সত্যি হেডমাস্টারের বাপের শ্রাদ্ধ! এরকম কিন্তু আরো হয়। আমি একবার একটা অচেনা ছেলেকে মজা দেখাবার জন্য বলেছিলাম, "কি হে, চাটগাঁ থেকে কবে এলে?" সে বলল—"কাল এলাম, তুমি কি করে জানলে?" আমি অবিশ্যি আর কিছু ভেঙে বলি নি।

যাই হোক, আমরা তো গেলাম! দেখলাম হেডমাস্টার গোমড়া মুখ করে ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেদের ইংরেজি খাতায় লাল পেনসিলের দাগ কাটছেন। আমাদের খেঁকিয়ে বললেন—"কি ব্যাপার কি তোমাদের? ক্লাস নেই নাকি, এখানে যে বড় দঙ্গল বেঁধে এসেছ?"

নগা গলা পরিষ্কার করে বলল—"আজ্ঞে, আপনার বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। এই আমরা"—এইটুকু বলতেই হেডমাস্টারের এক ভীষণ পরিবর্তন হল। মুখটা লাল হয়ে বেগুনি হল, হাতের পেনসিলের মোটা সীস মট্ করে ভেঙে গেল, গোঁফ-চুল সব খাড়া হয়ে গেল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তার চোটে শার্টের গলার বোতাম ফট্ করে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিরকম একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলাম, এবার হঠাৎ বিকট সন্দেহ হল। নটবর আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। হেডমাস্টার ডাকেন নি। সে হয়তো দেখাই করে নি! হেডমাস্টার গর্জন করে উঠলেন, জানলার খড়খড়ি কেঁপে উঠল। আমরা ছিট্‌কে বাইরে এসে পড়লাম, তিনি ফেলে দিলেন কি আমরাই পালিয়ে গেলাম, আজও ঠিক জানি না। কাঁপতে কাঁপতে ক্লাসে ঢুকেই শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নটবরকে বলছেন, "সে কি নটবর, হেডমাস্টারের ভাইপো তুমি, সে কথা এদ্দিন বল নি!"

নটবর বলল—"বাবা বলেন ও সম্পর্কটা কিছু ঢাক পেটাবার মতো নয়। তা ছাড়া ইস্কুলটা বাজে। এইমাত্র কাকাকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি তো রেগে কাঁই!"

এমন সময় দারোয়ান এসে বলল, "গবুবাবু আর ভোঁদাবাবুকে বেত খেতে হেডমাস্টারবাবু ডাকছেন!"

তাই শুনে পণ্ডিতমশাইও বললেন—"আর হ্যাঁ, বেত খেয়ে এসে আধ ঘণ্টা বেঞ্চে দাঁড়াবে, লেট করে ক্লাসে এসেছ!"

তাই বলি পৃথিবীটাই অসার!

লাল নীল মাছ

ক্যাবলাদের বাড়ির পুকুরে কোথায় এক গোপন জায়গায় সেই লাল নীল মাছটা ডিম দিয়েছিল।—জানত শুধু লাল নীল মাছ আর শংকর মালী। ব্যাঙরা তাকে খুঁজে পায় নি। হাঁসরা তাকে খুঁজে পায় নি। ক্যাবলা যেদিন শংকর মালীর কাছে খবর পেল সেইদিনই পুকুরপাড়ে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু সেও খুঁজে পায় নি। দেখল ব্যাঙরা ডিম খুঁজে খুঁজে পুকুরের নীল জল ঘুঁটে ঘোলাটে করে দিয়েছে, হাঁসরা পদ্মফুলের মধ্যে প্যাতপেতে চামড়াওয়ালা ঠ্যাং চালিয়ে শেকড় বাকল পর্যন্ত তুলে এনেছে, কিন্তু ডিমের কোনো পাত্তাই নেই। বুড়ো হাঁসখুড়ো বলেছিলেন—"চোখ রাখিস, তা দেবার সময়ে ক্যাঁক্ করে ধরিস।" কিন্তু সকাল সন্ধে লাল নীল মাছটাকে গোমড়া মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল, তা দেবার নামটি করল না। সারা দুপুর মাছটা এখানে এক কামড় শেকড়, ওখানে দুটো কিসের দানা খেয়ে বেড়াল, তা দেবার গরজই নেই।

হাঁসরা তো রেগে কাঁই! "আরে মশাই, আমরা ডিম দিলে ভর-সন্ধে তার ওপর চেপে বসে থাকি! ত্রিসীমানায় কেউ এলে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে তেড়ে যাই, আর এ দেখি দিব্যি আছে!"

ব্যাঙরা তাগ করে থেকে থেকে শেষটা ঝিমিয়ে এল। হাঁসরা ম্যাদা মেরে গেল, ক্যাবলাও দু-তিন দিন ঘুরে গেল।

শংকর মালীকে অনেক পেড়াপীড়ি করাতে সে বলল—"অ রাম-অ! সে বলিবাকু বারণ-অ অছি!"

ক্যাবলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, লাল নীল মাছটা ছোট-ছোট ডানিওয়ালা পোকা ধরে কপাকপ্ গিলছে দেখল। কি মোট্কা মাছ বাবা। পাঁজরের একটা হাড় গোনা যায় না।

ক্যাবলার একটু দুঃখও হল, পগারের মধ্যিখানে কে জানে কোথায় ডিম ফেলে লোকটা দিব্যি মাকড়গুলো মেরে খাচ্ছে। কাল হোক, পরশু হোক, যেদিনই হোক, মেজোমামার মস্ত ছিপটা এনে এটাকে

ধরবেই ধরবে। বামুনদিদিকে দিয়ে দেবে, ঝোল রেঁধে খাবে, কাঁটাগুলো বিল্লিকে খাওয়াবে।

এ তো গেল ক্যাবলার কথা। এদিকে লাল নীল মাছটার ভাবগতিক দেখে পুকুরের আর সবার গা জ্বলছে। শংকর মালী ভাত দিলেই ও তেড়েমেড়ে আগেভাগে গিয়ে সব সাফাই করে দেয়। হাঁসরা সময় মতো উপস্থিতই হতে পারে না, ব্যাঙরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলল, তবু সে গ্রাহ্যই করে না!

শেষটা একদিন চাঁদনি রাতে লাল নীল মাছের ডিম ফুটে ছোট একটা ছানা বেরুল। শংকর মালী জানত তাই দেখতে পেল কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। আর ক্যাবলা তো ছিপই পায় না, মেজোমামা সেটাকে ডালকুত্তোর মতন পাহারা দেন।

ছোট মাছটার কথা কেউ জানতে পারল না। পদ্মফুলের বোঁটায় ছোট-ছোট দাঁতের দাগ কারো চোখেই পড়ল না। ব্যাঙাচিগুলোকে কে যে একা পেলেই ভয় দেখায়, ব্যাঙাচি বেচারাদের বোল ফোটে নি, তারা বলতে পারল না, তারা কেবল দিন-দিন ভয়ের চোটে আমসির মতন শুকিয়ে যেতে লাগল। তাদের ল্যাজগুলো খসে যাবার অনেক আগেই নারকোল-দড়ি হয়ে গেল।

এমনি করে আরো কদিন গেল। তার পর বিকেলবেলায় ক্যাবলা ছিপ ছাড়াই পুকুরপাড়ে চলল। পথে দেখল ওদের তালগাছ থেকে সর্‌সর্‌ করে কি একটা যেন নামছে, তার ঠ্যাং দুটো দড়ি দিয়ে এক-সঙ্গে বাঁধা, পাঁচু ধোপার গাধার মতন, তার কোমরে দুটো হাঁড়ি ঝোলানো! ক্যাবলা ভাবছিল লোকটাকে দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না, সট্‌কান দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় লোকটা তাকে ডাকল।

ক্যাবলা দেখল হাঁড়ির ভিতর সাদা ফেনা, তার গন্ধের চোটে ভূত ভাগে। লোকটা ক্যাবলার সঙ্গে অনেক কথা বললে, লাল নীল মাছের কথা শুনে, কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে গেল। বলল ছিপের কি দরকার? ছোটবেলায় তারা নাকি কাপড় দিয়ে কচি কচি মাছ ধরত। এখনো ছুটির দিনে সাঁওতালরা দল বেঁধে কোপাই নদীতে মাছ ধরে।

তাদের ছিপ নেই, মাঝখানে ফুটো ধামার মতন জিনিস দিয়ে গপাক্ গপাক্ চাপা দিয়ে দিয়ে ধরে। কাছাড়ের কাছে কোথায় পাহাড়ী নদীতে রাত্রে নাকি জাল বেঁধে রাখে এপাড় থেকে ওপাড়, সকালে দেখে তাতে কত মাছ, ছোটগুলো ছেড়ে দেয় আর বড়গুলো ধরে নিয়ে যায়।

লোকটা এমনি কত কি বলল। যাবার সময়ে বলে গেল হাঁড়ির কথা যেন কাউকে না বলে।

সে চলে গেলে ক্যাবলা কাপড়ের খুঁট বাগিয়ে ঘটম্যাক্ ঘটম্যাক্ করে জলের দিকে চলল। আজ মাছ ব্যাটাকে কে রক্ষা করে?

এমন সময় টুপ্ করে জল থেকে মাছের ছানা মুণ্ডু বের করে বিষম এক ভেংচি কাটল। ওরে—বাবা রে, সে কি মেছো ভেংচি! ক্যাবলা তো শাঁই শাঁই ছুট্ লাগাল, আর হাঁসরা ব্যাঙরা কে যে কোথায় ভাগল তার পাত্তাই নেই!

সন্ধেবেলা শংকর মালী যখন ওদের জন্য ভাত আনল, দেখল কেউ কোথাও নেই, খালি লাল নীল মাছ আর সবুজ ছানা পাশাপাশি বসে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হাসছে।

গুপের গুপ্তধন

ও পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলে ফিরতে বড্ড সন্ধে হয়ে গেল। আমি আর গুপে দুজনে অন্ধকার দিয়ে ফিরছি খেলার গল্প করতে করতে, এমন সময় গুপে বলল—"ঐ বাঁশঝাড়টা দেখেছিস?" বললুম "কই?" সে বললে, "ঐ যে হোথা। মনে হয় ওখানে কি একটা লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল, না?"

গুপের দিকে তাকালুম, এমন সময়ে এমন কথা আশা করি নি।

আমি বললুম, "গুপে, তুই কিছু খেয়েছিস নাকি?"

গুপে বলল, "চোখ থাকলেই দেখা যায়, কান থাকলেই শোনা যায়।" আমি বললুম, "নিশ্চয়ই। মাথা না থাকলে মাথা-ব্যথা হবে কি করে?" গুপে বলল, "তুই ঠিক আমার কথা বুঝলি না! দেখবি চল্ আমার সঙ্গে।"

বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। পেঁচোর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেও সন্ধেবেলা মাছ কিনে ফিরছে, বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময় কানের কাছে শুনতে পেল, "পেঁ-চোঁর মাঁ, মাঁছ দেঁ!" পেঁচোর মা হন্‌হনিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু সেও সঙ্গে চলল— "দেঁ বঁলছি, মাঁছ দেঁ।"

গুপে ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোমহর্ষণ সিরিজের বিকট বই পড়ত। আমায় একটা দিয়েছিল, তার নাম 'তিব্বতী গুহার ভয়ংকর' কি ঐ ধরনের একটা কিছু। আমায় বলেছিল, "দেখ্‌, রাত্রে যখন সবাই ঘুমুবে, একা ঘরে পিদিম জ্বেলে পড়বি। দেয়ালে পিদিমের ছায়া নড়বে, ভারি গা শির্‌শির্‌ করবে, খুব মজা লাগবে।" আমি কিন্তু একবার চেষ্টা করেই টের পেয়েছিলুম ওরকম মজা আমার ধাতে সইবে না। আজ আবার এই!

গুপে বলল, "কি ভাবছিস? চল্‌ দেখি গিয়ে। বাবার কে এক বন্ধু একবার দিল্লীতে একটা সেকেলে পুরনো বাড়িতে একটা শুকনো মরা বুড়ি আর এক ঘড়া সোনা পেয়েছিলেন। দেখেই আসি-না। হয়তো গুপ্তধন পোঁতা আছে। যক্ষ পাহারা দিচ্ছে।" তারার আলোয় দেখলুম, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। তাই দেখেই আমার ভয় করতে লাগল—আবার বাঁশঝাড়ের যক্ষ!

কিন্তু কি করি, গুপেটা আঠালির মতন লেগে রইল। অগত্যা দুজনে অন্ধকার ঘন ঝোপের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে চললুম। গুপে আবার কি একটা মস্তকহীন খুনীর গল্প করল। কবে নাকি কোন পুরনো ডাকবাংলোয় কেউ রাত কাটাতে চাইত না। লোকে বলত, যারাই থেকেছে রাতারাতি মরে গেছে। কেউ কিছু ধরতে পারে না! বাবুর্চি বলে, "হাম তো মুরগি পকাকে আউর পরটা সেঁককে সাবকো খিলাকে ঐ হামারা কোঠি চালা গিয়া। রাতমে কভি ইধার আতা নেই, বহুত গা ছম্‌ছম্‌ করতা, আউর যো সব কাণ্ড হোতা যো মালুম হোতা আলবত্‌ শয়তান আতা হ্যায়।"

শেষে কে এক সাহসী, মস্ত এক কুকুর নিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে বসে রইল, কি হয় দেখবে। কোথাও কিছু নেই, ঘর-দোর ঝাড়াপোঁছা পরিষ্কার। আশ্চর্য, দেওয়ালে একটা টিকটিকি কি ঘুমন্ত মাছি অবধি নেই! অনেক যখন রাত, লোকটা আর জেগে থাকতে পারছে না,

দেশলাই বের করেছে, সিগারেট খাবে, কুকুরটাও ঝিমোচ্ছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও কমে এল…

গল্প বলতে বলতে আমাদের চারি দিকের আলোও কমে এসেছিল, আর গুপের স্বর নিচু হতে হতে একেবারে ফিস্‌ফিসে দাঁড়িয়েছিল। আর তার চোখ দুটো আমার কপাল ছ্যাঁদা করে ভিতরের মগজগুলোকে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

আমার গলা শুকিয়ে এল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল। নিশ্চয়ই মূর্ছা যেতাম, তার পর সেখান থেকে টেনে আনো রে, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি সামনেই বাঁশঝাড়। দেখে থমকে দাঁড়ালুম, অন্য একটা ভয় এসে কাঁধে চাপল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে স্পষ্ট শুনলুম, খপ্‌খপ্ শব্দ—যেন বুড়ো সাপ নিবিষ্ট মনে একটার পর একটা কোলাব্যাঙ গিলে খাচ্ছে।

গুপের দিকে তাকালুম, জায়গাটার থম্‌থমে ভাব নিশ্চয়ই সেও লক্ষ্য করেছে। তার মুখটা অন্ধকারে সাদা মড়ার মতন দেখাচ্ছিল। জায়গাটাতে হাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না।

আমার মনে হতে লাগল—আর কখনো কি বাড়ি যাব না? পিসিমা আজ মালপো ভেজেছেন। সে কি দাদা একা খাবে? মাস্টার-মশাইও এতক্ষণে এসে বসে রয়েছেন, হয়তো শক্ত শক্ত অঙ্ক ভেবে রাখছেন। গুপেটা কেন জন্মেছিল?

গুপে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলল, "চল্ কাছে যাই।" বাঁশঝাড়-গুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তারারি আলোয় মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁকা। আশেপাশে ঘন বিছুটি পাতা, সে জায়গাটা শুকনো ঘাসে ঢাকা। থেকে থেকে দু-একটা বুনো কচুগাছ, বিষম ভুতুড়ে গাছ।

তার পর চোখ তুলে আর যা দেখলাম, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মনে হল ছেলেবেলায় একবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি ঘরের আলো নিবে গেছে, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার আর তার মধ্যে খস্‌খস্ শব্দ, যেন কিসে বসে বসে শুকনো কিসের ছাল ছাড়াচ্ছে। এত কথা মনে করবার তখন সময় ছিল না, কারণ আবার ভালো করে দেখলাম দুটো সাদা জিনিস, মানুষের মতন, কিন্তু মানুষ তারা হতেই পারে না। জায়গাটা

যে শাঁকচুন্নির আস্তানা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। স্পষ্ট একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধও নাকে এল। অন্ধকারে দেখলাম দুটো খুব লম্বা আর খুব রোগা কি, আপাদমস্তক সাদা কাপড় জড়ানো, মাথায় অবধি ঘোমটা দেওয়া, নড়ছে চড়ছে। দেখলাম তাদের মধ্যে একজন ছোট্ট কোদাল দিয়ে নরম মাটি অতি সাবধানে খুঁড়ছে, অন্যজন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল জ্যাঠামশাই একবার কলকাতায় পুরনো চক-মেলানো বাড়িতে ছিলেন, সেখানে একদিন দুপুর রাতে দিদিরা ভূত দেখেছিল—কলতলায় গোছা গোছা বাসন মাজছে। তার পর থেকেই তো ছোড়দির ফিটের রোগ। কিছুই না, ভূতের কুদৃষ্টি!

আবার তাকিয়ে দেখি খোঁড়া শেষ হয়েছে, গভীর গর্ত মনে হল! এতক্ষণ অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। ঘাড়ে মশা কামড়াচ্ছিল, চুলের মধ্যে কাঠপিঁপড়ে হাঁটছিল, আর পা বেয়ে কি একটা প্রাণপণে উঠতে চেষ্টা করছিল। গুপের পাশে তো অনেকক্ষণ থেকে একটা গো-সাপের বাচ্চা ওৎ পেতে বসেছিল। গুপে দেখছিল না, আমি কিছু বলছিলাম না। ওকে কামড়াক, আমার ভালোই লাগবে।

সেই সাদা দুটো এবার উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা ভারী জিনিস অন্ধকার থেকে টেনে বের করল। গর্তের পাশে একবার নামাল, মনে হল, ছালায় বাঁধা—মাগো কি!

একটা নতুন কথা মনে করে ভয়ে কাদা হয়ে গেলাম! এরা হয়তো ভূত নয়, খুনী ডাকাত, কাকে যেন মেরে ছালায় বেঁধে গভীর অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে নিরিবিলি পুঁতে বাড়ি চলে যাবে। কেউ টের পাবে না।

ভাবলাম নিঃশ্বাস অবধি বন্ধ করে থাকি। তারা এদিকে কালো জিনিসটাকে পুঁতে এ ওর দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করে হাসতে লাগল, কালো মুখে সাদা লম্বা-লম্বা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। তার পর তারা অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সে সন্ধের কথা কাউকে বলতে সাহস হয় নি, বিশেষত গুপে যখন বাড়ির দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, "কাউকে বলিস না, বুঝলি? কাল আবার যাব, এর মধ্যে নিশ্চয় সাংঘাতিক কোনো ব্যাপার জড়িত আছে।"

আমি কথা না বলে মাথা নাড়লাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না জ্যান্ত বাড়ি ফিরছি!

পরদিন মনে করলাম আজ কিছুতেই গুপের কাছে যাব না। এ তো ভারি আহ্লাদ! উনি সখ করে আগাড়ে বাগাড়ে ভূত তাড়িয়ে বেড়াবেন আর আমায় ওঁর সঙ্গে ঘুরে মরতে হবে! কেন রে বাপু! শাঁকচুন্নি যদি অতই ভালো লাগে—একাই যা-না। আমায় কেন? অনেক করে মন শক্ত করে রাখলুম, আজ কোনো মতেই যাব না। এমন-কি, মেজদাদামশায়ের বাড়ি চণ্ডীপাঠ শুনতে যাব, তবু বাঁশঝাড়ে যাব না।

সারাদিন গুপের ত্রিসীমানায় গেলুম না। ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসলুম। টিফিনের সময় পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে ব্যাকরণ বুঝতে গেলুম। এমনি করে কোনোমতে দিনটা কাটল। কিন্তু বাড়ি ফেরবার পথে কে যেন পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিল! আঁতকে উঠে ফিরে দেখি গুপে! সে বলল—"মনে থাকে যেন সন্ধেবেলা!"

হঠাৎ বলে ফেললুম, "গুপে, আমি যাব না।"

সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "ও বুঝেছি, ভয় পেয়েছিস। তা তুই বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শোন্ গে, আমি কেলোকে নিয়ে যাব। তোর চেয়ে ছোট হলেও তার খুব সাহস!"

বড় রাগ হল, বললুম, "ওরে গুপে, সত্যিই কি ভয় পেয়েছি, ঝোপ-জঙ্গলে সাপখোপের বাসা তাই ভাবছিলুম। আচ্ছা, নাহয় যাওয়াই যাবে।"

গুপে বলল, "তাই বল্!"

আবার চার দিক ঝাপসা করে সন্ধে এল। মাঠ থেকে ফিরতে গুপে ইচ্ছে করে দেরি করল। সূর্য ডুবে গেল, আমরাও বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা হলুম। আজ আমি প্রাণ হাতে নিয়ে এসেছি, মারা যাব তবু শব্দটি করব না; বাঁশঝাড়ের কাছে এসেই গা কেমন করতে লাগল। সত্যিই জায়গাটাতে ভূতে আনাগোনা করে। এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে এই মশাওয়ালা বাঁশঝাড়ে আড্ডা গাড়বার আমি কোনো কারণ ভেবে পেলাম না।

আজ তারার আলো একটু বেশি ছিল, সেই আলোতে দেখতে পেলাম, তারা আবার এসেছে। ঠিক মানুষের মতন দেখতে, তবে পা উলটো কি না বুঝতে পারলাম না। মনে হল এদের উলটো হয়ে গাছে ঝোলা কিছুই আশ্চর্য নয়।

তারা এ ওর দিকে তাকিয়ে শকুনের মতন হাসতে লাগল। তার পর কোদাল বের করে ঠিক সেই জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। দম আটকে আসছিল। কে জানে কি বীভৎস ভোজের আশায় ওরা এসেছে! খুঁড়ে সেই কালো জিনিসটা টেনে তুলল, দেখলুম ছালা নয়, চিত্তির আঁকা কলসী! ভাবলুম গুপ্তধন।

তারা কলসীর মুখ খুলতেই আবার সেই দুর্গন্ধ! নিশ্চিত কিছু বিশ্রী জিনিস আছে ওর মধ্যে! কিন্তু তারা খাবার কোনো আয়োজন করল না।

একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট খুদির মায়ের গলায় বলল, "হ্যাঁলো বাগ্‌দীবউ, পদীপিসি ঠিকই বলেছিল, দেখ্‌-না বাঁশঝাড়ে পুঁতে সুঁটকিগুলো কেমন মজেছে!"

গুপে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শিউরে উঠল। বলল, "চল্‌, পৃথিবীতে দেখছি অ্যাড্‌ভেনচার বলে কিছু নেই!" আমি তৎক্ষণাৎ বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

গুপে বাড়ির কাছে এসে বলল, "কোথায় মড়া, কোথায় গুপ্তধন আর সুঁটকিমাছ! আর কারু কাছে কিছু আশা করব না।"

আমি কিন্তু ব্যাপারটাতে খুশি হলাম!

কিছু বললাম না, কেবল মনে মনে সংকল্প করলাম, 'খোক্কসের হাতে বরং পড়ব, তবু গুপের হাতে কখনো নয়।'

• বদ্যিনাথের বড়ি

কোন সকালে কলু কদ্দিন দেখেছে রাস্তার মধ্যিখানে লোহার গোল ঢাকনি খুলে খ্যাংরাকাঠির মতন গোঁফওয়ালা লোক, ছোট বালতি হাতে দড়িবাঁধা কালো ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে বসে থাকে। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কাদার ছিটে—অমুদা যখন দাড়ি কামাত না তখন তাকে যেমন দেখাত সেইরকম দেখায়। ছোট ছেলেটা হয়তো ওর ভাইপো হবেও-বা। ওর নাম হয়তো ছক্কু, ওর গায়ে মোটে কাপড় নেই, কিন্তু কানে সোনালি রঙের মাকড়ি, গলায়

মাদুলি বাঁধা। বুবু বলে নাকি সত্যি সোনার নয়; ওরা গরিব কিনা, খেতেই পায় না, ও পেতলের হবে। কলু আর বুবু ছাড়া ওদের কেউ দেখেই না। সামনে দিয়ে দেবরঞ্জনমামা, অমুদা, ননিগোপালরা সবাই চলে যায়, তাড়াতাড়ি কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ি—ওদের চোখেই পড়ে না। কিন্তু কলু দেখেছে লোকটা মাঝে মাঝে বালতি টেনেটুনে ওপরে তোলে, সেটা থাকে কাদায়-ভরা; সেই নোংরা কাদা রাস্তার পরিষ্কার ডাস্টবিনে ঢেলে আবার বালতি নামিয়ে দেয়। কাদা ছাড়া কখনো কিচ্ছু ওঠে না। কত কি তো হারিয়ে যায়, কিন্তু ওর ভেতর থেকে কিছু কক্ষনো বেরোয় না। দাদা বলেছিল বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে ওর সোজাসুজি যোগ আছে, ওর ভিতর কুঁদো কুমির ছেলেপুলে নিয়ে হুমো দিয়ে থাকে, কই বালতিতে তার ডিমটিম তো কক্ষনো পাওয়া যায় না।

দাদার ফাউন্টেন পেন হারিয়ে গেল; চিনুদার কবিতার খাতা হারিয়ে গেল; বদ্যিনাথের নতুন চটি হারিয়ে গেল গোরামামার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে; সেইদিনই আবার পাল-সাহেবের ছাতাও কোথায় হারিয়ে গেল; ছোড়দির চুড়ি ড্রেনের ভিতর তলিয়ে গেল, এত সব গেল কোথায়? তার কিচ্ছু মোটে কোথাও পাওয়াই গেল না। অথচ সেই লোক দুটো কত কাদা ওঠাল!

রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন, বুবু পড়ে না, কলু পড়ে।—রোজ রাত্রে, রবিবার ছাড়া। কলু কত সময়ে সেই দুজনের কথা ভাবে, সন্ধি-সমাস গোল হয়ে যায়, মাস্টারমশাই রেগে কাঁই! বলেন, "ওরে আহাম্মুক! আমার ছেলে বিধুশেখর তোর অর্ধেক বয়েসে তোর তিনগুণ পড়া শিখত।"

ছেলে বটে ঐ বিধুশেখর। তার কথা শুনে শুনে কলু তো হেদিয়ে গেল। সে কক্ষনো হাই তুলত না, কক্ষনো চেয়ারে মচ্‌মচ্‌ শব্দ করত না, কক্ষনো চটি নাচাত না। প্রথম প্রথম কলু ভাবত তা হলে সে বোধ হয় এত দিনে নিশ্চয় মরে গিয়েছে। কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন সে নাকি বিয়ে করে কোথায় পোস্টমাস্টারি করে।

একদিন বদ্যিনাথ কতকগুলো সাদা বড়ি এনেছিল। বলেছিল ওগুলো নাকি ছানা বাঁদরের রস দিয়ে তৈরি, কোন কবিরাজের কাছ থেকে এনেছে। নাকি অনেকদিন আগে মানুষদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিল, সেই বাঁদুরে রক্ত মানুষের গায়ে আছেই আছে, ঐ আশ্চর্য বড়ি

খেলে তাদের আবার বাঁদর হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—ঐ একরকম ধাত কিনা! কলু তার দুটো বড়ি চেয়ে রাখল, কাজে লাগতে পারে।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বহুদূরে, উনি তবু রোজ ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতেন। কী সখ বাবা পড়াবার! মাঝে মাঝে দাদারা এসে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ত, কলুকে শব্দরূপ মুখস্থ করতে হত। কলুর চোখ বুজে আসত, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করত, আর দাদারা শুধু কথাই বলত। কলু দড়িবাঁধা ছেলেটার কথা ভাবত, আর শুনতে পেত পাশের বাড়ির ছোট ছেলেরা খেতে বসে হল্লা করছে। আর ভাবত,, এমন অবস্থায় পড়লে মাস্টারমশাইয়ের ছেলে সেই বিধুশেখর কী করত!

এক-একদিন যেই পড়া শেষ হয়ে আসত, বাইরে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামত। মাস্টারমশাই হয়তো বাড়িতে ছাতা ফেলে আসতেন, আটকা পড়তেন।

কলু ব্যস্তভাবে বলত, "ছাতা এনে দিই, ভালো ছাতা?"

মাস্টারমশাই বলতেন, "না না, থাক্, থাক্। একটু বসে যাই।" কলু আবার সেই মচ্‌মচে চেয়ারটাতে বসত।

মাস্টারমশাই তাঁর ছোটবেলাকার অনেক গল্প বলতেন। তখন বাবাও নাকি ছোট ছিলেন, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন, পুজোর সময় কাদের বাড়ি যাত্রাগান হত, পালিয়ে গিয়ে শুনতেন। কলুর চোখ জড়িয়ে আসত, হাই তুলতে সাহস হত না; ভাবত এতক্ষণে সেই দড়িবাঁধাটা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। হাইগুলো মাথায় গিয়ে জমাট বাঁধত, চমকে জেগে যেত, শুনত মাস্টারমশাই বলছেন, "দে বাবা, ছাতাই দে। এ আর আজ থামবে না।"

কলু ছুটে ছাতা এনে দিত, মাস্টারমশাই চলে যেতেন আর কলুর ঘুমও ছুটে যেত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, মাস্টারমশাই বিধুশেখরের কথা বলছেন। সে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে কক্ষনো বায়স্কোপ দেখে নি, থিয়েটারে যায় নি, বিড়ি টানে নি, গল্পের বই খোলে নি। বলতে বলতে মাস্টারমশাই বললেন, "ওরে, চুপিচুপি দুটো পান সেজে নিয়ে আয় তো দেখি।"

কলু দৌড়ে গেল, পান দিল, চুন দিল, দুটো করে এলাচ-দানা দিল,

সেই আশ্চর্য বড়িও একটা করে পানের মধ্যে গুঁজে দিল

বড়ো-বড়ো সুপুরির কুচি দিল, আর সব শেষে কি মনে করে বদ্যিনাথের সেই আশ্চর্য বড়িও একটা করে গুঁজে দিল।

মাস্টারমশাই একটা পান তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন, একটা বইয়ের মতন দেখতে টিনের কৌটোতে ভরলেন। কলু তাক করে রইল। প্রথমটা কিছু মনে হল না—তার পর ভালো করে দেখল, মনে হল মাস্টারমশাইয়ের কপালের দিকটা কিরকম যেন লম্বাটে দেখাচ্ছে, থুতনিটা যেন ঢুকে পড়েছে, চোখ দুটোও কিরকম পিট্‌পিট করতে লাগল।

কলুর বুকের ভিতর কেমন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। মাস্টারমশাই বাড়ি যান না কেন? যদি হঠাৎ ল্যাজ দুলিয়ে হুপ্‌ করেন? এমন সময়ে বৃষ্টি থেমে গেল, মাস্টারমশাই ধুতির খুঁটটা কাদা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে গেলেন। কলু ভাবতে লাগল, কদিন আর ধুতির খুঁট? অন্য পানটা বিধুশেখর বোধ হয় আজ রাত্রে চেয়ে নেবে, তার পর সেই-বা ধুতি নিয়ে করবে কি!

পরদিন বিকেলে বই নিয়ে কলু অনেকক্ষণ বসে রইল, কিন্তু মাস্টার-মশাই এলেন না। সন্ধ্যাবেলা বাবা বললেন, "ওরে তোর মাস্টারমশাই যে হেডমাস্টার হয়ে বিষ্টুপুর চলে গেলেন।"

কলু ভাবল, বিষ্টুপুর কেন, কিষ্কিন্ধে হলেও বুঝতাম!

তার পর বহুদিন চলে গেছে। কলুর নতুন মাস্টার এসেছেন, তাঁর ছেলের নাম বিধুশেখর নয়, তাঁর ছেলেই নেই। তিনি কলুকে রোজ ফুটবলের, ক্রিকেটের গল্প বলেন—কিন্তু কলুর থেকে থেকে মনে হয়, অন্ধকারে ও বাড়ির পাঁচিলে দুটো কি ল্যাজঝোলা বসে আছে! একটার মুখ কেমন চেনাচেনা, অন্যটা বোধ হয় বিধুশেখর!

ভূতের ছানা

রাত যখন ভোর হয়ে আসে তখন ঐ তিন-বাঁকা নিমগাছটায় হুতুম প্যাঁচাটারও ঘুম পায়। নেড়ু দেখেছে ওর কান লোমে ঢাকা, ওর চোখে চশমা, ওর মুখ হাঁড়ি। হুতুমটা কেন যে চিল-ছাদের ছোট খুপরিতে পায়রাদের সঙ্গে বাসা করে না, নেড়ু ভেবেই পায় না। বোধ হয় ভূতদের জন্যে। নিমগাছতলায় ভূত আছে। একদিন ভোরবেলায়, মই বগলে ছাগলদাড়ি লোকটা রাস্তার আলো নিবিয়ে নিবিয়ে চলে গেলে পর, নেড়ু দেখেছিল কোমরে রুপোর ঘুন্‌সি-ওয়ালা, মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল, ভূতদের ছোট কালো ছেলে নিমগাছতলায় কাঁসার বাটিতে নিমফুল কুড়চ্ছে। নেড়ুকে দেখেই ছেলেটা এক চোখ বুজে বগ দেখাল। নেড়ু ভাবল ভূত কিনা তাই ভদ্রলোক নয়।

তার পর অনেকদিন নেড়ু অনেক বেলা পর্যন্ত গাঁক্ গাঁক্ করে ঘুম লাগিয়েছে, শেষটা এমন-কি, ভজুদা এসে ঠ্যাং ধরে টেনে খাট থেকে নামিয়েছে। নেড়ু কিন্তু একটুও রেগেমেগে যায় নি। ও তো আর সুকুমারদা নয় যে মুখ দেখলে বালতির দুধ দই হয়ে যাবে! কিন্তু সেই ছানাটাকে আর দেখা হয় নি।

শেষটা হঠাৎ একদিন নেড়ু স্বপ্ন দেখল কালো ছেলেটা ওকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে নাকের ফুটোয় কাগের নোংরা পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। রাগের চোটে নেড়ুর ঘুম ছুটে গেল। ইচ্ছে করল ছেলেটার মাথায় সুপুরি বসিয়ে লাগায় খড়ম! খানিক চোখ রগড়ে, জিব দিয়ে তালুতে চুক্‌চুক্ করে চুলকে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল মই বগলে সেই লোকটা। তার পর নিমতলার তাকিয়ে দেখল, ভূতের ছানাটা একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে বেজায় হাসছে, যেন কালো ভাল্লুক মুলো চিবোচ্ছে। সে কি বিশ্রী হাসি। গোটাকতক সুট্ লাগালে হয়।

ছেলেটা নেড়ুকে দেখে আজ আর বগ দেখাল না, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ভূতের ছেলে বাবা! বিশ্বাস নেই! নেড়ুর একটু ভয়

করছিল, ঘরের ভিতর এদিক-ওদিক একবার তাকাল। দেখে কিনা কুঁজোর পিছন থেকে একটা এয়া বড়া টিকটিকি মুণ্ডু বাড়িয়ে, ঘোলাটে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে ঘুরিয়ে আহ্লাদে আহ্লাদে ভাব করে টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌ করে আবার মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে নিল, কেমন যেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব। নেড়ুর ভারি রাগ হল। কি, ভয় পাই নাকি! নেড়ু আস্তে আস্তে নীচে গেল। দাঁত মাজল না। চোখ ধুল না। তাতে কি হয়েছে! সেই ছেলেটার তো নাকে সর্দি! নিমতলায় যাবার পথে দেখে দুই দিকে দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। কতকগুলো গোলগোল মতন, সেগুলো ধোপার মা দিয়েছে; আর কতকগুলো ঠ্যাংওয়ালা, সেগুলো ধোপার মায়ের মেয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিমতলায় গিয়ে দেখে ছেলেটা কোথায় যেন সট্‌কে পড়েছে। কি জানি ভোর হয়ে এসেছে, আলোটালো দেখে উবে গেল না তো!

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় নেড়ুর দাঁত ব্যথা করছিল, তাই লবঙ্গজল দিয়ে মুখ ধুয়ে জানলার উপর বসে ভাবছিল, আচ্ছা নেপাল খুড়োর কেনই-বা অমন সিন্ধুঘোটকের গোঁফ, আর বিধুদাই-বা কেন দিনরাত টিক্‌-টিক্‌ করেন!

এদিকে ওদের বাড়ির দারোয়ান কি যেন গাইছিল, মনে হচ্ছিল—

"নিমতলাতে আর যাব না,
কে-লো-ভূতে-র-কা-লো-ছা-না!"

হঠাৎ শুনল, "এইয়ো!" চমকে আর-একটু হলে ধুপুস্‌ করে পড়েই যাচ্ছিল! আবার শুনল, "এইয়ো!"

চেয়ে দেখে নিমতলার আবছায়াতে সেই ভূতের ছানাটা! নেড়ু গলা নামিয়ে হিন্দীতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'হাম শুনতে পাতা।'

ছানাটা আবার বাংলায় বললে—"সকালে কি পায় শেকড় গজিয়েছিল?"

নেড়ু বললে, "আমি তো গেলুম, তুমিই আলো দেখে চলে গেছিলে।"

ছেলেটা বললে, "দুৎ, আলো নয়, বাবাকে দেখে।"

নেড়ু ভাবল—কেন, বাবাকে দেখে চলে যাবে কেন? নেড়ু শুধু একবার বাবাকে দেখে চলে গিয়েছিল—সেই যেবার দারোয়ানের হুঁকো টেনেছিল। তাই জিগ্‌গেস করল—"হুঁকো টেনেছিলে?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বললে, "দুৎ। তার থেকে বিড়ি ভালো।"

"তোমার বাবা কি গাছে থাকেন?"

"দুৎ! থাকেন না, চড়েন। আমি অনেক তাগ করে থাকি, কিন্তু কক্ষনো পড়েন না!"

"তিনি কি প্যাঁচা?"

"দ্যুৎ—!" তার পর ছেলেটা একটা কথা বললে যেটা মা একদম বলতে বারণ করেছেন। নেড়ু বললে, "ছি!—আচ্ছা, তাঁর পা কি উলটোবাগে লাগানো?"

এবার ছেলেটা বেদম রেগে গেল। ভুরু কুঁচকে, ফোঁস্‌ফোঁস্‌ করতে লাগল, আর হাতটাকে ঘুঁষি পাকাতে আর খুলতে লাগল, যেন এই পেলেই সাবড়ে দেয়! তার পর কি ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে বললে—"ঐ যে মিস্ত্রীগুলো সারাদিন বাঁশের টং-এ চড়ে তোমাদের বাড়ির বিশ্রী জানলাগুলোতে তোমার গায়ের রঙের মতন বদ সবুজ রঙ লাগায়, ওদের একটা দড়ি-বাঁধা রঙের টিন, আর-একটা বড় চ্যাপটা রঙ লাগাবার জিনিস যদি আমাকে এক্ষুনি না এনে দাও তা হলে তোমাকে, তোমার বাবাকে, তোমার দাদাকে, আর তোমার মাকে কচুকাটা করব। তোমাদের ছোট-খুকিকে পানের মসলা বানিয়ে কচ্‌কচিয়ে চিবিয়ে খাব। তোমাদের মাসি-পিসি যে যেখানে আছে তাদের থেঁতলো করব। তোমাদের রুটি-ওয়ালা, ঘিওয়ালা, আর যা যা তোমরা রাখো সবকটাকে লম্বা-লম্বা ফালি করে ছিঁড়ে কাপড় শুকুবার দড়িতে ঝুলিয়ে সুঁটকিমাছ বানাব। আর তোমার যত বন্ধু আছে সবগুলোকে নুনজল দিয়ে কাঁচা কাঁচা গিলে খাব।"

বাপ্‌ রে, কি হিংস্র খোকা!

নেড়ু তাড়াতাড়ি একটা টিন আর দু-তিনটে বুরুশ তাকে দিয়ে এল। ছেলেটা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করে হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাতে নেড়ু শুনতে গেল ফিস্‌ফিস্‌ করে কারা কথা বলছে। কানে আঙুল দিয়ে শুনল, তবু মনে হল কে যেন বলছে—

'আছে—আছে নিম গাছে!'

নেড়ু ভাবলে, ওরে বাবা, কি আছে রে?—পান্তভূত? কবন্ধ? পিশাচ? স্কন্ধকাটা? গন্ধবেনে? শাঁকচুন্নি? পেতনি? প্যাঁন্তাখেঁচী?

নেড়ু তো নাক-মুখ ঢেকে রাম ঘুম লাগাল।

পরদিন সকালে নীচে যাবার সময় সিড়ির জানলা দিয়ে দেখে, রাস্তায় ও-বাড়ির কর্তা, এ-বাড়ির দারোয়ান, দাদা, বাবা, মন্টুর বাবা, দিনুদা, আরো কত কে। সবাই ঠ্যাং হাত ছুঁড়ে বেজায় চ্যাঁচাচ্ছে!

নেড়ু আরো দেখল রাস্তার সব বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে সবুজ রঙ দিয়ে নানানরকম চিত্তির করা, পাশের বাড়ির সাদা গেটটা ডোরা কাটা!

হঠাৎ নেড়ুর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় করল—সেই হিংস্র ছানাটা পথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে রঙের বুরুশ আর-এক হাতে রঙের টিন, এক কান ও-বাড়ির দারোয়ান ধরেছে, আর-এক কান এ-বাড়ির লছমনসিং। আর ছেলেটা জোরসে চেল্লাচ্ছে।

তার পর ভঁক্ ভঁক্ করে একটা মোটর ডাকল, আর পথ ছেড়ে সকলে চলে এলেন। লছমনসিংও কানে শেষ একটা প্যাঁচ দিয়ে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিল। তার পর ওদের বাড়ির দারোয়ান ওর হাত থেকে খাম্চা মেরে রঙের টিন আর বুরুশ নিয়ে গেল, হিন্দীতে আর বাঙলাতে বিড়্ বিড়্ করে কী সব বলতে বলতে, সুট্ মারতে মারতে ওদের বাড়ি দিয়ে গেল!

নেড়ু পাড়াসুদ্ধ সক্কলের সাহস দেখে এমন হাঁ হয়ে গেল যে দেখতেই ভুলে গেল ছেলেটার পা উলটোবাগে লাগানো কি না!

সর্বনেশে মাদুলি

পুজোর ছুটির পর যখন স্কুল খুলল, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম গুপে ডান হাতে মাদুলি বেঁধে এসেছে। কনুইয়ের একটু উপরে ময়লা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা চক্‌চকে এক মাদুলি। আমি ভাবলাম সোনার বুঝি, কিন্তু গুপে পরে বলল নাকি পেতলের। ঘাম লেগে লেগে সোনার মতো হয়ে গেছে।

টিফিনের সময় জিগ্‌গেস করলাম, "কেন রে?" তাতে সে এক আশ্চর্য কথা বলল।

তার দাদামশাইয়ের নাকি যখন অল্প বয়স, একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের তলায় চক্‌চকে এক কুচ্‌কুচে কাগের পালক। প্রথমটা

খুব খুশি হলেন। ভাবলেন দিব্যি এক খাগের কলম বানিয়ে বন্ধুদের লম্বা-লম্বা চিঠি লেখা যাবে। পরে শিউরে উঠলেন। কি সর্বনাশ! কাগ যে ছুঁতে নেই, ইয়ে-টিয়ে খায়, তার পালক বালিশের তলায় এল কোত্থেকে? আর কেউ দেখবার আগেই সেটাকে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে উঠোনে ফেলে দিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তার পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের নীচে আবার আরেকটা কাগের পালক! এবার আর কোনো সন্দেহই নেই, দস্তুরমতো কাগ কাগ গন্ধ পর্যন্ত পেলেন। দাদামশাই সেইদিনই মাছ-মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিলেন, চুল ন্যাড়া করলেন, পাশের বাড়ির লোকদের তাদের গাছ-ছাঁটা কাঁচিটা ছমাস বাদে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন, গঙ্গাস্নান করলেন।

স্নান করে উঠে, ঘাটের উপর দেখেন দিব্যি ফোঁটা কাটা, তিলক আঁকা, জটাওয়ালা, গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী-বাবা হাসি-হাসি মুখ করে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। দাদামশাই তাঁকে টিপ্ করে প্রণাম করলেন। অমনি সন্ন্যাসী তাঁর ডান হাতের কনুইয়ের উপর ঐ লাল সুতো দিয়ে মাদুলিটা বেঁধে দিয়ে দাদামশাইয়ের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "কুচ্ ডর্ নেই বেটা। শাঁপখোঁপ সব কেটিয়ে যাবেন!"

দাদামশাইয়ের ঘাড়ে খুব সুড়্সুড়ি লাগা সত্ত্বেও তিনি শুধু একটু কিল্বিল্ করে বললেন, "ঠিক বলছ তো ঠাকুর?"

গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে সন্ন্যাসী-ঠাকুর ঝুলির মধ্যে থেকে সুতো বাঁধা এক চশমা বের করে নাকে পরেই আঁৎকে উঠে বললেন, "য়্যাঁ! এ কি আছে রে? আরে হামি তো তোমাকে চিনতে পারে নি, উ মাদুলি পল্টু জমাদার কো আস্তে বনায়া, দে দেও রে বেটা, উ তোমারা নেহি!"

কিন্তু কে শোনে? দৈবাৎ অমন মাদুলি মানুষের জীবনে এক-আধবার ঘটে যায়। তাকে কি অমনি অমনি দিয়ে দেওয়া যায়? দাদামশাই ছপাত করে মালকোঁচা মেরে দে দৌড়!

বাড়ি এসে অবাক হয়ে দেখলেন পাশের বাড়ির আমগাছের যে ডাল পাকা পাকা আমসুদ্ধ তাঁদের উঠোনের উপর ঝুলছিল, অথচ পাছে নেপালবাবু পুঁতে ফেলেন সেই ভয়ে কিছু করা যাচ্ছিল না, সে-সব আম আপনি আপনি দাদামশাইয়ের উঠোনে পড়ে গেছে। আরো দেখা গেল
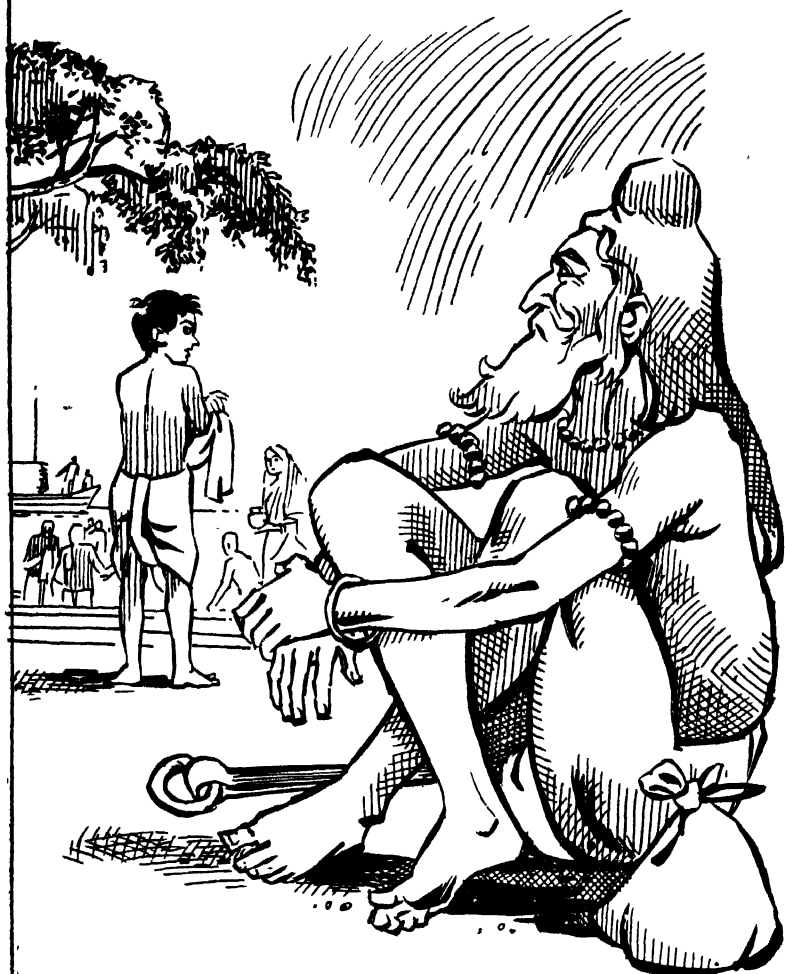
এক সন্ন্যাসী-বাবা হাসি-হাসি মুখ করে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন।

নতুন কুয়োতেও ভোর থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আসছে। রাত্রে ফেলাদা পুকুরে যে ছিপ ফেলে রেখেছিল তাতে মস্ত এক কাতলা মাছ পড়েছে। বেলা না হতেই দাদামশাইয়ের শালা, গত বছর যে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিল, নিজে থেকে ফেরত দিয়ে গেল। উপরন্তু রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন করে গেল! বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখলেন এমন-কি, দিদিমার পর্যন্ত হাসিমুখ।

মাদুলির গুণ দেখে দাদামশাই অবাক। মনে মনে সন্ন্যাসী-বাবার ময়লা পায়ে শত শত প্রণাম করলেন।

সেই থেকে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গেল। টাকাপয়সা হল, গোরু-ভেড়া হল, ছেলেরা বড়-বড় চাকরি পেল, মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ে হল। এমন-কি, মামার বাড়ির গোরুর দুধের ক্ষীর, গাছের আম, আর পুকুরের মাছের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনার চোটে গুপে 'লোম-হর্ষণ সিরিজ'-এর বিশ নম্বর বইয়ের পাঁচ ছটা পাতার কোনা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

আরো বলল, "এই সেই মাদুলি। একচল্লিশ বছর এক মাস দাদা-মশাইয়ের হাতে বাঁধা ছিল, একদিনের জন্যও খোলা হয় নি, দাদামশাইয়ের হাতে সুতো বাঁধা মাদুলির সাদা দাগ পড়ে গেছে, গায়ে লেগে শেষটা এমন হয়েছিল যে মাঝেমাঝে নাকি মাদুলিটার উপরও চুলকত!"

সেই মাদুলি দাদামশাই এক কথায় গুপের হাতে বেঁধে দিয়েছেন কারণ গুপে বায়না ধরেছিল যে মাদুলি না দিলে নাকি সে তেলও মাখবে না, চানও করবে না, ভাতও খাবে না! আর যদি খায়ও তা হলে এত কম খাবে যে কিছুদিন বাদে পেট না ভরে ভরে হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্‌ করবে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে, চোখ উলটে যাবে—এই অবধি শুনেই দাদামশাই কানে হাত দিলেন ও তখুনি পট্‌ করে মাদুলির সুতো ছিঁড়ে সেটাকে গুপের হাতে বেঁধে দিলেন।

গুপে দেখল মাদুলির গুণ একটুও কমে নি। আধ ঘণ্টার ভিতর ছোটমামার ফাউন্টেন পেনের নিব খারাপ হয়ে গেল, ছোটমামা সেটা গুপেকে দিয়ে দিল। পরে অবিশ্যি আবার চেয়েছিল, তাইতেই তো গুপে ছুটির দুদিন বাকি থাকতেই মামাবাড়ি থেকে চলে এসেছিল।

বাড়ি এসেই শোনে মাস্টারমশাইয়ের মাম্পস হয়েছে, গাল ফুলে চাল-কুমড়ো, সেরে যদি-বা ওঠেন তবু একটি মাসের ধাক্কা।

এর পর গুপে যা তা বলতে আরম্ভ করল। নাকি মাদুলি হাতে পরা থাকলে গুপে যখন যা বলবে তাই ঘটতে বাধ্য। এ কথা শুনে আমরা সবাই ভীষণ আপত্তি করলাম, তা কি কখনো হয়?

নগা বলল, "এক যীশু ছাড়া আর কেউ—"

গুপে ভীষণ রেগে সরু লম্বা ময়লা নখওয়ালা একটা আঙুল নগার দিকে বাগিয়ে বলল, "আজ বলে দিলাম তুই ভূগোল ক্লাসে দাঁড় খাবি।"

ওমা! সত্যি সত্যি ভূগোল ক্লাসে নগা দাঁড় তো খেলই, তার উপর কান মলাও খেল! এর পর আর কারুর কিছু বলবার জো নেই। গুপে একবার মাদুলির দিকে তাকালেই হল, সে যখন যা বলে সবাই তা মেনে নেয়। যখন যা চায় সবাই তাই দিয়ে ফেলে।

তিন সপ্তাহ ক্লাসসুদ্ধ সবাই গুপের দৌরাত্ম্যে খাবি খেলাম। সে যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করল। এমন-কি, কালীপদর চুল ছাঁটা পছন্দ হচ্ছিল না বলে সে বেচারাকে ন্যাড়া করিয়ে ছাড়ল।

সবাই দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলাম। নগার তো পেন্টেলুন এমন ঢিলে হয়ে গেল যে শেষে তার দাদা তাই নিয়ে টানাটানি। বলে কিনা—"দেখছিস না, ও আমার, তোর গায়ে বড় হচ্ছে। হয় আমার, নয় বাবার।"

এদিকে যার যা ভালো জিনিস গুপে সব গাপ্ করতে লাগল। পেনসিল, রবার, পেনসিলকাটা, রঙিন খড়ির বোঝায় গুপের পকেট ঝুলে ঝুলে ছেঁড়ে আর কি! শেষে কিনা সে-সব রাখবার জন্যে আমার নতুন টিফিনের বাক্সটা একদিন চেয়ে বসল। তখন আমি বেজায় চটে গেলাম। একটু তোতলামি এসে গেল। মাথাটাথা নেড়ে বললাম— "দ্যা-দ্যাখ্ গুপে, দিন-দিন তোর বাড় বাড়ছে। কাল তোর সব অঙ্ক কষে দিয়েছি। আমার টিফিনের অর্ধেকের বেশি খেয়ে ফেলেছিস। ইংরেজি ক্লাসে ছুরি ফট্‌ফট্ করেছিস আর তার জন্য বকুনি খেয়েছি আমি। বেশি বাড়াবাড়ি করিস নে বলে দিলাম।"

এক নিঃশ্বাসে রাগের মাথায় এতগুলো কথা বলে দেখি গুপে আমাকে শাপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তার চোখ দুটো ছোট হয়ে আলপিনের ডগার মতো হয়ে গেল, ঢোক গিলে, গলা হাঁকড়ে, আঙুল বাগিয়ে, খন্‌খনে গলায় বলল—"আজ তোর জীবনের শেষদিন। দিনটা কাটলেও রাত কাটবে না।" ক্লাসময় একটা থমথমে চুপচাপ। তার মধ্যে নরেনবাবু

এসে গেলেন, আর কিছু হল না।

একটু পরেই আমার গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসতে লাগল, নিঃশ্বাসটা কিরকম জোরে জোরে পড়তে লাগল, চুলের গোড়াগুলো শির্-শির্ করতে লাগল, পেটের ভিতর কেমন ফাঁকাফাঁকা মনে হতে লাগল। বুঝলাম মাদুলির শাপ আমার লেগেছে! কিছু পড়া-টড়া শুনলাম না, হোমটাস্ক টুকলাম না, ড্রইং ক্লাসে বেয়াদপি করলাম। যার দিন কাটলেও রাত কাটবে না, তার আবার ভাবনা কি? টিফিন বাক্সটা ক্লাসের মধ্যেই নগার হাতে ঠুসে দিলাম, আমি মরি আর গুপে সেটা ভোগ করুক আর কি! ছুটির ঘণ্টা পড়লে পর মনে হল, আমি তো গেলাম, যাবার আগে ঐ সর্বনেশে মাদুলিটাকে শেষ করে তবে যাব।

দেখি গুপেদের পুরনো চাকর ভদ্দু গুপের বই গুছিয়ে নিচ্ছে, আর গুপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। হঠাৎ খুন চড়ে গেল, ছুটে গিয়ে এক সেকেণ্ডে মাদুলিটা কেড়ে মাড়িয়ে ভেঙে একাকার! তার থেকে অন্তত ধোঁয়াও বেরুনো উচিত ছিল, কিন্তু কিছু হল না। গুপে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ওদের চাকরটা হাঁই হাঁই করে ছুটে এসে হাত-পা ছুঁড়ে বললে—"য়্যাঁ, কি করলে! আমার পেট-ব্যথার অব্যর্থ মাদুলি, আমি কালীঘাট থেকে দুপয়সা দিয়ে কিনে এনেছি। আগেই জানি গুপিদাদাকে যা দেওয়া যাবে তাই আর কিছু থাকবে না!"

আমরা সবাই হাঁ করে গুপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নিশ্চয় কিছু বলা উচিত ছিল, কিন্তু সে অম্লানবদনে পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে ভদ্দুকে ছুঁড়ে দিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বাড়ি চলে গেল।

সিঁড়ির মোড়ে বিপদ

নন্দর আজ বেজায় মন খারাপ। সেই সকাল থেকে সব জিনিসকে কিসে যেন পেয়েছে! ঘুম থেকে উঠেই ভোঁদাকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে অত ভালো হকি স্টিক্‌টার হ্যাণ্ডেলের সুতো কতখানি এল খুলে! তায় আবার ভোঁদা হতভাগা এমনি চেঁচাল যে বড়মামা এসে নন্দর কান পেঁচিয়ে মাথায় খটাং খটাং করে দুই গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন।

তার পর, সেই দেয়ালে কাজলকালি দিয়ে কুকুর তাড়া করছে, মোটা লোকটার ছবি আঁকবার জন্যে বাবা মন্টুর সঙ্গে সেই চমৎকার জায়গায় সেই মজার জিনিস দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। নন্দ আর কি বলে! ছি, মন্টুই-বা কি ভাবল বল তো? নাঃ! বুড়োরা যে কেন পৃথিবীতে জন্মায় বোঝা যায় না!

আচ্ছা, অন্যদের বাড়ির লোকেরাও কি এমন হাঁদা? এরা কিচ্ছু—বোঝে না। এই তো কালই দিদির নাগরাইয়ের শুঁড় পাকিয়ে দেবার জন্য দিদি চাঁটাল। আচ্ছা, শুঁড় পাকিয়ে কী এমন খারাপটা দেখাচ্ছিল? ভারি তো নাগরাই! এর চেয়ে আর কোথাও চলে যাওয়া ভালো—ইজিপ্টে যেখানে নীল নদীর ধারে ফ্লেমিঙ্গো পাখিরা মাছ ধরে খায়, আর মস্ত-মস্ত কুমিররা বালির উপর রোদ পোহায়। নয় তো মানস সরোবরে যেখানে একশো বছরে একটা নীল পদ্মফুল ফোটে। সেজদা বলেছে, কাগজে আছে কারা নাকি ছোট-ছোট ঘোড়ার পিঠে বোঁচকা বেঁধে, টিনের দুধ, বিস্কুট কম্বল-টম্বল নিয়ে সেখানে যাচ্ছে।

কিম্বা তাদের ছেড়ে নন্দ আরো উপরে যাবে, যেখানে লোমওয়ালা মানুষরা কিসের জানি রস খায়, সে খেলেই গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কিম্বা—যাবার তো কত জায়গাই আছে!

খিদিরপুরের ডকেই যদি কাজ নেয় কে খুঁজে পাবে! সেই যে একবার নন্দ দেখেছিল, একটা পুলের তলায় ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির হাঁড়িতে কি রেঁধে খাচ্ছিল কারা সব, ডকের কুলি হবেও-বা। সেইরকম করে থাকবে। কিম্বা যারা গান করে করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে

বেড়ায় তাদের সঙ্গেও তো জুটে যাওয়া যায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে মেলাতে মেলাতে বেড়ানো যাবে। কিন্তু তার আবার একটা অসুবিধে আছে। দিদিকে গান শেখাতে এসে গোপেশ্বরবাবু বলে গেছেন, কোকিলের ডিম ভেঙে খেলেও এ ছেলের কিছু হবে না।

গান করতে না পারুক, গোরুর গাড়ি তো চালাতে পারবে! হঠাৎ একটা ভীষণ সংকল্প করে নন্দ সটান উঠে একেবারে ঘোরানো সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মা বলেছেন, 'খবরদার ও দরজা খুলবি নি। বিপদে পড়বি।" কি বিপদ অনেক ভেবে নন্দ মাসিমাকে জিগ্‌গেস করেছিল। মাসিমা বলেছিলেন, 'ওরে বাবা! সে ভীষণ বিপদ!'

'কি ভীষণ?' জিগ্‌গেস করাতে আবার বললেন, 'সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে বেজায় হিংস্র লোকেরা নাকি বাঁকা ছুরি হাতে চক্‌চকে চোখ করে ওৎ পেতে আছে সারা রাত, ভোরবেলা গঙ্গায় জাহাজের বাঁশিগুলো যেই বেজে ওঠে ওরাও কোথায় আবছায়াতে চলে যায়।' নন্দ জানতে চাইল তারা কোত্থেকে এসেছে। মাসিমা বললেন, 'কেউ এসেছে জাভা থেকে, কেউ সানফ্রানসিস্কো, কেউ কাম্বোডিয়া থেকে। আউটরাম ঘাটের কাছে তাদের জাহাজ নোঙর দেওয়া আছে, জাহাজের পাশের রেলিং-না-দেওয়া সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রাত দুপুরে নেমে এসেছে, ভোর না হতেই আবার ফিরে গিয়ে জাহাজের নীচে অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড উনুনে কয়লা পুরবে।"

একবার অনেক রাতে নন্দ কোথা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ঘরে ফিরছিল। তখন নিজের চোখে দেখেছিল ছোট-ছোট টিমটিমে আলো নিয়ে কারা যেন ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। তাই দরজার সামনে এসে নন্দ একবার থামল। বেশ রাত হয়েছে, বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে, কেমন অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে! হাওয়া তো রোজই দেয় আজকাল, কিন্তু এরকম তো কখনো মনে হয় না।

নন্দ দরজা খুলল, চাম্‌চিকের খোকার কান্নার মতন একটা শব্দ হল। একটা বড় সাইজের ঠ্যাঙে লোমওয়ালা মাকড়সা সড়্‌সড়্‌ করে নন্দর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল।

প্রথম সিঁড়িতে পা দেবার আগে নন্দ উপর দিকে তাকাল। যতদূর দেখা যায়, সিঁড়ি ঘুরে পাঁচতলার ছাদ পর্যন্ত উঠেছে, আর নীচের দিকে

যতদূর দেখা যায় ঘুরে ঘুরে একতলার শানবাঁধানো গলি পর্যন্ত নেমেছে। সিঁড়ির রেলিংটা ক্যাঁ-কোঁ করে নড়ে উঠল, কার জুতো জানি চাপাগলায় মচ্‌মচ্‌ করে উপর থেকে নেমে আসতে লাগল। নন্দর হাত-পা হিম হয়ে গেল, অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে চ্যাপটা হয়ে টিক্‌টিকির মতন লেগে রইল।

তার পর দেখল বুড়ো-আঙুল-বার-করা, জিব-কাটা ছেঁড়া হলদে বুট পায়ে, তালি-দেওয়া সুতো-ঝোলা লম্বা পেন্টেলুন পরা দুটো ঠ্যাঙ্‌ সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নামতে লাগল। তার পর দেখল, পিঠে তার মস্ত ঝুলি, থুতনিতে খোঁচা দাড়ি, নাকের উপর আঁচিল, তার উপর তিনটে লোম, ন্যাড়া মাথায় নোংরা টুপি—বোধ হয় সেই হিংস্র লোকদের কেউ একজন। ভয়ের চোটে নন্দর একপাটি চটি ছিটকে খুলে, ঠংঠং করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নীচে চলল, আর সেই হলদে বুট পরা হিংস্র লোকটা থতমত খেয়ে বোঁচকা ফেলে দে ছুট।

নন্দর কিন্তু আর কিচ্ছু মনে নেই। কেমন ভেড়ু বানিয়ে গিয়েছিল! লোকটা কিন্তু নিজেই টেনে কোথায় দৌড় লাগাল!

এদিকে পাঁচতলার লোকেরা আজও গল্প করে নন্দ নামে একটি ছোট ছেলে চোর ভাগিয়ে জিনিস বাঁচিয়েছিল।

শুনে শুনে নন্দ মনে ভাবে—বুড়োরা কি হাঁদা! কিন্তু বাইরে কিচ্ছু বলে না, চালাক কিনা!

• ঘোতন কোথায়

সকালে খুব দেরি করে উঠলাম। উঠেই গায়ের চাদরটা এক লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারই উপর দাঁড়ালাম। চটি খুঁজে পেলাম না। খালি পায়ে স্নানের ঘরে গেলাম। দাঁত মাজলাম না, তাতে যে সময়টুকু বাঁচল সে সময়টা কলের মুখ টিপে ধরে পিচকিরির মতন দেয়ালে-টেয়ালে জল ছিটোলাম। খানিকটা আবার বাবার তোয়ালের উপরও পড়ল দেখলাম। তার পর চোখেমুখে জল দিয়ে, মুখহাত মুছে সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘরের কোনায় ছুঁড়ে মারলাম।, তার পর

একমুখ জল ভরে নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে নীচে রাস্তায় একজন বুড়ো লোকের গায়ে পু—চ্ করে ফেলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চুলটাকে খুব যত্ন করে আঁচড়াতে লাগলাম।

ততক্ষণে নীচের তলায় মহা সোরগোল লেগে গেছে। পিসিমা দুধের বাটি নিয়ে বলছেন, "ঘোতন কোথায় ?" মা আমার চটিজোড়া নিয়ে বলছেন, "ঘোতন কোথায় ?" আর সব থেকে বিরক্ত লাগল শুনে যে মাস্টারমশাই সেইসঙ্গে ম্যাও ধরেছেন, "প্রশান্তকুমার কি আজ পড়বে না ?" ভীষণ রাগ হল। জীবনে কি আমার কোনো শান্তি নেই ? এই সক্কালবেলা থেকে সবাই পেছু নিয়েছে।

পিসিমাকে সিঁড়ির উপর থেকে ডেকে বললাম, "দুধ খাব না।" সিঁড়ির নীচে নেমে এসে মাকে বললাম, "চটি পরা ছেড়ে দিয়েছি।" বসবার ঘরে গিয়ে গলা নিচু করে মাস্টারমশাইকে বললাম, "মা বলে দিয়েছেন, আজ আমার পেট-ব্যথা হয়েছে, আজ আমি পড়ব না।" তার পর একেবারে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সারাটা সকাল রোয়াকে রোদ্দুরে বসে বসে পা দোলালাম, আর রাস্তা দিয়ে যত ছ্যাকড়া গাড়ি গেল তার গাড়োয়ানদের ভ্যাংচালাম।

দশটা বাজতেই উঠে গিয়ে বই-টই কতক-কতক গুছিয়ে, আর কতক-কতক খুঁজেই পাওয়া গেল না বলে ফেলে রেখে, ঝুপ্ঝুপ্ করে একটু স্নান করে নিয়ে, খুব যত্ন করে চুলটা ফের আঁচড়ে নিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

মা জলের গেলাস দিতে-দিতে বললেন, "হ্যাঁ রে, মাস্টারমশাই কখন গেলেন ? শুনতে পেলাম না তো ?"

আমি সত্যি করেই বললাম, "সে কখন চলে গেছেন কে-বা তার খবর রাখে!"

ভাত কতক খেলাম, কতক চার পাশে ছড়ালাম, কতক পুসিকে দিলাম, আর কতক পাতে পড়ে রইল। মাছটা খেলাম, ডাল খেলাম, আর ঝিঙে, বেগুন ইত্যাদি রাবিশগুলো সব ফেলে দিলাম। মা রান্নাঘর থেকে দেখতেও পেলেন না। ট্রামভাড়াটা পকেটে নিয়ে মাকে বললাম, "মা, যাচ্ছি।" এই পর্যন্ত প্রায় রোজই যেমন হয় তেমনই হল। অবিশ্যি মাস্টারমশাইয়ের ব্যাপারটা রোজ হয় না, তাই যদি হত তা হলে বাবা-টাবাকে বলে মাস্টারমশাই এক মহা কাণ্ড বাধাতেন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এর পর থেকে সেদিন সব যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল।

মনে আছে ট্রামে উঠে ডানদিকের একটা কোনা দেখে আরাম করে বসলাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর খালি মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে দেখছে। একবার ট্রামসুদ্ধ সবাইকে দেখে নিলাম—বুঝতে পারলাম না কে। তার পর আবার যেই বাইরে চোখ ফিরিয়েছি আবার মনে হল কে আমাকে এমন করে দেখছে যে আমার খুলি ভেদ করে ব্রেন পর্যন্ত দেখে ফেলছে। তাইতে আমার ভারি ভাবনা হল। এমনিতেই নানান আপদ তার উপর আবার ব্রেনের ভিতরকার কথাগুলো জেনে ফেললে তো আর রক্ষে নেই।

কিছুতেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা ঘুরিয়ে ট্রামের প্রত্যেকটি লোককে ভালো করে দেখলাম।

এবার লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার সামনে কালো পোশাক-পরা একটি অদ্ভুত লোক। তার মুখটা তিনকোনা মতন, মাথায় গাধার টুপির মতন কালো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে লাল নীল হলদে সবুজ চক্‌রা-বক্‌রা তারা-চাঁদ আঁকা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা কালো জুতো, দুই হাঁটুর মাঝে হাতে ঝুলছে একটা সন্দেহজনক কালো থলে।

এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভীষণ চমকে উঠলাম। দেখলাম, মাথায় টুপি নয়, চুলটাই কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে। গায়ে সাধারণ ধুতির উপর কালো আলোয়ান, তাতে ট্রামের ছাতের কাছের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙবেরঙ হয়ে আলো পড়েছে। আর পায়ে নাকতোলা বিদ্যাসাগরী চটি। খালি হাতের থলেটা সেইরকমই আছে। কিরকম একটু ভয়-ভয় করতে লাগল।

লোকটা খুশি হয়ে তাকিয়ে রইল। তার পর স্পষ্ট গলায় বলল, "অতই যদি খারাপ লাগে ইস্কুলে যাও কেন? বড়রা যখন এতই অবুঝ তাদের কথা মেনে নাও কেন?"

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তবে কী করব?"

লোকটি বলল, "কী করবে? তাকিয়ে দ্যাখ নীল আকাশে ছোট-ছোট সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা সব ভিজে পাতায় সোনালি রঙের রোদ মেখে বসে আছে। গড়ের মাঠের ধার ঘেঁষে পুকুরটাকে

একটুক্ষণ তাকাতেই চমকে দেখলাম—মাথায় টুপি নয়, চুলটাই
কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে…

দ্যাখ, ঘোর সবুজ জলে টলমল করছে। আর, টের পাচ্ছ দখিন হাওয়া দিচ্ছে ?”

তার পর লোকটা তার বড়-বড়-ফুটোওয়ালা নাকটা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকে বলল, “হুঁ, পেঙ্গুইনের গন্ধ পাচ্ছি। গড়ের মাঠের ওপারে, গঙ্গার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের ওপারে, ভারত মহাসাগরের ওপারে, কোনো একটা বরফ-জমা দ্বীপের উপর সারি সারি পেঙ্গুইন চলাফেরা করছে, তাদের মুখেচোখে রোদ এসে পড়েছে। ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে, দু-একটা সাদা নরম পালক উড়ে গিয়ে এখানে-ওখানে পড়ছে— দেখতে পাচ্ছ না ?”

কী আর বলব, তখন আমি যেন স্পষ্ট ঐ-সব দেখতে পেলাম, আর আমার সমস্ত মনটা আনচান করে উঠল। মনে হল, এমন দিনে কি কেউ ইস্কুলে যায় ? এমন পৃথিবীতে কোনোদিনও কেউ ইস্কুলে যায় ?

আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আরেকটু আস্তে আস্তে বলল, “জানো, ভোর রাতে বড়-বড় চিংড়িমাছ ধরতে হয়, তার এক-একটার ওজন একসেরের বেশি। দুদিন ধরে সমুদ্রের নীচে দড়ি-বাঁধা সব হাঁড়ার মতন জিনিস ডুবিয়ে রাখতে হয়। আর ভোরবেলা গিয়ে ঐ দড়ি ধরে টেনে হাঁড়াসুদ্ধ চিংড়ি তুলতে হয়। তার পর বাড়ি ফেরবার সময় আস্তে আস্তে সকাল হয়। তুমি তো জানো যে পুব দিকে সূর্য ওঠে, কিন্তু এ কথা জানো কি যে পশ্চিম দিকের আকাশটা আগে লাল হয়, তার পর পুব দিকে সূর্য ওঠে ! তারও পর পশ্চিম দিকের লাল রঙ মিলিয়ে যায়, আর সমস্ত আকাশটা ফিকে পোড়া ছাইয়ের মতন হয়ে যায়। তারাগুলোকে নিবে যেতে কখনো দেখেছ কি ?”

আমার মনে হল আমার নিশ্চয় এখানে কিছু বলা উচিত কিন্তু আমার জিব দেখলাম শুকনো কাঠের মতন হয়ে গেছে। কিছু আর বলা হল না। খালি মনটা হু-হু করতে লাগল। সে লোকটা আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বলল, “কী জন্য কলকাতায় পড়ে থাকো আর ইস্কুলে যাও ? জানো রবি ঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে-পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন ! আর জানো সাঁওতাল পরগনায় যখন মহুয়া ফল পাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। আর বনের ভালুক-গুলো মহুয়া খেয়ে খেয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে।

পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐরকম ভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে?"

আমার তখন মনে হল দিনের পর দিন ইস্কুলে গিয়ে আমি বৃথাই জীবন নষ্ট করেছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনো ইস্কুলেই যায় নি।

হঠাৎ দেখি সে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার দিকে ফিরে অম্লান-বদনে বলল, "এসো।" এমন করে বলল যেন বহুক্ষণ থেকে ঐরকমই কথা ছিল। ও-ও নামবে আর সেই সঙ্গে আমিও নামব।

আমি নামলাম। যদিও আমি জানতাম অচেনা লোক ডাকলে সঙ্গে যেতে নেই। যদিও দিনের পর দিন পিসিমা বলেছেন, "দুষ্টু লোকেরা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে হয় আসামের চা-বাগানে চালান দেয়, নয় ঘোর জঙ্গলে মা-কালীর কাছে ঘ্যাঁচ্ করে বলি দেয়।

তবুও আমি নামলাম। কারণ রোজ ঐ ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পড়া তৈরি করা, স্নান করে ভাত খাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, ইস্কুল থেকে সারাটা দিনমান নষ্ট করে বিকেলে আবার বাড়ি ফেরা, সেই খাওয়া, সেই শোয়া—ঐরকম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—যতদিন না অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, কবে আমি বড় হয়ে ভালো চাকরি করে এই-সব জিনিসের ভালো ফল দেখাব—ও আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।

বইগুলো ট্রামের কোনায় আমার জায়গায় পড়ে রইল। আমি সেই লোকটার সঙ্গে গেলাম।

তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজেছে।

সে আমাকে একটা চায়ের দোকানের ভিতর দিয়ে পিছন দিকের ছোট একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে কোথায় জানি চলে গেল। একটু পরেই সে আবার ফিরে এল, সঙ্গে একটা একচোখো লোক, অন্য চোখটার গায়ে একটা সবুজ তাপ্পি মারা। একটা পা আছে, আরেকটা পা কাঠের তৈরি।

এই লোকটা আমার দিকে এক চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "কি হে ছোকরা, পড়াশুনোর উপর নাকি এমনই ঘেন্না ধরে গেছে যে একেবারে সে-সব ত্যাগ করে এসেছ?" তার গলাটা এমন কর্কশ আর চেহারাটাও এমন বিশ্রী যে আমি সত্যি ভারি ভড়কে গেলাম।

কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকাতেই সে গ্রামোফোনের চাকতির মতো বলে যেতে লাগল, "পড়াশুনো করে কী হবে? জানো, আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যে-সব বিরাট বিরাট নদী আছে তার ধারে ধারে কুমিরেরা আর হিপ্পোপটেমাসরা শুয়ে-শুয়ে দিন কাটায় আর লম্বা লাল ঠ্যাঙে ভর দিয়ে গোলাপি রঙের ফ্লেমিঙ্গো পাখিরা রোদ পোহায়। আর ঐ-সব জঙ্গলের মধ্যে এমন বিশাল বিশাল অরকিড জাতীয় ফুল ফোটে যে তার মধ্যে একটা মানুষ দিব্যি আরামে শুয়ে থাকতে পারে।"

বুঝতে পারছিলাম এ-লোকটা জাদু জানে। কারণ তক্ষুনি আমার ভয়-টয় কোথায় উড়ে গেল--অন্য লোকটাকে জোর গলায় বললাম, "হ্যাঁ, সে-সব চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছি।"

লোকটা হাসল, বলল, " 'চিরদিন' বড় দীর্ঘকাল হে ছোকরা। চিরদিনের কথা কে বলতে পারে? কিন্তু তোমার সাহস আছে, উৎসাহ আছে, তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। স্বাস্থ্যটাও তো ভালো দেখছি। আশা করি বাড়ির জন্য মনের টান ইত্যাদি কোনো দুর্বলতা নেই?"

হঠাৎ মনে হল মা এতক্ষণে স্নানের জোগাড় করছেন, বাবা আপিস গেছেন, এবং দুজনেই মনে ভাবছেন আমি বুঝি ইস্কুলে গেছি। গলার কাছটা সবে একটু ব্যথা করতে শুরু করেছিল এমন সময় কালো কাপড় পরা লোকটা বলল, "ইস্কুলের বাইরে, কলকাতা থেকে বহু দূরে নরওয়ের উত্তরে চাঁদনি রাতে হারপুন দিয়ে তিমি শিকার হয়। তিমির গায়ে হারপুন বিঁধলে তিমি এমন ল্যাজ আছড়ায় যে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে যায়। কত নৌকো ডুবে যায়। আবার তিমি মরে গিয়ে যখন উলটে গিয়ে ভেসে ওঠে, দেখবে তার বুকের রঙটা পিঠের চেয়ে ফিকে।

"আর জানো, ইংল্যান্ডে শীতকালে সোয়ালো পাখিরা থাকে না। তারা দলে-দলে উড়ে স্পেনে চলে যায়, আর যেই শীত কমে আসে আবার তারা দলে-দলে সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে উড়ে ফিরে আসে। এসে দেখে তাদের আগেই শীতের বাতাসকে তুচ্ছ করে ড্যাফোডিল ফুলরা ফুটে গেছে।"

আমার মন পাখির মতো উড়ে যেতে চাচ্ছিল।

একচোখো বলল, "কিন্তু শুধু তিমি মারলে হবে না। তার বহু অসুবিধাও আছে, বহু দূরও। এই কাছাকাছি মানুষ-টানুষ মারতে

পারবে ? পরে যাবে আফ্রিকা, নরওয়ে, আলাস্কা—আপাতত অন্ধকার রাত্রে গলির মুখে দাঁড়িয়ে বাঁকা ছুরি হাতে নিয়ে ঘচ্ করে সেটাকে লোকের বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারবে ? যেমন রক্তের নদী ছুটবে তুমিও হো হো করে রাত কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠবে ?”

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সেই কালো কাপড় পরা লোকটা বলল, “উত্তর-মেরুতে সীল মাছেরা বরফের মধ্যে বাসা করে—”

আমি বললাম, “কুড়ি বছর পরে উত্তর-মেরুর কথা শুনব, এখন আমি ইস্কুলেই বরং যাই, মাথায় আমি লাল রুমাল কিছুতেই বাঁধতে পারব না।”

লোকটা বলল, “কে জানে ভুল করছ কি না ?”

আমি ততক্ষণে চায়ের দোকানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। প্রথম যে ট্রাম এল তাতেই উঠে পড়লাম।

উঠেই ভীষণ চমকে গেলাম। দেখলাম ট্রামের কোনায় ডানদিকের সীটে আমার বইগুলো পড়ে রয়েছে। কেমন করে হল বুঝতে না-পেরে ফুটপাথের চায়ের দোকানের সামনে কালো-কাপড়-পরা লোকটার দিকে তাকালাম।

আবার মনে হল তার মাথায় গাধার টুপির মতো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে রঙ-বেরঙের চক্‌রা-বক্‌রা আঁকা আর পায়ে শুঁড়তোলা কালো জাদুকরের জুতো।

সে আমাকে হাত তুলে ইশারা করে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। আর আমি মোড়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখনো সাড়ে-দশটাই বেজে রয়েছে!

নটেমামা

আমি জন্মাবার অনেকদিন আগে মেজোমামা যখন ইস্কুলে পড়তেন, একবার পুজোর ছুটিতে কাঁচকলা নিয়ে দেশে গেছেন, আর তার পরের দিনই ভোরে মার নটেমামা তাঁর বিখ্যাত কালো সুটকেস নিয়ে উপস্থিত হলেন। রঙ-ওঠা দেড়হাত লম্বা একটা পুরনো কালো সুটকেস, তাতে ডবল তালা মারা।

ঐ সুটকেসই তিরিশ বছর ধরে মামাবাড়ির ইতিহাস তৈরি করল।

নটেমামাকে দেখেই দিদিমা নাকি কোল থেকে দুম্ করে ছোট-মাসিকে নামিয়ে রেখে, "ওরে নটে এদ্দিন তুই কোথায় ছিলি রে, ওরে বাবা রে!" বলে তাঁর গলা ধরে ঝুলে পড়লেন।

নটেমামা বললেন, "আঃ কি যে কর দিদি! সুটকেস পড়ে গেলেই সর্বনাশ হবে। মনে করেছি তোমার ছেলেপুলেদের দিয়ে যাব। আর কারুর কোনো অভাব থাকবে না।"

তাই শুনে দিদিমা তখুনি গলা ছেড়ে দিয়ে, চোখ মুছে এক গাল হেসে বললেন, "ওমা! তুই চিরটা কালই পেজোমি করে কাটালি! তুই আবার ওতে ভরে কি আনলি?"

নটেমামা বললেন, "সময় হলে সবই জানতে পারবে দিদি! তোমার ছেলেপুলেদের ছাড়া ও আর কাকে দিয়ে যাব!"

দিদিমার পেছন দিক থেকে দরজা দিয়ে জানলা দিয়ে পিল্-পিল্ করে বেরিয়ে এসে মেজোমামা সেজোমামা বড়মাসি বড়মেসো প্যাঁঙাদা ভজাদা রাঙামাসি ট্যাঙামাসি টেঁপিদিদি খেঁদিদিদি ইত্যাদি আর পাঁচ-সাতজন কারো ঝুঁটি বাঁধা, কারো কোমরে কালো সুতোয় পয়সা বাঁধা, কারো ন্যাড়া মাথা, যে যেমন ছিল, সবাই অবাক হয়ে শুনল।

তার পর নটেমামা বারান্দার কোণে তালি দেওয়া কালো ছাতাটা রেখে মাঝের ঘরের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসলে পরে, সবাই এগিয়ে এসে ওঁর ছেঁড়া নোংরা সাদা ক্যাম্বিশের জুতো-পরা পায়ে টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করল। আর নটেমামা সবাইকে আশীর্বাদ করে বললেন,

"সুটকেসে তোদের সবার ভাগ আছে। কারো কোনো দুঃখু থাকবে না।" তখন দিদিমা সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন; বললেন, "আহা মানুষটা রোজগারপাতি করে তেতে-পুড়ে এয়েছে। তোরা যেন কি!" বলে নটেমামার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "তোকে ওদের বড্ড ভালো লেগেছে রে, রক্তের টান, ফোঁৎ ফোঁৎ!" বলে আবার চোখ মুছে নটেমামাকে স্নান করবার গরম জল, নরম তোয়ালে, সুগন্ধ সাবান, সেন্টেড্ নারকোল তেল, দাদামশাইয়ের সব থেকে ভালো চটিজোড়া আর নতুন ধুতি দিলেন।

তার পর রেকাবি করে সরভাজা আর ভালো সন্দেশ আর হলদে পেয়ালাতে গরম চা দিলেন। শেষে রান্নাঘরে গিয়ে মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। মার নটেমামা এদিকে তক্তপোশে পা মেলে, বালিশে ঠেসান দিয়ে, খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দিদিমা একবার এসে বলে গেলেন, "ওরে নটে, আমি আর কোনো আপত্তি শুনব না। বাকি জীবনটা তোকে এখানেই কাটাতে হবে। অ খেঁদি, অ খেপি, তোদের কি কোনো আক্কেল নেই লা? নটেদাদামণির পা-দুটো একটু টিপেও দিতে পারিস না? সুটকেসের ভাগ নিতে তোদের লজ্জা করবে না?"

খেঁদি খেপি ইয়া বড়-বড় সাদা-সাদা জিভ কেটে তক্ষুনি পা টিপতে লেগে গেল। আর রাঙামাসিও পেছুপাও না হয়ে তামাক সেজে দিল। তার পর দুপুরে মুড়িঘণ্ট, মাছ-ভাজা, নারকোল-চিংড়ি, দই, রাজভোগ ইত্যাদি খেয়ে নটেমামা দাদামশাইয়ের খাটে শুয়ে পড়লেন। বড়মামিমা সারাদিন বসে-বসে বুড়োকে হাওয়া করলেন। আর দাদামশাই বেচারা কিঞ্চিৎ উশ্‌খুস্ করে শেষে পুরনো চটি জোড়াই পায়ে দিয়ে নকুড় দাদামশাইদের বাড়ি তাস খেলতে গেলেন।

সেই প্রথমবার এসে মার নটেমামা আটমাস পরম আরামে কাটিয়ে গেলেন। এই আটমাস দাদামশাই মাছের মুড়ো, কি পেটির বড় চাকলা, কি মাংসের চোঙার হাড়, কি বড় ফলটা মিষ্টিটার মুখ দেখলেন না। দিদিমা আগেই সে-সব নটেমামার পাতে তুলে দেন।

ছুটির শেষে মেজোমামা যেদিন রওনা হবেন সেদিনও দেখলেন নটেমামা মোড়ায় পা উঠিয়ে দাদামশাইয়ের ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আর রাঙামাসি মাছি তাড়াচ্ছে, বড়মাসি পাকাচুল তুলছে।
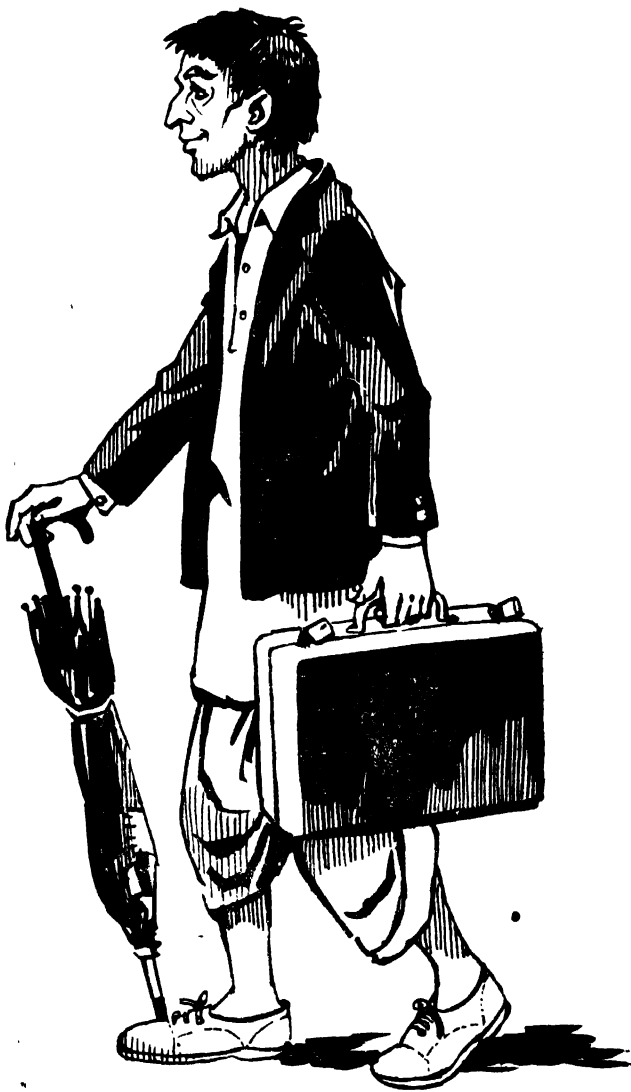
নটেমামা ছেঁড়া কোট, ছেঁড়া জুতো আর কালো
সুটকেস নিয়ে এসে উপস্থিত।

কলকাতা গিয়েও রেহাই নেই। থেকে থেকেই দিদিমার ফরমাশ আসতে লাগল—নটের জন্য বালাপোশ, নটের জন্য এগারো ইঞ্চি গরম মোজা, নটের জন্য ইত্যাদি।

পরের বছর আবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মেজোমামা দেখলেন নটেমামা ইতিমধ্যে একদিন বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছেন। শুনলেন দিদিমা নাকি অনেক করে বলেছিলেন, "ওরে আমার বুকটাকে একেবারে খাঁ খাঁ করে দিয়ে যাস নে রে। নিতান্তই যদি যাবি, নিদেন তোর সুটকেসখানাও রেখে যা।"

নটেমামা অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "আঃ কি যে বল দিদি! ঐ সুটকেসেই তো আমার সব! আমি আর কদিন! তোমার ছেলে-পুলেরাই পাবে!" বলে নতুন কালো জুতো, আদ্দির পাঞ্জাবি, তসরের চাদর আর সোনাবাঁধানো ছড়ি নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি চেপে চলে গেলেন। নটেমামার চেঞ্জ ছিল না বলে দিদিমা আবার যাবার খরচটা আর আবার ফিরে আসবার খরচটা দিয়ে দিলেন।

মেজোমামা দেখলেন নটেমামার জন্য মাঝের ঘরটাকে রেডি করে তালা দিয়ে রাখা রয়েছে। রোজ ধুলো ঝাড়া এবং ধুনো দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই প্রায় মন খারাপ। খালি দাদামশাইয়ের মুখে হাসি। দিদিমা তো থেকে-থেকেই বলেন, "আহা যদি সুটকেসটাও রেখে যেত তাতে হাত বুলোতাম। কি জানি বাবা শ্বশুরবাড়ির ওরা যদি আবার তুক্‌তাক্‌ করে নেয়!"

সেবার পুজো দেরিতে পড়েছিল, মেজোমামা যখন ফিরে আসলেন তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। শেষদিনেই আবার নটেমামা ছেঁড়া কোট, ছেঁড়া জুতো আর কালো সুটকেস নিয়ে এসে উপস্থিত। বললেন, দিদিমার দেওয়া সব জিনিস চুরি গেছে। কিন্তু দিদিমার ছেলেপুলেদের জন্য সুটকেসটা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে এনেছেন।

তাই শুনে দিদিমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছিল?" নটেমামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "থাক, সে কথা আর মুখেও আনতে বোলো না।" দিদিমা ভাবলেন, সব ঐ মুখপোড়া শ্বশুরবাড়ির কাণ্ড এবং তখুনি নটেমামার জন্য নতুন জুতো নতুন ছড়ি থেকে আরম্ভ করে নতুন বালাপোশ নতুন কম্বলের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই আয়োজনের মধ্যে মেজোমামার ট্রেনের সময় হয়ে যাওয়াতে,

মেজোমামা না-খেয়েই রওনা হয়ে গেলেন, কেউ খেয়ালও করল না।

তার পর থেকে পঁচিশ বছর ধরে মার নটেমামা বছরে একবার করে সুটকেস হাতে আসেন, আট-ন মাস থেকে আবার 'শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি' বলে কোথায় জানি চলে যান। প্রতি বছর চোররা অনলসভাবে ওঁর সর্বস্ব চুরি করে নেয় আর দিদিমাও তেমনি অনলসভাবে আবার সমস্ত কিনে দেন। দাদামশাইও শেষ অবধি আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পঁচিশ বছর পরে দিদিমা ও দাদামশাই চোখ বুজলেন। নটেমামা তখন শ্বশুরবাড়িতে, সেই ঠিকানাতে তার করা হল, পেলেন কি না বোঝা গেল না। মোট কথা এলেন না।

পুজোর সময় আবার যখন কাপড়চোপড় কেনা হচ্ছে, নটেমামা কালো সুটকেস হাতে উপস্থিত। বললেন, "আর ইয়ে শ্বশুরবাড়ি যাব না। এখন থেকে আমিই তোদের গাজিয়ান হলাম।" বলে সেদিন থেকেই সব-কিছু হুকুম দেওয়ার ভার নিলেন।

বড়মামা মেজোমামা তখন বিদেশে চাকরি করেন আর মাসে মাসে টাকা পাঠান। সেই টাকার বেশির ভাগটা দিয়ে বড়মামি মেজোমামি রেশারেশি করে নটেমামার সেবা করেন। নটেমামা দিব্যি আরামে আছেন। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে দরজা জানলা বন্ধ করে সুটকেস গোছান। আর যেদিনই গোছান সেদিনই মেজাজটা যেন আরো ভালো থাকে।

সবাইকে বলেন, "দিদিরা গেছেন, আমারই-বা আর কদিন! তোদের অনেক সেবা নিয়েছি, দেখিস আমাকে যেন ঝগড়াঝাঁটির কারণ বানাস না। সুটকেসে যথেষ্ট আছে। সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেবার জন্য যথেষ্ট আছে! এতদিন রইলাম, কাউকে কিছু ইচ্ছে করেই দিই নি যাতে আমি গেলে তোদের জন্য আরো বেশি থাকে। নিজের জন্যও এক পয়সা খরচ করি নি! তোরা যখন যা দিয়েছিস তাতেই আমার চলে গেছে।"

তাই-না শুনে বড়মামিমা আর মেজোমামিমা ঠিক দিদিমার মতন ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেঁদে চোখে আঁচল দিলেন, এ আমার নিজের চোখে দেখা।

আজকাল মার নটেমামা বুড়ো হয়ে গেছেন, শ্বশুরবাড়ি যাওয়াও

ছেড়ে দিয়েছেন। সুতির কাপড় পরলে গা কুট্‌কুট্‌ করে বলে গরদ ছাড়া কিছু পরেন না। এমনি তেল ঘি সহ্য হয় না বলে গাওয়া ঘিতে ওঁর সব রান্না হয়, রাত্রে গাওয়া ঘি দিয়ে লুচি হয়। দুর্বল হয়ে গেছেন বলে রোজই কি বলে—ইয়ে মুরগি হয়। ছাঁচি পান আসে, অম্বুরি তামাক আসে।

থেকে-থেকে নটেমামা সবাইকে ডেকে বলেন, "ওরে আমি গেলে তোরা ঝগড়া করিস না রে, প্রচুর আছে, প্রচুর আছে।"

আমরা হিসেব করে দেখেছি দিদিমা দাদামশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি নটেমামা স্বর্গে যেতেন, একদিক দিয়ে ভালোই হত। ওঁরও সব জ্বালা জুড়োত আর সুটকেসও মোটে একুশ ভাগ হত। এই পাঁচ বছর আরো সবাই জন্মে-টন্মে একাকার কাণ্ড করেছে। এখন বেয়াল্লিশ ভাগ হবে।

আমরা মনে করে রেখেছি সুটকেসে হীরে-মণি-মুক্তো আছে। মনে করেছি বোধ হয় তোড়া-তোড়া হাজার টাকার নোট ঠাসা, তাই গোপনে সুটকেস নেড়ে দেখেছি ভেতরে কিছু নড়ে না। বেশ হালকাও।

যাই হোক, গত বছরের শেষে একদিন সন্ধেবেলা নটেমামা সত্যি সত্যি পটোল তুললেন। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি, ঘরে তেলের বাতির আলোতে নটেমামা মলেন।

মামিমারা হু-হু করে একবার কেঁদে নিয়েই সুটকেসটাকে টেনে বারান্দায় আনলেন। নটেমামার বালিশের তলা থেকে চাবি বের করলেন। দেশলাইয়ের আলোতে খুললেন।

খুলে দেখলেন শুধু খড় ঠাসা। না, শুধু খড় নয়, তার উপর একটা কাগজে লাল পেনসিল দিয়ে লেখা :

"কাউকে কভু লাই দিস নে,
করিস নে কো বিশ্বাস।
বুদ্ধি তোদের দেখে দেখে
নটে ফেলছে নিঃশ্বাস!"

হারানো জিনিস

ভেবেই পেলাম না আংটিটা গেল কোথায়। খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। অথচ ব্যাপারটা বলাও যায় না কাউকে। মাসি ওটাকে স্নানের ঘরে তাকের উপর ভুলে ফেলে এসেছিল। স্রেফ ওকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য আমি ওটাকে নিয়ে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। তার পর যে কি করলাম সে আর কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। মোট কথা পকেটে এখন আর সেটা নেই। পড়েই গেল কোথাও, নাকি কোনো-একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম সে আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না; ঐ আমার একটা মুশকিল হয়েছে, কিচ্ছু মনে রাখতে পারি না। পড়াশুনো না, কাজের কথা না, আংটির বিষয় না; এক কথায় খেলা ছাড়া আমার কিচ্ছু মনে থাকে না। পেয়ারাগাছের তলায়, খেলার মাঠে ভালো করে খুঁজে এসেছিলাম, তা ছাড়া বইয়ের তাকের পিছনে, আমার সেই খালি কোকোর টিনটাতে, ছাদের আলসের ঐ ফাঁকটাতে, কোথাও আর দেখতে বাকি রাখি নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়।

খাসা আংটিটা ছিল, সোনার একটা গোল মতো, তার মাঝখানে একটা মস্ত সবুজ পাথর, তার দুপাশে দুটো সাদা পাথর জ্বল্‌জ্বল্ করছে। আমার খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে কি হবে? আরেকবার উঠে খুঁজে এলাম, দিদির পড়ার টেবিলে, বাবার রুমালের দেরাজে, ভাঁড়ার ঘরে, যে-সব জায়গায় কখনই আংটি থাকতে পারে না সে-সব জায়গা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখে এলাম। কোথাও নেই।

বাড়ির লোকরা কেউ জানেও না ওটা আমি নিয়েছিলাম। এখন আর বলাও যায় না কাউকে। ওরা চাকরদের সন্দেহ করছে, ঠাকুরকে কিম্বা পাতির মাকে, কিম্বা ধুনিয়াকে। খুব বকাবকিও করছে, বলছে মাইনে কাটবে, পুলিশে ধরিয়ে দেবে, তাড়িয়ে দেবে। চাকররা খুব ভয় পেয়েছে, ধুনিয়া সিঁড়ির নীচে বসে কাঁদছিল। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না, এত খারাপ লাগছে। কিন্তু আসল কথা এতক্ষণে প্রকাশ

করলেও আংটি তো আর ফিরে আসবে না। মাঝখান থেকে আমার পিঠের চামড়াও আস্ত থাকবে না, আমি যে নিজে একটু খোঁজখবর করব তারও জো থাকবে না। ইস্ আংটিটাকে সত্যি যদি চোরে নিত, তবে কি ভালোই যে হত! দিদিমার খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, দুপুরে খাবার পর থেকে কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম। ভারি তো একটা ছোট্ট আংটি, আমার ডান হাতের মাঝের আঙুলে ঢুকলই না! তাই নিয়ে এত কাণ্ড! মা বললেন নাকি ঐ নিয়ে মাসির শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হতে পারে। যেমনি মাসি, ঠিক তেমনি তার শ্বশুরবাড়িটিও। আরে আমার অত বড় কলমটা হারিয়ে গেল তবু কিছু অশান্তি হল না, বরং মেজোকাকা বলল—বেশ হয়েছে! ঠিক হয়েছে! খুব খুশি হয়েছি!—আর ঐ একটা ক্ষুদে আংটি সে আবার স্নানের ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল, তাই নিয়ে ক্যায়সা হৈ-চৈ লাগিয়েছে দ্যাখ-না!

আচ্ছা ভেবেই দেখা যাক-না, কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম। খেয়ে উঠে পেয়ারাগাছে; সেখানে দেখেছি, নেই। তার পর খেলার মাঠে মাছ ধরার জন্য পিঁপড়ের ডিম আনতে; সেখানেও নেই। তার পর ছিপটিপের জন্য চিল-ছাদের ঘরে, সে জায়গাটাকে তো গোরু-খোঁজা করে ফেলেছি। কি সব পড়ে-টড়ে ভেঙেচুরে, রসের মতো বেরিয়ে, এটাতে-ওটাতে মেখে গিয়ে একাকার কাণ্ড হয়ে আছে। তাই নিয়ে আবার কাল হবে এক চোট। যাই হোক, সেখানেও নেই। তা হলে বাকি থাকে পুকুরধার। আগাগোড়া খুঁজেছি। এক যদি জলে পড়ে গিয়ে থাকে, মাছ খেয়ে ফেলে থাকে। কিন্তু তাই-বা হবে কি করে? শেষ মুহূর্তে তো ছোটমামা আমার হাত থেকে ওদের ছিপটিপ কেড়ে নিয়ে কান মলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ততক্ষণে বাড়িতে আংটি নিয়ে খোঁজখুঁজি লেগে গেছে, ওদের কারো মেজাজেরও ঠিক ছিল না। মাছ ধরাও বন্ধ, কাজেই লাগাও কানমলা।

তার পর সেখান থেকে বটগাছ তলায়। ইস্, কি অদ্ভুত জায়গাটা! চারি দিক থম্‌থমে, চুপচাপ। দিনের বেলায় ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, ঘন পাতার মধ্যে দিয়ে একটু একটু আলো আসছে, বাদুড় চামচিকের সোঁদা গন্ধ। অদ্ভুত জায়গাটা। আর গাছের গোড়ায় সে যে কতকগুলো কি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম সে আর কি বলব। সাদা, হলদে, গোলাপী, ভিজে-ভিজে মতো, কতকগুলো ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, কতকগুলো ঠিক

হাট্টিমাটিমটিমের ডিমের মতো। কতকগুলো অবিকল ছাতা প্যাটার্নের। ওগুলোকে তাই ব্যাঙের ছাতা বলে। সাহেবরা ভেজে খায়। কতকগুলো খেলে আবার মরেও যায়। সাংঘাতিক জিনিস। ভীষণ তাড়াতাড়ি বাড়ে, সামনে একটা টুল নিয়ে বসে থাকলে নাকি দেখা যায় একটু একটু করে চোখের সামনে বাড়ছে তো বাড়ছেই।

তার পর বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। মনে হল সেইখানে গিয়ে সত্যি একটা টুলের উপর বসে আছি, আর সামনে একটা গোল ব্যাঙের ছাতা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর আমার টুলটাও সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠছে। টুলটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে কেন? বুঝলাম ওটা টুল নয়, ওটাও একটা ব্যাঙের ছাতা, তাই আমার কালো পেন্টেলুনটাও ভিজে সপ্ সপ্ করছে। কালো পেন্টেলুন আবার কি? আমার পরনে তো খাকি পেন্টেলুন। ঝট্ করে চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। খাকি পেন্টেলুনই তো বটে!

এক দৌড়ে উপরে মার শোবার ঘরে খাটের তলা থেকে আমার ছাড়া কাপড়গুলো টেনে বের করলাম। ঐ তো ভিজে স্যাঁতসেঁতে ব্যাঙের ছাতার গন্ধওলা আমার সেই কালো প্যান্টটা। ঐখানেই তো ছেড়ে রেখেছিলাম। নাহয় একটু ভুলেই গিয়েছিলাম। বলেইছি তো খেলার কথা ছাড়া কিচ্ছু মনে থাকে না। এই তো প্যান্টের পকেটে আংটিটাও রয়েছে। বলি নি পকেটেই রেখেছিলাম, যাবে কোথায় বাছাধন! যাই, মাসিকে দিয়ে আসি। বলি গিয়ে স্নানের ঘরের তাকেই ছিল। ছিলই তো। সকালে তো সেইখান থেকেই তুলে রেখেছিলাম, আবার কোত্থেকে পাব? মাসি স্নান করে অসাবধান হয়ে আংটি ফেলে গেল। আমি তার পরেই স্নান করতে এসে ভালো মনে করে, ওকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য, ওটাকে একটুক্ষণের জন্য পকেটে রেখেছিলাম। অথচ এ বিষয়ে কিছু খুলে বলতে গেলে আমাকে এরা আস্ত রাখবে না। যাই, বলি গিয়ে স্নানের ঘরে তাকের উপর পেয়েছি।

গুপ্তধন

আমার বন্ধু জগাই কী ভালো! পড়াশুনো সেরকম একটা ওর আসে না বটে কিন্তু কি চমৎকার মাউথ-অর্গান বাজায়। আর টিফিনের সময় আমাকে কতদিন আলুকাবলি খাওয়ায়। তা ছাড়া দুই কান নাচাতে পারে, জিভ দিয়ে নাকের ডগা ছুঁতে পারে। তবে পড়া-টড়ায়, সত্যি কথা বলতে কি বেজায় খারাপ। সেদিন ইতিহাস ক্লাসে সাজাহানের বাবার নামও বলতে পারল না, আবার ছেলের নামও বলতে পারল না। অবিনাশবাবু তো চটে কাঁই, ক্লাসসুদ্ধ ছেলের সামনে ওকে যা নয় তাই বললেন, আর ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনি জানি একটা কিছু হয়েছে।

বাড়ি যাবার পথে আমাকে বললে, "পড়াশুনো ছেড়ে দেব ভাবছি।" আমি বললাম, "তবে কি বড় হয়ে গোরু চরাবি?" জগাই কাষ্ঠ হেসে বললে, "তোরও যেমন বুদ্ধি! বুঝলি, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি!" আমি একেবারে থ। বলে কি! আমার তো ধারণা ছিল যেখানকার যত গুপ্তধন লোকরা এতদিনে খুঁজে বের করেছে।

জগাই বলল, "আমাদের ঐ বাড়িটা কি আজকের মনে করিস নাকি? কম-সে-কম ওর বয়স একশো বছর। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহি-বিদ্রোহের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আপিস থেকে বুদ্ধি করে টাকা সরিয়ে ওটাকে আগাগোড়া তৈরি করে ফেলেছিলেন।"

তার পর একটু চুপ করে থেকে জগাই বলল, "কাল চিলে-কোঠার পুরনো বাক্স-প্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওঁর ডায়েরি খুঁজে পেয়েছি। তাতে যে-সব কথা লেখা আছে সে-সব শুনলে তোর চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে, দাঁত-কপাটি লেগে যাবে। ওরই মধ্যে গুপ্তধনের কথাটাও আছে। সাধে কি আর কোথায় কোন কালে কে কার ছেলে ছিল কি বাবা ছিল তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাই না! আমাকে তো আর আপিসে চাকরি করতে হবে না!"

আরেকটু থেমে জগাই হঠাৎ বলল, "কিন্তু ভাই, তোকে একটু

সাহায্য করতে হবে। আমাদের বাড়িটা জানিসই তো। দিনের বেলায় যদি-বা গুপ্তধনটা খুঁজে বেরও করি, ঐ-সব বুড়োগুলোর জ্বালায় তাতে আমার আর হাত দিতে হবে না। অমনি আমাকে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ভাগবাঁটরা করে নেবে। দ্যাখ্, রাত্রে কাজ হাসিল করতে হবে। আজ খেলার মাঠের পর আসিস একবার, শনিবার আছে, আজ রাতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু ভাই জানিসই তো আমার যা ভূতের ভয়, তোকে সঙ্গে থাকতে হবে।" কি করি বলো, আমার বুজুম ফ্রেণ্ড। তা ছাড়া গুপ্তধন পাওয়া গেলে আমাকেও একটু ভাগ দেবে বলল। গেলাম খেলার মাঠের পর। চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে চিলের ছাদে উঠে মোমবাতি জ্বেলে ঠাকুরদার ঠাকুরদার ডায়েরি পড়লাম।

সে কি কাণ্ড! হলদে তুলোট কাগজে সবুজ কালি দিয়ে কি সব হিজিবিজি লেখা, না আছে তার বানানের মাথামুণ্ডু, না যায় তার অর্ধেক বোঝা। কিন্তু গুপ্তধনের কথাটা সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই।

পড়ে মনে হল বুড়োর দুটি বাবাজীবন অর্থাৎ ঘরজামাই ছিলেন; দুটিই যেন সাক্ষাৎ রত্ন! সারাদিন খাই-খাই আর মখমলের বিছানায় টেনে ঘুম। ওদের গিলে-করা পিরান আর কিংখাপের জুতো আর অম্বুরি তামাক জুগিয়ে জুগিয়ে বুড়ো নাকাল। এদেরই হাত থেকে 'পরম-রত্ন' অর্থাৎ কিনা ঐ গুপ্তধন না লুকিয়ে বুড়োর নিস্তার ছিল না। যে-ই সুবিধে পাবে অমনি সেটি হাতাবে। অথচ বাড়িতে রোজ পণ্ডিত আসে, কিন্তু পড়াশুনা তাকে তোলা।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা লিখছেন, "চখ্খু হইতে নিদ্রা ঘুচিয়াছে। উহারা সৌখিনতায় ডুবিয়া দিনে দিনে রসাতলে যাইতেছে। উহাদের চিত্তে বড় লোভ জাগিয়াছে। সর্বদা পরম-রত্নের উপর দৃষ্টি, যেন উহাকে বাগাইতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়। উহা একবার হস্তগত করিলে নিঃসন্দেহে জুয়া খেলিয়া সর্বস্ব ফুঁকিয়া দিবে।"

তার পরের দুটো পাতায় দুধ না কি যেন পড়ে ধেব্ড়ে গেছে, কিচ্ছু পড়া যাচ্ছে না। তার পরের পাতায় স্পষ্ট করে লেখা, "অগত্যা নিরুপায় হইয়া পরম-রত্ন গুম্ করিয়াছি। গৃহিণীরও ওদিকে দুর্বলতা। মহা অশান্তি করিতেছেন। আমারও ভোলা মন, সেই কারণে গুহ্যস্থানের এই নক্শা রাখিতে বাধ্য হইলাম। সুখের বিষয় বাবাজীবনদিগকে মাধব পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দিতে সখ্খম হইয়াছি।" বাস্ ঐখানেই ডায়েরি

শেষ। তার পরেই বোধ হয় আনন্দের চোটে বুড়ো মলো আর গুপ্তধনের কথাও কেউ জানতে পারল না। জগাই বলল, "এ ডায়েরি বুড়ো চিল-ছাদের কার্নিশের নীচে গুঁজে রেখেছিল, কাল আমি এটাকে খুঁজে বের করেছি, আজই পরম-রত্ন খুঁজে বের করতে হবে। তার পরে পড়াশুনো ছেড়ে দেব। তাই আজ মিছিমিছি হোমটাস্কগুলো টুকি নি।"

নক্‌শা জলের মতো সহজ। বাবাজীবনদের হাতে পড়লেই সর্বনাশ হয়েছিল। এক নিমেষে পরম-রত্ন খুঁজে বের করে জুয়ো খেলে সব ফুঁকে দিত। নক্‌শায় আঁকা ওদের পুকুরধারের বুড়ো বটগাছ্। তার বরাবর উত্তরে বারো হাত একটা রেখা, তার বরাবর পুবে আবার বারো হাত। সেইখানে একটা ক্রশ আঁকা। অর্থাৎ কিনা ঐখানেই!

জগাই কোত্থেকে একটা শাবল, একটা মাপবার ফিতে আর একটা টর্চ এনে রেখেছিল। গেলাম পুকুরের পাড়ে। সূর্য ডুবলেই জগাইটার এমনি ভূতের ভয় যে, একটু-একটু বিরক্তও লাগছিল। আরে তোরই ঠাকুরদার ঠাকুরদা গুপ্তধন লুকিয়েছে, তোর ভয় করলে চলবে কেন! তা নয়, দূরে শেয়ালের ডাক শুনে ভয় পাচ্ছে, বটগাছের ডাল থেকে শেকড় ঝুলছে দেখে ভয়ে কিচ্ কিচ্ করে উঠছে, আর টর্চের আলোতে বটগাছের ডালের ছায়া দেখে তো আরেকটু হলেই ভিমি যাচ্ছিল।

যাই হোক, অনেক কষ্টে মাপজোক করে জায়গাটা পাওয়া গেল। তার পর আমি টর্চ ধরে ওকে বললাম, "এবার খুঁড়ে দ্যাখ্।" ও শাবল দিয়ে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে আট-দশ কোপ দিয়েই বিরাট এক গর্ত বানিয়ে ফেলল। তার পর ঠং করে একটা শব্দ হতেই আমার খুব ফুর্তি লাগল। কিন্তু জগাইটা দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, "যদি ডালা খুলতেই ওর মধ্যে থেকে কিছু উঠে বসে!"

শেষটা ওকে ঠেলে সরিয়ে, ওর হাতে টর্চ দিয়ে, আমিই একটা এক হাত লম্বা, আধ হাত চওড়া তামার বাক্স টেনে বের করলাম। তার তালাটালা ভেঙে গেছে। ঢাকনিটা খুলে ফেললাম। ভাবলাম হীরে-মণি-মুক্তোর উপর আলো পড়ে নিশ্চয় চোখ ঝলসে যাবে।

টর্চের আলোতে দেখলাম বাক্সর নীচে এক প্যাকেট পুরনো হাতে-আঁকা তাস পড়ে রয়েছে। তাদের পিঠের উপর বড় করে লেখা—'পরম-রত্ন'। তার নীচে ছোট্ট করে লেখা 'প্লেয়িং কার্ডস'।

উপরে লেখা—'পরম-রত্ন'। তার নীচে ছোট্ট করে লেখা 'প্লেয়িং কার্ডস'।

জগাই আস্তে আস্তে টর্চ নামিয়ে রেখে বললে, "সোমবারের হোম-টাস্কগুলো লিখে দিতে ভুলিস না।"

টাকাচুরির খেলা

প্রথম যখন গণ্‌শার সঙ্গে আলাপ হল সে তখন সদ্য-সদ্য নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস থেকে নেমেছে। চেহারাটা বেশ একটু ক্যাবলা প্যাটার্নের, হলদে বুট পরেছে—তার ফিতেয় আবার দু-জায়গায় গিঁট দেওয়া; খাকি হাফ-প্যান্ট, আর গলাবন্ধ কালো কোট—তার একটাও বোতাম নেই, গোটাতিনেক বড়-বড় মরচে-ধরা সেফ্‌টিপিন আঁটা। তার উপর মাথায় দিয়েছে সামনে-বারান্দাওয়ালা হলদে-কালো ডোরা-কাটা টুপি। দেখে হেসে আর বাঁচি নে।

ছোটকাকা সঙ্গে ছিল, গণ্‌শার দাদাকে ডেকে বলল, "ওহে হরিচরণ, এটি আমার ভাইপো। তোমার ছোটভাইয়ের সঙ্গে মিলবে ভালো।" তাই শুনে গণ্‌শা রেগে কাঁই, "অত ছোটভাই, ছোটভাই করবেন না মশাই। আর, ঐ কুচো-চিংড়িটার সঙ্গে মিলবে ভালো, শুনলেও হাসি পায়।"

ছোটকাকার মুখের রঙটা কিরকম পাটকিলে মতন হয়ে গেল। ঢোক গিলে বললে—"বটে!" সে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ!"

অথচ শেষ অবধি ঐ গণ্‌শাকেই আমি বিষম ভক্তি করলুম।

সে এক মস্ত উপাখ্যান।

ছুটির দিন দুপুরবেলায় নিরিবিলি ছাদের ঘরের মেঝেতে বেশ আরাম করে উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটোকে উঁচুবাগে তুলে একটা চেয়ারের পায়াতে লট্‌কে, দিব্যি করে নিজের মনে দাদার টিকিটের এ্যালবামে নতুন নতুন পাঁচ-পয়সার টিকিট সারিসারি মারছি, কারু কোনো অসুবিধে করছি না কিছু না, এমন সময়ে "ওরে গবা, গবা রে!" বলে বাপ্‌ রে সে কি চিল্লানো! আর এরা আমায় কিনা বলে যে গোলমাল করি! সেই বিকট গোলযোগ শুনে তাড়াতাড়ি টিকিট-এ্যালবামটা লুকিয়ে ফেলে নীচে যেতে যাব, ভুলেই গেছি যে পা দুটো চেয়ারে লট্‌কানো,
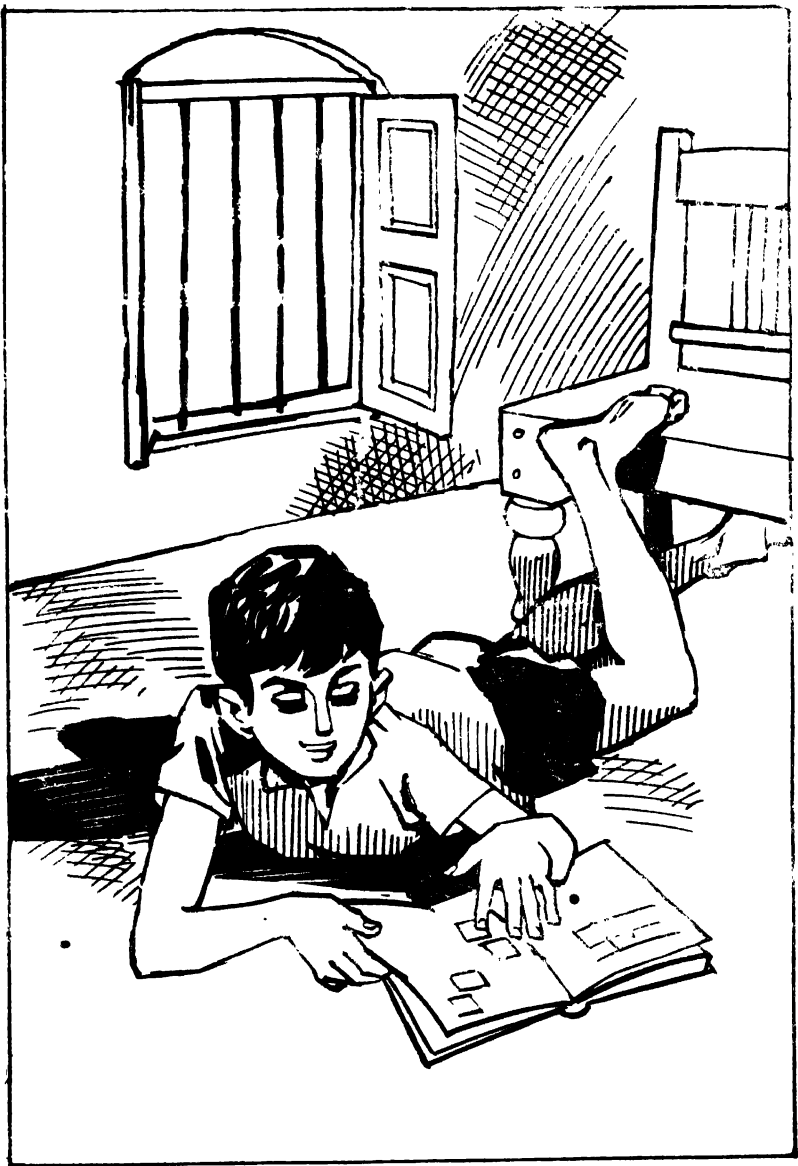
দুপুরবেলায় ছাদের ঘরে দাদার টিকিটের এ্যালবামে টিকিট মারছি।

তাড়াতাড়ি পা টেনে নামাতে গিয়ে চেয়ার উলটে গেল, তার উপর দিদিটা হাঁদার মতন দুটো ফুলদানি রেখেছিল, সে তো গেল ভেঙে ; সব চেয়ে খারাপ হল ; আমার আধ-খাওয়া পেয়ারাটা ছিটকে গিয়ে ঘরের কোণে পিসিমার গঙ্গাজলের হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গেল।

এই-সমস্ত ঘটনাতে আমার যে একেবারে কোনো দোষ ছিল না এ কথা যে শুনবে সেই বলবে। অথচ এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে দাদা দিদি পিসিমা এমন হৈ-চৈ লাগাল, যেন তাদের ঘরে চোর সিঁদ কেটেছে! বাবা পর্যন্ত আমার দিকটা বুঝলেন না, বললেন, "দোষ করে আবার কথা!"

এর পরে যখন ছোটকাকা গোলমাল শুনে দাড়ি কামাতে-কামাতে এসে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল—"অনেকদিন থেকেই বলছি ও ঝুড়ি-ভাজা ছেলেকে বিদেয় কর, তা তো কেউ শুনলে না! এখন জেল-খানাতেও ওকে নিতে রাজি হবে না। সময় থাকতে নারানবাবুর ইস্কুলে দিয়ে দাও নইলে নাকের জলে চোখের জলে এক হবে।" মনে মনে বুঝলাম, ছোটকাকার নতুন সাদা জুতোয় সেই যে কলম ঝাড়বার সময়ে সামান্য তিন-চার ফোঁটা কালি পড়েছিল, ছোটকাকা এখনো সে কথা ভোলে নি। দিক গে বোর্ডিংয়ে, এদের চেয়ে খারাপ বোর্ডিংয়ে কেন, নরকেও কেউ হতে পারে না। তাই রেগে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলাম—"তাই দাও-না, তাই দাও-না, তাই দাও-না! এদিকে নিজে যখন বায়স্কোপ দেখে দেরি করে বাড়ি ফিরে বাবার কাছে তাড়া খাও, তখন—"

বাবা বললেন—"চোপ্!"

এরই ফলে ছুটির পরে যখন ইস্কুল খুলল, আমি গেলুম নারান-বাবুদের বোর্ডিংয়ে। বেশ জায়গা, বাড়ির থেকে ঢের ভালো। প্রথমটা সকাল বেলা হালুয়া খেতে বিশ্রী লাগত। তার পর দেখলাম ওতে খুব ভালো ঘুড়ি জুড়বার আঠা হয়। এ ছাড়া বোর্ডিংয়ের আর সব ভালো।

গণ্শাও দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে সে আমাদের ঘরে থাকে না।

প্রথম দিন শুতে গিয়ে দেখি আমাদের ঘরে ছজন ছেলে। পাঁচজন ছোট আর একজন বড়। আমাদের ঘরের বড় ছেলেটি ঠিক বড় নয়, বরং মাঝারি সাইজের বললে চলে। কিন্তু তার তেজ কি! তার নাম

পানুদা, তার কাজ নাকি আমাদের সামলানো, আর তাই করে-করে নাকি তার ঠাণ্ডা মেজাজ খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্‌ করার ফলে দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম পানুদা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। নিয়ম করে ক্লাসের লাস্ট বয়ের ঠিক উপরে হয়। কিন্তু তার মন খুব ভালো, লাস্ট বয়কে খুব সাহায্য করে। আমাদের ঘরের নিলু বলল, সেই সাহায্যের ফলেই নাকি লাস্ট বয় বেচারা চিরটা কাল লাস্টই হচ্ছে।

যাই হোক, আমি এ-সমস্ত কথা বিশ্বাস করি নি, কারণ আমাদের ঘরে দেখতাম তার খুব বুদ্ধি খোলে। নিজে লুকিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়তে আর আমরা কোনো অন্যায় করলে ধরে ফেলতে তার মতন ওস্তাদ আর দুটি হয় না। এই পানুদাই সেদিন বিষম বিপদে পড়ল, আমরা তো সবাই থ!

সে এক অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার।

পানুদা আর তার গুটি-পাঁচেক ক্লাসের ছেলে প্রায়ই ভোজ মারে। সবাই মিলে টাকা জমিয়ে পানুদার কাছে দেয় আর এক শনিবার বাদে এক শনিবার চপ, কাটলেট, ডিমের ডেভিল আরো কত কি-র ব্যবস্থা হয়। আমায় একবার একটা ঠোঙা ফেলতে দিয়েছিল, আমি সেটা একটু শুঁকে আর-একবার চেটে 'কী পেলুম না, কী পেলুম না' করে আর ঘুমুতে পারি নি।

পানুদার কাছে তো পিঁপড়েটি আদায় করা দায়, তাই আমরা ছোট ছেলেরা নিজেরা একবার পয়সা জমাতে চেষ্টা করেছিলাম। সে আর-এক কেলেঙ্কারি। জগা আজ চার-আনা দিল, আবার কাল বলে, "দে বলছি আমার চার-আনা, আমি পেনসিল কিনব।" যত বলি "পেনসিল কিনবি কি রে, ও দিয়ে যে আমরা চপ-কাটলেট খাব রে!"—জগা বলে, "ইয়ার্কি করবার জায়গা পাস নি! দে বলছি নইলে এক রদ্দা কষিয়ে দেব!" পারলে বোধ হয় চার-আনার জায়গায় ছ-আনা নেয়। এমনি করে আমাদের সাড়ে তিন-আনার বেশি জমলোই না। তাও জমত না, নেহাত মণ্টু জ্বর-টর হয়ে বাড়ি চলে গেল আর পয়সা-গুলো চেয়ে নিতে ভুলে গেল।

যাই হোক পানুদারা এদিকে সাড়ে তিন-টাকা জমিয়েছিল। রাত্রে শুনলাম পাশের খাট থেকে পানুদা বলছে—"আট-আনার বরফি, আট-

আনার চিংড়ি মাছের কাটলেট, চার-আনার ছাঁচি পান—" শুনে শুনে আমার গা জ্বলতে লাগল। জিভের জল গিলে গিলে পেটটা ঢাক হয়ে উঠল।

পরদিনই কিন্তু পানুদা বিষম বিপদে পড়ল। লাইব্রেরিতে পানুদা আর সমীরদা আর কে যেন একটা ছেলে পেল্লায় আড্ডা দিচ্ছে, পানুদা চাল মেরে কি একটা কুস্তির প্যাঁচ দেখাতে গেছে আর স্লিপ করে কাচের আলমারির দরজা-টরজা ভেঙে চুরমার! পানুদা উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় হেডমাস্টারমশাই এসে এমনি বকুনি লাগালেন যে পানুদা চমকে গিয়ে নিজের আলজিভ-টিভ গিলে বিষম-টিষম খেয়ে যায় আর কি!

হেডমাস্টারমশাই এমনি রেগে গিয়েছিলেন যে এ-সব কিছু না-দেখে বললেন, "বাঁদুরে ব্যবসা ছেড়ে এখন মানুষের মতন ব্যবহার শেখো। তোমাকে বেশি জরিমানা কোত্থেকে করি, কিন্তু তোমার বাক্সে যা টাকাকড়ি আছে সমস্ত দিয়ে যতগুলি কাচ হয় কিনে দেবে; তা দিয়েও যে অর্ধেকের বেশি হবে তা তো মনে হয় না।"

সেদিন পানুদার মেজাজ দেখে কে! রাত্রে আমরা ঘরে বসে শুনলাম পানুদার চটির শব্দ—অন্যান্য দিনের মতন চট্‌চট্‌ চটাং, চট্‌চট্‌ চটাং না হয়ে একেবারে চটাং চটাং চটাং! বুঝলাম পানুদা রেগেছে।

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দেখলাম আসলে আরো ঢের বেশি রেগেছে। ঘরে ঢুকেই পানুদা আমার আর কেষ্টর মাথা একসঙ্গে ঠুকে দিয়ে বললে, "অত হাসি-হাসি মুখ কেন রে বেয়াড়া ছোঁড়ারা!" আমরা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেলাম। তার পর পানুদা জগার দিকে চেয়ে বলল, "ফের ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করছিস রাস্কেল?" বলে তার কানে দিলে এক প্যাঁচ। হিরু বলল, "ওর সর্দি হয়েছে কিনা—" পানুদা তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "চুপ কর বেয়াদব, তোর কে মতামত চেয়েছে?" তার পর সময় কাটাবার জন্য শিবুর কানের কাছের খোঁচা-খোঁচা চুলগুলো সব নখ দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে টানতে-টানতে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, "আজ তোদের কাছ থেকে যদি টুঁ শব্দটি শুনি, সব কটাকে কচুকাটা করে ফেলব বলে রাখলাম।"

ঘরের মধ্যে একদম চুপ। পানুদা ঘরে বসে পা দোলাতে লাগল আর বোধ হয় হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা ভাবতে লাগল। এমন সময়ে

সেই গণ্শাটা এসে হাজির। এসেই পানুদার পিঠ থাবড়ে একগাল হেসে বললে, "কি রে পেনো, ফিস্টিটা ভেস্তে গেছে বলে বুঝি মুখখানা হাঁড়ি আর কচি ছেলের উপর উৎপাত? রোজ বলি: ওরে পেনো, একা-একা অত খাস নি!"

পানুদা গুম হয়ে রইল। গণ্শা বললে, "তাই বলে কি টাকাগুলো সত্যি দিবি নাকি?"

পানুদা বলল, "দেব না তো কি তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে?"

গণ্শা হেসে বললে, "আরে রামঃ! এমন এক উপায় বাতলাতে এলুম, তোকেও দিতে হবে না আমাকেও দিতে হবে না। আজ রাত্রে দরজা খুলে শুবি, দেখবি একটা ডাকাত এসে সব টাকা নিয়ে যাবে। পরে হয়তো ফিরে পাবি, কিন্তু ডাকাতটাকে খাওয়াতে হবে বলে রাখলুম।"

পানুদা হাঁ করে খানিক তাকিয়ে বলল, "সে দেখা যাবে এখন। এ সময়ে তুমি এ ঘরে যে এসেছ, জানো না রুল থ্রি?"

গণ্শা বললে, "সাধে শাস্ত্রে বলে, 'কদাচ কাহারো উপকার করিয়ো না'?"

মুখে পানুদা যতই তেজ দেখাক-না কেন, শোবার সময়ে দেখলুম দরজাটা ঠিক খুলে শুল। অন্য দিন তো পারলে জানলাও বন্ধ করে, আমাকে দিয়ে খাটের নীচে খোঁজায়, রাত্রে উঠবার দরকার হলে জগাকে আগে একবার পাঠায়, আর সেদিন দেখি বেজায় সাহস। বালিশে মুখ গুঁজে একটু হেসে নিলাম।

উৎসাহের চোটে আমার অনেকক্ষণ ঘুম হয় নি, অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখি কে যেন টর্চের আলো ফেলছে। পানুদা ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমোচ্ছে আর বাকিরা কেউ যদি জেগেও থাকে ভয়ের চোটে চোখ বুজে পড়ে আছে। আমি দেখলুম কে একটা লোক পা টিপে-টিপে পানুদার বালিশের তলা থেকে চাবি বের করল, পানুদার বাক্স খুলল, কি যেন নিল, আবার বাক্স বন্ধ করে চাবি বালিশের নীচে রেখে আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরদিন সকালে ইস্কুলময় হৈ-চৈ, পানুদার টাকা চুরি গেছে। হেডমাস্টারমশাই সবাইকে ডেকে যাচ্ছেতাই করে বকালেন, সকলের বাক্স খোঁজা হল। কোথাও কিছু নেই। গণ্শার বাক্সে তো এত কম

জিনিস, এবং তাও এত নোংরা যে তাই নিয়ে গণ্‌শা বেজায় বকুনি খেল।

সেদিন রাত্রে পানুদার হাসি-হাসি মুখ। আজ কাউকে কিছু তো বললেই না, এমন-কি, যে-পানুদা শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলে আমাদের শার্ট থেকে বোতাম কেটে নিজের শার্টে লাগিয়ে নিত, সে নিজের থেকেই জগাকে দুটো আস্ত খড়ি দিয়ে ফেলল।

এমন সময়ে গণ্‌শা আবার ঘরে ঢুকল।

"কিরে পেনো! শেষটা সত্যি ডাকাত পোলো তোদের ঘরে?"

পানুদা খুব হেসে বলল, "দিস ভাই, তোরও নেমন্তন্ন রইল।"

গণ্‌শা যেন আকাশ থেকে পড়ল, "কী দেব রে পেনো! বলছিস কী?"

"কেন, টাকা।"

"কিসের টাকা? টাকা আবার কোথায় পাব রে? দানছত্তর খুলেছি নাকি? আর তা যদি খুলি, তোকে টাকা দেব কেন রে এত যোগ্য লোক থাকতে?"

পানুদা ভয়ংকর চোখে বললে, "দ্যাখ্ গণ্‌শা, ইয়ার্কি ভালো লাগে না। দে বলছি!"

গণ্‌শা বললে, "ইয়ার্কি কি আমারই ভালো লাগে নাকি রে?" তার পর গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগল—

"নিশুত রাতে চোরের সাথে টাকাচুরির খেলা,
ঐ চোর ব্যাটা নিলে সেটা পেনো বুঝলে ঠ্যালা।"

সেই অবধি গণ্‌শাকে আমি ভক্তি করি।

আচার

অমৃতবাজার পত্রিকার টুকরোটা হাতে নিয়ে বাবার প্রকাণ্ড চটি-জোড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোতন খুব লক্ষ্য করে দেখল, পিসিমা এসে নিবিষ্ট মনে খোকনাকে ঠ্যাঙাচ্ছেন।

প্রথমে ডান কান প্যাঁচালেন, তার পর বললেন, "হতভাগা ছেলে !" তার পর বাঁ গালপট্টিতে চাঁটালেন, তার পর বললেন, "তোকে আজ আমি—" তার পর বাঁ কান প্যাঁচালেন—আদা-লঙ্কা দিয়ে ছেঁচব।" তার পর ডান গালপট্টিতে চাটালেন—"তেল-নুন দিয়ে আমসি বানাব।" তার পরে পিঠে গুম্‌গুম্ করে গোটা দশেক কীল কষিয়ে মাথা থেকে চিম্‌টি চিম্‌টি চুল ছিঁড়ে, জুল্‌পি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ঠিক ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে। টিপ্‌ দেখে ঘোতন তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারল না।

আরেকটু হলে নিজেই ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তবেই হয়েছিল ! ভীষণ না রাগলে পিসিমার নাক কখনো ওরকম ফোলে না। অমৃতবাজারের কুচি-টুচি ফেলে ঘোতন তো হাওয়া ! খোকনাটারও যা বুদ্ধি ! এত করে বলে দেওয়া হল যেখানে হেয়ারপিন সেই পর্যন্ত পিসিমা পড়েছেন, আচারের জন্য তার এদিক থেকে কাগজ ছিঁড়িস ! বোকা ভাবলে কি না 'এদিক' মানে পিছন দিক, মনেও গজাল না যে একটু পড়লেই ছেঁড়া পাতা এসে যাবে ! মাথায় কি-চছু নেই, এক যদি গোবর থাকে ! বেশ হল ! আচারও পেল না, ঠ্যাঙাও খেল।

আবার পিসিমার টিপের কথা মনে হল। কি চমৎকার টিপ্ ! সেই যে সেবার ক্রিকেট সিজ্‌ন্‌-এ পানু নিজের ব্যাট দিয়ে খুঁচিয়ে স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে, জিব কেটে, মাথা চুলকে, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে বাউণ্ডারির দড়িতে ঠ্যাং আটকে খুঁটিসুদ্ধ দড়ি উপড়ে এনেছিল। বড়কাকা ছিলেন ক্যাপ্টেন, তিনি এক হাতে পানুর শার্টের কলার আর-এক হাতে পেন্টেলুন ধরে তাঁবু থেকে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়া টপ্‌কে ওপারে ফেলে দিয়েছিলেন, আর পিছন পিছন ওর জুতো, প্যাড্,

গ্লাভ্‌স্‌, ব্যাট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, প্রত্যেকটা ওর গায়ে লেগেছিল! বাজে প্লেয়ার হলে কি হবে কিরকম টিপ্‌! পিসিমারই-বা হবে না কেন, ওঁরই তো দিদি!

ঘোতন এদিক-ওদিক ঘুরে আচারের কথা ভুলতে চেষ্টা করল। নাঃ! খোকনাটা আবার কোথায় উধাও মারল, তার যে পাত্তাই নেই!

অনেক খুঁজে দেখা গেল, ঐ যে রেগেমেগে ভালো ভালো ব্যবহার না-করা ডাক-টিকিটগুলো টেবিলের ঠ্যাঙে একটার নীচে একটা লাইন করে দিব্যি থুতু দিয়ে সাঁটছে! ছোঁড়ার সাহস আছে!

ঘোতনা কাছে এসে আস্তে আস্তে জিগ্‌গেস করল—"লেগেছিল?"

খোকনা বললে, "কি লেগেছিল?"

"কি মুশকিল! লাগবে আবার কিসে? আরে ঠ্যাঙানিতে, ঠ্যাঙানিতে!"

"উঁহু!"

"তবে যে দেখলুম মাথাটা এমনি হয়ে গেল?"

"ওরকম মাঝে মাঝে হয়।"

"খাবি নাকি আচার?"

"না!"

"ঘেবড়ে গেছিস?"

"দুৎ! সত্যি বলছি, না।—আচ্ছা তুই আন্‌ তো দেখি।"

ঘোতন এক ছুটে ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে চলে গেল। দরজার বাইরে সারি সারি বড়ির থালা অন্ধকারে এ ওকে ঠেলাঠেলি করে চোখ টিপছে। সারা সকাল মা ছিনু মিনুকে নিয়ে বড়ি দিয়েছেন। ঘোতন দেখেছিল মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি! প্রথমটা বড়ি চ্যাপটা-চ্যাপটা ঘুঁটের মতন হচ্ছিল। যেই মা বললেন যার বড়ি যত উঁচু তার বরের নাক তত উঁচু, অমনি বোকাগুলো টেনে টেনে বড়ির নাক তুলতে লাগল। বুঝবে শেষটা!

যাক, কিন্তু দরজায় যে তালামারা! এ্যাঃ, মিলার-লক! হেয়ারপিন পাকিয়ে ঘোতন তাকে এক মিনিটে শায়েস্তা করে দিল। আজ আর কোনো ভয় নেই। কি করবে পিসি? ঠ্যাঙাবে? ওঃ! ঠ্যাং নেই?

তাকে তাকে আচার! বড় বয়ামে, ছোট বয়ামে, মাটির ভাঁড়ে, পাথরের থালায়, শিশিতে, বোতলে। ঘোতনের চোখ দুটো চার দিকে

পাইচারি করতে লাগলে। ঠিক সেবারের বাঙালি পল্টনের মতন—একটা এগোনো, একটা পেছনো, একটা লম্বা, একটা বেঁটে! বাঁকা লাইন, দুধের দাঁত পড়ে খোকনার যেমন ত্যাড়াবাঁকা দাঁত উঠেছিল সেইরকম। সত্যি সেপাইয়ের মতন। আনাড়ি সেপাইকে যেমন কাঁচা কাঁচা ধরে এনে এক পায়ে ঘাস বেঁধে মার্চ করায়—'ঘাস বিচালি' 'ঘাস বিচালি'! লেফট রাইট লেফট রাইট তো আর বোঝে না!

আজ কে পিসিমাকে কেয়ার করে!

বয়ামের গায়ে টোকা মেরে মেরে ইচ্ছে করে ভিতরের আচারের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

কিরকম একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছিল। ঘরের আনাচে-কানাচে ছুঁচোদের বাবা, মা, দাদা, দিদিরা চুপ মেরে কিসের যেন অপেক্ষা করছে! দেয়ালের গায়ে সুপুরির মতন কেঁদো কেঁদো মাকড়সা খাপ পেতে রয়েছে। ছাদের উপর টিকটিকিরা খচ্‌মচ্‌ করে চলাফেরা করছে। তারা অনেকদিন পায়ের নখ কাটে নি।

বড় বয়ামের পাশে ওটা কি? নিশ্চয় আমতেল, কেটে পড়ার চেষ্টায় আছে। তুলে দেখে—এ মা! আম তো নয়, আরশুলা চ্যাপটা! যেই পেন্টেলুনে হাতটা মুছতে যাবে—এই রে, পিসিমা! ঘোতনের আত্মারাম শুকিয়ে জুতোর সুকতলার মতন হয়ে গেল, হাত-পাগুলো পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল।

পিসিমা বললেন, "দরজার কাছে হাওয়া আটকে দাঁড়ালে আচার ভেপ্‌সে উঠবে।" ঘোতন ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, পিসিমা আবার ডেকে বললেন, "আচার নিয়ে যাও।"

পিসিমা যে কি! বকলেও বিপদে ফেলেন, না বকলেও বিপদে ফেলেন। ঠেঙিয়েও হার মানান, আবার না ঠেঙিয়েও হার মানান। অন্য বুড়োদের মতন একটুও না।

ঘোতনের ভারি লজ্জা করল।

বাঘের চোখ

অঙ্কের ক্লাসে আমার বন্ধু গুপির সব অঙ্ক ভুল হল। আর সে-সব কি সাংঘাতিক ভুল তা ভাবা যায় না। বাঁশগাছের অঙ্কটার আসল উত্তর হল পঁচিশ মিনিট, গুপির হয়েছিল সাড়ে পাঁচটা বাঁদর। অমলবাবু তাই নিয়ে ওকে যা নয় তাই সব বললেন-টললেন। গুপি শুধু অন্যমনস্ক ভাবে হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

টিফিনের সময় আমাকে বলল, "এই ঝাল-মটর খাবি?" আমি একটু অবাক হচ্ছি দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, "দ্যাখ্, আসল জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছি। ও-সব তুচ্ছ কথায় আমার আর কিছু এসে যায় না।"

এই বলে পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করল। পুরু ময়লা কাগজে মোড়া, রাংতা দিয়ে জড়ানো একটা গুলি মতন। বললে, "কি, দেখছিস কি? কাগজটা একবার পড়ে দ্যাখ্।"

লাল কালি দিয়ে খুব খারাপ হাতের লেখা। অনেক কণ্টে পড়লাম, 'অন্ধকারে চোখে দেখার অব্যর্থ প্রকরণ।' তার পর গিজিগিজি করে আরো কত যে কি লেখা তার মাথামুণ্ডু বুঝে উঠলাম না।

গুপি গুলিটাকে আবার কাগজে মুড়ে যত্ন করে বুক-পকেটে রাখল। বললাম, "কি ওটা?"

"কি ওটা! চট্ করে কি আর বলা যায়? তবে সম্ভবত বাঘের চোখের মণি।"

"সেকি! তোমার না বেড়াল দেখলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, ওয়াক আসে, বাঘের চোখের মণি দিয়ে তুমি কি করবে?"

গুপি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "কাকে কি যে বলি! আরে, অন্ধকারে চোখে দেখবার গুণ পাওয়াটা কি যে-সে কথা? পারে সবাই ইচ্ছেমতো জন্তু-জানোয়ার হয়ে যেতে?"

আমি তো অবাক। "আমার ছোড়দাদু কানের মধ্যে কি সব গান-বাজনা ঝগড়াঝাঁটি শুনতে পেতেন, তার পর অনেক ওষুধ-টষুধ করে

তবে সারল ; এও সেই নাকি ?"

গুপে রেগে গেল। বললে, "শোন্ তবে। বড়দিনের ছুটিতে মামাবাড়ি গেছলুম জানিস তো ? প্রত্যেক বছর শীতকালে মামাবাড়ির সামনের মাঠে তিনদিন ধরে মেলা বসে। সে কী বিরাট মেলা রে বাপ্! দেখলে তোর মুণ্ডু ঘুরে যেত। কি থাকে না ঐ মেলায়, সিনেমা, সার্কাস, হিমালয়ের দৃশ্যের সামনে চার-আনা দিয়ে ফটো তোলা, দুমুখো সাপ, যাত্রাগান, কুস্তির আখড়া, বাউল নাচ, দোকানপাট, তেলেভাজা, হাত-দেখানো গণক-ঠাকুর—কিছু বাকি থাকে না।

"পাড়ার লোকে সাতদিন দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। দুদিন আগে থাকতে গোরু-গাড়ির ক্যাঁচ্কোঁচ্, গাড়োয়ানদের ঝগড়া, ভিজে ঘুঁটের ধোঁয়া, আর অষ্টপ্রহর ছাউনি তোলার ঠুক্ঠাক্। মেলার তিনদিন তো গান-বাজনা হৈ-হল্লোড়ে কারো ঘুমুতে ইচ্ছেও করে না। তার পর দুদিন ধরে ভাঙা হাটে সস্তা দরে জিনিস কেনার সে কি হট্টগোল।

"তার পর যে যার গোরু-গাড়ি বোঝাই করে চলে যায়। মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে কতকগুলো উনুন তৈরির পোড়া পাথর, খুঁটি পোঁতার গর্ত, ভাঙা খুরি আর ছেঁড়া চাটাই। কয়েকটি ময়লা কাগজের টুকরো আর শালপাতার ঠোঙা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়তে থাকে। যত রাজ্যের নেড়িকুত্তোরা এসে কি সব খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ যেন শীতটাও কিরকম ঝেঁপে আসে। সে একবার ওখানে ঐ সময় না থাকলে তুই বুঝবি নে।

"তবে যারা মনে করে, মেলা উঠে গেলেই মাঠে আর কিছু বাকি থাকে না, তারা যে কিছু জানে না এই কাগজে মোড়া জিনিসটাই তার প্রমাণ।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম। বললুম, "ও, তুই বুঝি ওটাকে ঐ মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছিলি, তাই বল্। তা এখন ওটাকে নিয়ে কি করতে হবে শুনি ?"

গুপি উঠে পড়ে বলল, "ও! টিট্‌কিরি হচ্ছে বুঝি ? থাক তবে।" বলে সত্যি সত্যি ক্লাসে ফিরে গেল।

পরদিন ছিল শিবরাত্রির হাফ-হলিডে। ধরলাম ওকে চেপে, "না রে গুপি, পুলিটার কথা বলতেই হবে। দুজনে মিলে ওর একটা হিল্লে

করে নিতে পারব।"

আসলে গুপিও তাই চায়। বললে, "বলি নি তোকে আমার মামাবাড়ির নাপিত মেঘলার কথা? রোগা সুঁটকো কুচ্‌কুচে কালো, মাথায় একটাও চুল পাকে নি, তীরের মতো সোজা, একশো হাত দূরে থেকে গাছের ওপর নাকি শকুনের চোখ দেখতে পায়; একদিনে পনেরো মাইল হেঁটে ওর গাঁয়ে গিয়ে আবার সেইদিনই ফিরে আসাকে কিচ্ছু মনে করে না। ওদিকে ও আবার দাদামশাইয়ের বাবারও দাড়ি কামাত। বয়সটা তা হলে ভেবে দ্যাখ্‌।

"তাঁর সঙ্গে নাকি শ্যামদেশে গেছল, সেখানে গভীর বনের মধ্যে কে এক ফুঙ্গি ওকে জল-পড়া করে দিয়েছিল, সেই থেকে নাকি ওর শরীর একটুও টস্‌কায় না। গুম্‌-গুম্‌ করে নিজের বুকে কীল মেরে বলে, 'তোরাই বল, কোন জোয়ানের শরীরে এর চেয়ে বেশি জোর।' ঐ মেঘলাই এই বড়িটাকে কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "কেন, তোকে দিল কেন? তুই কিছু করবি ভেবেছে নাকি মেঘলা?"

গুপি খানিক চুপ করে বলল, "আসল কথা কি জানিস, মেঘলা লিখতে পড়তে জানে না; বড়িটা আসলে কি ব্যাপার বুঝেই ওঠে নি। নইলে কি আর অমনি অমনি দিয়ে দিত ভেবেছিস নাকি। ভীষণ চালাক ঐ মেঘলা, বললে, দুমুখো সাপের ঘরের সামনেটাতে কুড়িয়ে পেয়েছে। বোধ হয় ফেলেই দিচ্ছিল আমি কাগজটার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে, আর কি ওকে হাতছাড়া করি। তখন ব্যাটা আমার কাছ থেকে পঁচিশ নয়া পয়সা নিয়ে, তবে না আমাকে দিল।"

সত্যি বলতে কি, অন্ধকারে দেখতে পাবার আমারও যথেষ্ট ইচ্ছে ছিল। গুপির কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে আরেকবার পড়লাম। একটু অদ্ভুত যে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। বললাম, "আচ্ছা, অন্ধকারে দেখতে পাওয়া মানেই তো অন্ধকারে আমাদের চোখও জ্বল্‌জ্বল্‌ করবে? তার কিন্তু মেলা অসুবিধেও আছে।"

আছেই তো। তাই জন্যে যদি ভয় পেয়ে যাস তা হলে আর তোর এর মধ্যে এসে কাজ নেই। ভীতুদের কম্ম এ নয়। মেঘলার কাছে শুনেছি, ওর দাদামশাই মেলা মন্ত্রতন্ত্র জানত। যেমন, মানুষকে ছাগল করা, ছাগলকে মানুষ করা, এমনি ধারা কত কি। শুধু বড়িটা গিলে

ফেললেই হল না, অত সহজে হলেই হয়েছিল আর কি। নীচে যে-সব লেখা আছে তার কোনো মানে বুঝতে পারলি নাকি?"

মনে হল হয় তো সঙ্কেত লেখা হবেও-বা। কি সব সংখ্যা-টংখ্যা দেওয়া, গোড়াটা এই ধরনের—৩ উ ১ জো সো ১ সো ২ উ মাঝে মাঝে তারা-চিহ্ন দেয়া। শুনেছি লণ্ডনের বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই-সব গোপন সঙ্কেত পড়বার জন্য মাইনে-করা লোক থাকে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি। তা বড়িটা গুপে কিছুতেই দেবে না। শেষপর্যন্ত বড়ি রইল ওর কাছে, কাগজ থেকে লেখাটুকু টুকে নিলাম।

গুপি বার বার আমাকে সাবধান করে দিতে লাগল। "যা তা একটা কিছু করে বসিস নে যেন। মেঘলার কাছে শুনেছি, ওরই এক মামা এক সাধুর সঙ্গে ভাব করে অন্ধকারে দেখার ওষুধ নিয়েছিল, কিন্তু পয়সা না দিয়েই পালিয়েছিল। তার পর থেকে মামা নিখোঁজ কিন্তু ওদের বাড়ির চার পাশে রোজ রাতে একটা বিরাট প্যাঁচাকে উড়ে বেড়াতে দেখা যেত। বড়িটা তাই আমার কাছেই রাখলাম।"

অনেক মাথা ঘামালাম লেখাটা নিয়ে। আমার পিসতুত ভাই মাকুদা কবিতা-টবিতা লেখে, তাই নিয়ে প্রায়ই বকুনি-টকুনিও খায়, ওর কাছে বুদ্ধি নিতে গেলাম। অবিশ্যি বড়ি ইত্যাদির কথা একেবারে চেপে গেলাম। বললাম, এগুলি একটা ওষুধের অনুপান, কিন্তু সঙ্কেতে লেখা।

মাকুদা খুব মাথাটাথা নেড়ে খানিক ভেবে বলল, "এ তো খুব সোজা, দে তো একটু কাগজ পেনসিল।" তার পর কাগজে লিখল, তিনটে উট, এক জোড়া সোনার চেন, একটা সোডাওয়াটার, দুটো উল্লুক এই-সব লাগবে আর কি। তার পর পেনসিলটা পকেটে পুরে মাকুদা উঠে পড়ে বলল, ঐ পেনসিলটা নাকি ওর। অনেকদিন থেকে পাচ্ছে না। অথচ আমি দস্তুরমতো বসবার ঘর থেকে ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। থাক গে। যখন অন্ধকারে চোখে দেখতে পাব, তখন তো আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

ঐ লেখা নিয়ে গুপির সঙ্গে খুব একচোট তর্কাতর্কিও হয়ে গেল। ওর এক বন্ধু আছে, ন্যাপলা, মাথাভরা তেল চুক্‌চুকে কোঁকড়া চুল, এমনি একটা গায়ে-পড়া ভাব যে দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়। আর গুপির তো সে দিনরাত দস্তুরমতো খোসামুদিই করে; তাই দেখে গুপি আবার ওকে একেবারে মাথায় তোলে। ওকে নিয়ে এর আগেও গুপির

ঝোপের মধ্যে থেকে একজোড়া সবুজ চোখ আমার দিকে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

সঙ্গে আমার অনেকবার হয়ে গেছে। সেদিনও একচোট হল।

গুপি আর লোক পায় নি, তাকে দিয়ে লেখাটা পড়িয়েছে। তার নাকি ভারি বুদ্ধি, নাকি পাশা খেলায় বড়দের হারিয়ে দেয়। সে লেখা দেখে বলেছে, ওর মানে তিন ফোঁটা উদক মানে জল, এক জোড়া শোনপাপড়ি, একদানা সোহাগা, আরো দু ফোঁটা উদক দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলতে হবে। বুদ্ধিখানা দেখলে একবার। অথচ গুপি গলে জল। ওরকম বুদ্ধি নাকি কারো হয় না। বেশ একটা রাগারাগির পরে ঠিক হল এখন কিছু করা নয়, এক্ষুনি সার্ এসে যাবেন বরং সন্ধেবেলা গুপিদের পেয়ারাতলায় যা হবার হবে।

সন্ধেবেলায় গিয়ে দেখি পেয়ারাতলা ভোঁ ভোঁ! জায়গাটা দস্তুরমতো নির্জন, পুরনো কালের বাগান, ঝোপঝাপে ভর্তি। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, দূর থেকে রাস্তার শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম, আবার কাছ থেকে বাগানের মধ্যেও নানারকম অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল। কে যেন সাবধানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, লুকিয়ে থেকে কিসে যেন নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা কচ্ছে। বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল।

ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকাতে লাগলাম। গুপির কিছু হয়-টয় নি তো? গুপিই কিছু হয় নি তো? ওর কাছে তো লেখাটাও ছিল, বড়িও ছিল। যদি ঐ ন্যাপলাটার বুদ্ধি নিয়ে বড়ি গিলে বসে থাকে!

হঠাৎ আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ে দেখি দূরে রঙন ঝোপের মধ্যে থেকে এক জোড়া সবুজ চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। মাটি থেকে দু হাত উঁচুতে হবে। কি আর বলব, হাত-পা পেটে সেঁদিয়ে গেল। যাই হোক, গুপির যতই দোষ থাকুক, পুরনো বন্ধু তো বটে! কিন্তু সবুজ চোখ দুটোতে মনে হল কেমন একটা খিদে খিদে ভাব! গুপিই হয় তো ঝোপের মধ্যে থাবা গেড়ে বসে আছে, আমি একটু নড়লেই হালুম করে—

আর দাঁড়ালাম না। যা থাকে কপালে, পড়িমরি করে ছুট্ লাগালাম। একেবারে বাড়িতে এসে থামলাম। সেখানেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? এ বাড়ি তো ওর চেনা, শুঁকতে শুঁকতে যদি এসে হাজির হয়? জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে হয়তো-বা স্বচ্ছন্দে গলে যাবে।

আস্তে আস্তে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। সবে একটু বসেছি, দরজার বাইরে কিসের শব্দ! ছুটে গিয়ে দরজাটাকে ঠুসে ধরলাম।

বাবা জোর করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বললেন, "সন্ধেবেলা তোরা লাগিয়েছিস কি ? ওদিকে গুপিদের ওখানে এক কাণ্ড !"

ভয়ে ভয়ে বললাম, "বেঁধে রেখেছে ?"

বাবা তো অবাক ! "বেঁধে রেখেছে কি ! সে বিরাট এক বাদশাহী জোলাপের বড়ি কি সব দিয়ে খেয়ে একেবারে কুপোকাৎ ! এখন আর নড়বার চড়বার জো নেই। ওটা নাকি ওর মামাবাড়ির কে এক নাপিত মজা করবার জন্য দিয়েছিল। যে কাগজে মুড়ে দিয়েছিল, তাতে কি একটা উল বোনার প্যাটার্ন লেখা ছিল। কাকে দিয়ে পড়িয়েছে সেটাকে, কি বলতে কি বলেছে সে, সোহাগ-টোহাগা দিয়ে বড়ি খেয়ে বাছাধন কুপোকাৎ ! এখন ডাক্তার এসে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়েছে। কি, শুয়ে পড়ছিস যে ? তোরও কি শরীর খারাপ নাকি !"

কিন্তু গুপিদের পেছনের বাগানে তবে ও কার চোখ ?

হরিনারায়ণ

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম নতুন ছেলেটির চেহারার সঙ্গে গিরগিটির চেহারার একেবারে কোনো তফাত নেই। সেই রোগা কাঁকলাশ শরীর সেই লিক্‌লিকে হাত-পা, সেই বিল্‌বিলে চোখ, সেই হঠাৎ-হঠাৎ ইদিক-উদিক তাকানো। এসে বসল ঠিক আমারই পাশে। নগা-বটুরা তাই দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল আর রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ঠিক করলাম ছেলেটিকে এইসা কষে দাবড়ে দেব যে আর জন্মে কখনো আমার দিকে এগুবে না।

এমন সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ছেলেটি বলল, "ভুবন-ডাঙা, ঠ্যাঙাড়ের মাঠ—এই-সব নাম শুনেছিস কখনো ? সেখানে শ্যাওড়া-গাছের ধারে ধারে কেয়া বনের আড়ালে আড়ালে মাটি খুঁড়লে কত যে হাড়গোড় পাওয়া যায় তার ঠিক নেই। বুঝলি, সেইখানে আমার বাড়ি।"

তখন ইতিহাস ক্লাস, অবনীবাবু দেখতে ঐরকম ভালোমানুষ হলে কি হবে, আসলে উনি হলেন একটি কেউটে সাপ। বই থেকে চোখ তুলবার আমার সাহস হচ্ছে না, অথচ ছেলেটি কানের কাছে অনর্গল বকে

ষেতে লাগল, আর সড়্‌সড়্‌ করে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। খুব ঘেঁষে এসে আমার বইয়ের মধ্যে প্রায় মুখ গুঁজে ফেলে বলতে লাগল—

"তুই বন্ধু লোক, তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সারা গুষ্টিটি খুঁজে দেখলে একটাও ভালো লোক পাওয়া যাবে না। সব খুনে, ডাকাত, ঠগ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। কি ভীষণ মিথ্যাবাদী আর কি দারুণ অসৎ যে আমার বাপ-ঠাকুরদারা সে না দেখলে বিশ্বাস করবি না।"

ঘণ্টা পড়ে গেল, অবনীবাবু চলে গেলেন, অঙ্কের বই হাতে করে অনঙ্গবাবু এলেন। উনি হলেন ঐ আরেকজন—অবনীবাবুর মতো, কিন্তু তাঁর চেয়েও সাংঘাতিক। নতুন ছেলেটা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আর খচ্‌খচ্‌ করে সব অঙ্ক টুকে নিতে লাগল। তখন আর বিশেষ কথা হল না। সেই-সব তেলচিটে-বাঁশবেয়ে-বাঁদর-ওঠার অঙ্ক, ও আমার কখনই ঠিক হয় না, আজও হল না। কিন্তু ও ব্যাটা দেখলাম সব ঠিক করে কষে রাখল। যাই হোক, তার পর রতন মাস্টারের বাংলা ক্লাস। ঢিলে-হাতার লম্বা পাঞ্জাবি পরে কোঁচা দুলিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখ করে কোনো দিকে না তাকিয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে লাগলেন, আর ছেলেটা আবার আমার বইয়ে মুখ গুঁজে বলতে আরম্ভ করল—

"বুঝলি, সারা জীবনে ওঁরা কেউ একটা ভালো কাজ করেন নি, লোক ঠেঙিয়ে, লোক ঠকিয়ে, ডাকাতি করে, মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে শেষটা প্রত্যেকে বুড়ো বয়সে হরিনাম শুনতে শুনতে নিজেদের বিছানায় শুয়ে শান্তিতে মারা গেছেন। আর জানিসই তো যারা হরিনাম শুনতে শুনতে মারা যায়, তারা সব্বাই স্বর্গে যায়।"

রতন মাস্টার একটা কবিতা শেষ করে, অন্যমনস্কভাবে চার দিকে একবার তাকিয়ে, আবার আরেকটা সুর করে পড়তে শুরু করলেন। ছেলেটা বলল, "কি সুখেই যে সব ছিলেন সেকালে সে আর তোকে কি বলব! বাড়িতে গোরু বালতি বালতি দুধ দিচ্ছে, দই হচ্ছে, ক্ষীর হচ্ছে, ছানা হচ্ছে, সন্দেশ হচ্ছে, ঘি হচ্ছে। গাছ ভরা আম কাঁঠাল, বাগানভরা তরিতরকারি। একবার সাহস করে যদি ভুবনডাঙা যাস তো এখনো কিছু কিছু দেখবি। সবার হাতে মোটা-মোটা সোনার তাগা,

গলায় সোনা দিয়ে বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। সবাই নিরামিষ খেতেন, ত্রিসন্ধে জপতপ করতেন। আর ঘরে ঘড়া-ঘড়া মোহর, সে রাখবার জায়গা হয় না, আদাড়ে-বাদাড়ে কলসিতে পুরে পুঁতে রাখা হত। কতক মনে থাকত, কতক আবার ভুলেও যেতেন। এখন তো যে-কেউ জায়গা বুঝে মাটি খুঁড়ে সে-সব বের করে আনতে পারে, না বলবার একটা লোকও নেই।"

আমি একবার আড়চোখে ছেলেটার দিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমিই হলাম শেষ বংশধর, আর সব মরে-ঝরে চাঁছাপোঁছা হয়ে গেছে।"

তার পর পকেট থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার চেহারা দেওয়া এত বড় একটা টাকা বের করে বলল—"ধরে দ্যাখ্, কিরকম ভারী, একেবারে খাঁটি রুপো। আজকাল চেয়ে-চেয়ে লোকে পায় না। আর ওঁরা এ-সব যেখানে-সেখানে ফেলে দিতেন। এটা আমি আমাদের পৈতৃক বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি। যাস একবার—এমনি কত পড়ে আছে।"

ঘণ্টা পড়ল, রতন মাস্টার পড়েই যাচ্ছেন। নগা-বটুরা মহা হট্টগোল লাগিয়ে দিল, "সার্, ঘণ্টা পড়ে গেছে সার্।" রতন মাস্টারও অন্যমনস্কভাবে বই বন্ধ করে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। জ্ঞানবাবু এলেন।

জ্ঞানবাবুর ইংরিজি ক্লাসেও যে কেউ সাহস করে কথা বলে এই প্রথম দেখলাম। নতুন ছেলেটা আমার বই দিয়ে একটুখানি মুখ আড়াল করে অম্লান বদনে বকে যেতে লাগল। "দ্যাখ, এই যে-সব লোকেরা জেল খাটে, জরিমানা দেয়, তাদের আমি ভারি ঘৃণা করি। অন্যায় করলে আমার একটুও রাগ হয় না, কিন্তু ধরা পড়লে আর আমি তাকে ক্ষমা করি না। বুঝলি, আমার বাবার ঠাকুরদা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মুখে একটা পান পুরে লম্বা-লম্বা বাঁশের রণ-পা চড়ে অনায়াসে পঞ্চান্ন মাইল দূরে বর্ধমানে গিয়ে এর-ওর-তার বাড়ি থেকে ঠেঙিয়ে পিটিয়ে পুঁটলি ভরে সোনাদানা নিয়ে আবার রণ-পা চেপে ভোরের আগে বাড়ি ফিরে, রণ-পা দুটোকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে, পুঁটলি তালগাছের আগায় বেঁধে রেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। ভোর বেলা পুলিশের লোকে সন্দেহ করে এসে হাজির হত। ঠাকুরদাদা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, পায়ে এতটুকু কাদা পর্যন্ত লেগে নেই। তারা বার
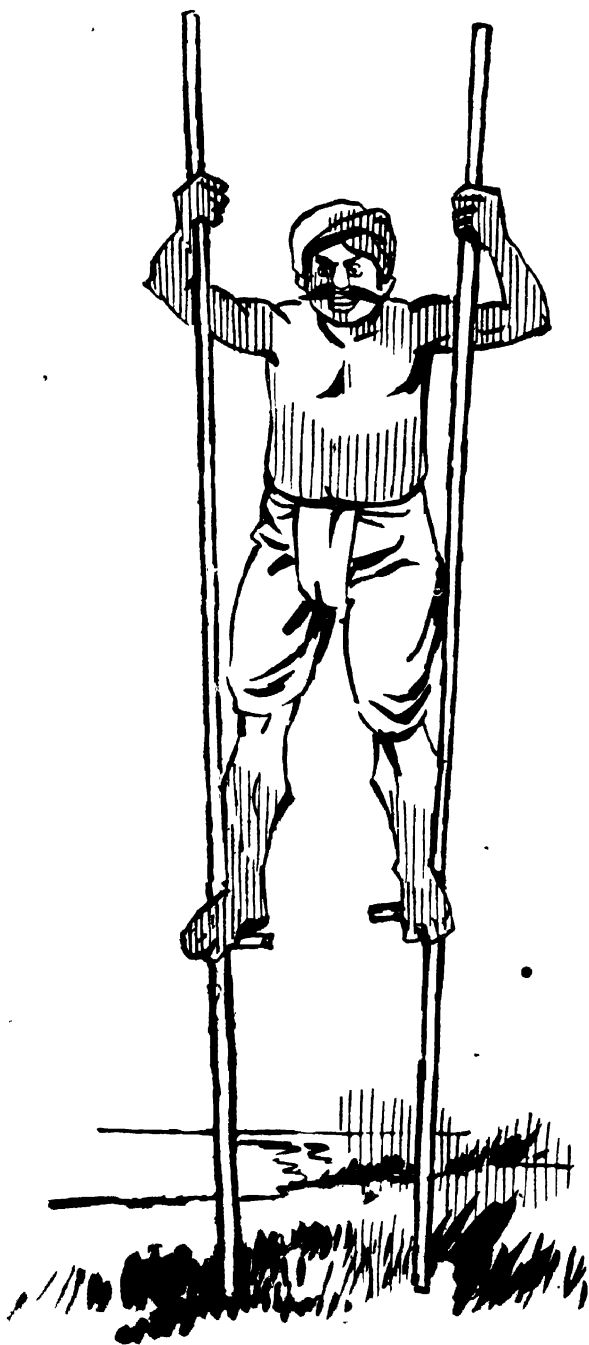
লম্বা-লম্বা রণ-পা চড়ে পঞ্চান্ন মাইল দূরে বর্ধমানে গিয়ে ডাকাতি করে আসতেন।

বার মাপ চেয়ে চলে যেত। কিন্তু ঠাকুরদাদা ভারি ভদ্রলোক ছিলেন, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। ভেবে দ্যাখ্, সেই শীতের সকালে মাঠঘাট থেকে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা উঠছে, আমলকীগাছের পাতায় একটু রোদ লেগেছে, আর লাল লাল চোখ করে ঠাকুরদা পুলিশদের ক্ষীর দিয়ে কলা দিয়ে খ্যাসরাপাতি ধানের খই খাওয়াচ্ছেন।"

তার পর টিফিনের ছুটি হল, আমি ঘণ্টা পড়ামাত্র মেজদাদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলাম। মেজদা বোধ হয় খুব খুশি হল না। কিন্তু ঐ নগা-বটুদের কাছে গেলেই নতুন ছেলেটার সম্বন্ধে সাত-সতেরো জিজ্ঞাসা করবে, আমার আর সে-সব বলতে ইচ্ছে করছিল না।

টিফিনের পর পণ্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাস, তখন সবাই গল্প করে। ছেলেটা তো আবার আমার পাশে বসেছে, কাছে এসে বলতে আরম্ভ করল—

"দ্যাখ্, আমার পূর্বপুরুষরা যেরকম পাষণ্ড ছিলেন, আবার তেমনি দয়ালুও ছিলেন। এদিকে এক কোপে শত্রুর মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার ওদিকে লোকের দুঃখের কথা শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মহৎ লোকেরা ঐরকমই হন। বুঝলি, একবার ওঁরা সিউড়ির ওদিকে কোথাকার এক মহা অহংকারী জমিদারকে উচিত শিক্ষা দিতে গেছেন। সব-কিছু তছ্‌নছ্ করে দিয়ে, তাল তাল, লুটে নিয়ে ফিরছেন, এমন সময় ঐ জমিদার আর তার সাত ছেলে কেঁদে এসে পায়ে পড়ল, তারা কাজকর্ম কখনো করতে শেখে নি, এখন খাবে কি? তাই শুনে আমার পিতৃপুরুষরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে, লুটের জিনিস তো ফিরিয়ে দিলেনই, নিজেদের হাত থেকে সোনার তাগা খুলে তাও দিয়ে দিলেন, ঘোড়া চড়ে যাচ্ছিলেন, সে-সব ঘোড়া দিয়ে দিলেন। পায়ে হেঁটে বারো মাইল পথ পার হতে বিকেল হয়ে গেল।"

তার পর দুই ঘণ্টা ড্রইং ক্লাস। এবার সকলের যা ফুর্তি! জায়গা-টায়গা বদল করে যার যেখানে খুশি বসছে, পেনসিল কাটবার ছুতো করে এদিক-ওদিক ঘুরছে, ভীষণ গল্প করছে। নগা-বটুও অন্য দিনের মতো আমার আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। আমি যেন দেখতেই পাই নি, এমনি করে ছবি আঁকার তোড়জোড় করতে লাগলাম। ছেলেটাও চুপ করে বসে রইল, ছবি-টবি তো মোটে আঁকতে পারে না দেখলাম।

ক্লাসটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে বলল, "দ্যাখ্, ভালো হয়ে আর কে কবে বড়লোক হয়েছে তুই-ই বল-না? আমার দশা দ্যাখ্, কি একটা মোটা জামা-কাপড় পরে তোদের সঙ্গে পড়াশুনো করতে এসেছি। ভালো হওয়ার উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কি করি বল, রক্তের মধ্যে আমার ডাকাতি রয়েছে। ভাবছি গরমের ছুটির পর আর স্কুলে আসব না। ভুবনডাঙায় পুরনো বাড়িটা রয়েছে, মাটি খুঁড়লেই তাল তাল মোহর রয়েছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। ভাবছি আস্তে আস্তে পুরনো ব্যবসাটা আবার জোড়াতালি দিয়ে নিই। আসবি নাকি আমার সঙ্গে? যা অঙ্ক কষলি দেখলাম, তোর ভবিষ্যতটা তো একেবারে অন্ধকার।"

কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ভুবনডাঙার ঠ্যাঙাড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াব, দইক্ষীর খাব, মুস্কিল হল মা-বাবা আর আমার ছোট বোন ফুট্‌কি যে আবার দুষ্ট লোককে দেখতে পারে না। এখন কী করা যায়? ঠিক এমনি সময় হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হেডকেরানীবাবু এসে আমাদের ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন।

কেরানীবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলেন—"হ্যাঁ সার্, এইটিই আমার বড় ছেলে হরিনারায়ণ, এর ছোট আরো তিনটি আছে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, কিন্তু এমন সত্যবাদী সৎ ছেলে আজকাল বড়-একটা দেখা যায় না।

"আর গুরুজনের প্রতি কি ভক্তি! আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবকে তো একরকম পুজো করে। একে সার্, এই ক্লাসে না নিলে হবে না।"

ছেলেটা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

ভাবছি কাল কোথায় বসা যায়।

হলদে পাখির পালক

উৎসর্গ

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে

হলদে পাখির পালক

এক

কত দেরি হয়ে গেল ভুলো তবু বাড়ি এল না, সন্ধে হয়ে গেল, রাত হয়ে গেল। দাদু তাস খেলতে যাবার আগে বললেন, "খুঁজতে যাবার কিছু দরকার নেই, কেউ তোদের নেড়িকুত্তো চুরি করবে না, খিদে পেলে সুড়্‌সুড়্‌ করে নিজেই বাড়ি ফিরবে দেখিস।"

রুমুর গলার কাছটা কী রকম ব্যথা-ব্যথা করছিল; কখন ভুলোর খাবার সময় হয়ে গেছে, বারান্দার কোনায় ভুলোর থালায় দুধ-রুটি-গুলোকে নীল মতো দেখাচ্ছে, পিঁপড়েরা এসেছে।

জানলার শিকের সঙ্গে ভুলোর চেনের আগায় কলারটা আটকানো ছিল। খুব মজার দেখাচ্ছিল। ভারি দুষ্টু ভুলো। কলার আঁটবার সময় কান খাড়া করে গলা ফুলিয়ে রাখে; তার পরে যেই-না সবাই চলে যায়, কান চ্যাপটা করে, গলা সরু করে, কলারের মধ্যে থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে দে ছুট্‌।

কেন ভুলো পালিয়ে যায়?

দাদা চেন কলার আর একটা বেঁটে লাঠি হাতে নিয়ে গেটের কাছে দূরে রেলের লাইনের ওপারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রুমুকে দেখেই রেগে গেল।

"যা, ঘরে যা, এখানে কেন এসেছিস? যা ভাগ্‌।"

"দাদা, বোধ হয় সে সাঁওতাল গ্রামে গেছে। ওরা যদি মারে?"

"বেশ হবে, ঠিক হবে, আমি খুব খুশি হব, পালানো বেরুবে,

আসুক-না বাড়ি, পিটিয়ে মজা বের কচ্ছি। যা, পালা, ছিঁচকাঁদুনে।'

রুমু আবার পিছনের বারান্দায় গেল।

এমনি সময় ভুলো বাড়ি এল। অন্যদিনের মতো সামনের গেট দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নয়। রান্নাঘরের পিছন দিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে ল্যাজ নামিয়ে, কান ঝুলিয়ে, আড়চোখে তাকাতে তাকাতে, স্রেফ্ একটা চোরের মতো এসেই রুমুর পায়ে মুখ রেখে ল্যাজ নাড়তে লাগল। রুমুর মুখে কথাটি নেই, গা শিরশির্ করতে লাগল। জানলা দিয়ে খাবার ঘর থেকে আলো এসে ভুলোর গায়ে পড়েছে, সেই আলোতে রুমু দেখতে পেলে ভুলোর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা হলদে পালক গুঁজে রয়েছে। সোনার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

রুমুর বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, এক দৌড়ে দাদার কাছে গেল।

"দাদা, ভুলোর ঠোঁটের কোনায় সেইরকম হলদে পালক।"

"যাঃ, দূর, হলদে পাখি ঝগড়ুর বানানো।"

"না, দাদা, তুমি দেখবে এসো।"

ভুলো মাটির ভাঁড় থেকে জল খাচ্ছিল। হলদে পালকটা ভাঁড়ের জলে ভাসছিল। ভিজে একটু চুপসে গিয়েছে, কিন্তু তখনো সোনার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। বোগি পালকটা তুলে, মুছে, পকেটে রেখে দিল।

কারো মুখে কথা সরে না। কোথাও একটু আওয়াজ নেই, শুধু মাথার উপর একটা রাতের পাখির ডানা নাড়ার ঝট্‌পটি, আর দূরে কুসিদিদিদের পোড়ো জমির ঝাউগাছের পাতার মধ্যে দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে, আর রুমু বোগির বুকের ধুক্‌পুকি। এবার তবে তো ঝগড়ু মিথ্যা কথা বলে নি। দারুণ গাঁজাখুরি গল্প বলে ঝগড়ু। দুমকায় ওদের গাঁয়ে নাকি হয় না এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। সেখানে সীতাহার গাছের পিছনে সূর্য ডুবে গিয়ে যেই তার লাল আলোগুলোকে গুটিয়ে নেয়, অমনি নাকি আকাশ থেকে সোনালী রঙের অবাক পাখিরা বটফল খেতে নেমে আসে। তারা ডাকে না, কারণ তাদের গলায় স্বর নেই। তারা মাটিতে বা গাছের ডালে বসতে পারে না, কারণ তাদের পা নেই। এমনি উড়ে ফল খেয়ে আবার আকাশে চলে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা পাখার ডানা জখম হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়, আর ঠিক সেই সময় যদি তাকে শেয়ালে কি কুকুরে খেয়ে ফেলে, তা হলে সেই শেয়াল কি কুকুর মানুষ হয়ে যায়। তাই শুনে বোগি বলেছিল,

চোরের মতো এসেই রুমুর পায়ে মুখ রেখে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

"যাঃ, ঝগড়ু, যত রাজ্যের বাজে কথা! জানোয়ার কখনো মানুষ হয়?"

"বিশ্বাস না করতে পারো, বোগিদাদা, কিই-বা জানো তুমি? জানলে কি আর রোজ রোজ মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেতে! কিন্তু আমাদের দুমকাতে ঐরকম অনেক মানুষ আছে। তাদের দেখলেই চিনতে পারা যায়। কারণ সবটা মানুষের মতো হলেও, চোখটা হয় পাটকিলে রঙের, আর কানের উপর দিকটা হয় একটু ছুঁচলো। নেই ওরকম মানুষ তোমাদের এখানেও? কেউ চোখে দেখে না ও পাখি, কিন্তু ঐ মানুষদের দেখলেই সব বোঝা যায়।"

পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রোজ সন্ধেবেলায় দাদুর বাড়ির পাঁচিলের তলা থেকে আমরুল পাতা তুলতে আসেন। মাঝে মাঝে আমরুল তুলতে তুলতে চোখ উঠিয়ে রুমুকে বলেন, "আয় তুলে দে, আমার গেঁটে বাত, এ-সব তোদের কচি হাড়ের কাজ।" ততক্ষণে সূর্য তালগাছের গুঁড়ির কাছে নেমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়ে গেছে। পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নির চোখে আলো পড়ে, চক্‌মকি পাথরের মতো ঝক্‌ঝক্ করে; পাটকিলে রঙের চোখের মণি, তার মধ্যে সোনালী রঙের সবুজ রঙের ডুরি ডুরি কাটা মনে হয়; মাথার কাপড় খসে যায়, ঝিনুকের মতো পাতলা কান, উপর দিকটা গোল না হয়ে খোঁচা মতন।

ওরকম লোক এখানেও আছে।

দিদিমা এসে বলেন, "ওঃ, চাঁদের তা হলে বাড়ি ফেরার মর্জি হয়েছে। কে জানে হয়তো এবার এ বাড়ির অন্য লোকদেরও পড়াশুনো খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি হবে। মেজোমামা সরভাজা এনেছে, জানিস তোরা?"

ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ, সরভাজা। রুমু তখুনি চলে গেল। বোগি অনেকক্ষণ ভুলোর নাক মুখ চোখ পরীক্ষা করে দেখল। কই, কিছু তো হয় নি। তার পর খুব আঁটো করে কলার লাগিয়ে সরভাজা দেখতে গেল।

রাতে শোবার সময় মশারি টানাতে টানাতে ঝগড়ু বলল, "বোগিদাদা, ভুলো কিছু খেল না, চটের উপর শুয়ে খালি ঘুমুচ্ছে।"

বোগি রুমু একবার ঝগড়ুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু আর বলা হল না। ঝগড়ুটা ভারি বাজে বকে, এখনি দাদু-টাদুকে বলে একাকার করবে।

ঝগড়ু বলল, "কে জানে, যা পাজি কুকুর, ঘরের ভাত মুখে রোচে না, কোত্থেকে কি খেয়ে এসেছে কে জানে।"

বোগি শুধু বলল, "থাক্ চেনে বাঁধা। আজ রাত্রে ছাড়িস না ওকে।"

রুমু বলল, "কিন্তু রাতে যদি ক্যাঁওম্যাঁও লাগায়? দাদু যদি রাগ করে?"

ঝগড়ু মশারির দড়িটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে টান করে ধরে, দু হাতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বলল, "কম বদমাশ ঐ কুত্তো! সব বাড়ির কুকুর সারাক্ষণ বাঁধা থাকে, আর এনাকে একটু বাঁধলেই পাড়া মাত করবেন! ইদিকে ছাড়লে আবার একে কামড়ে, ওকে কামড়ে একাকার করবেন!"

রুমু বলল, "আহা, রুটিওলা যে ওর ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়েছিল।" "তোমাদের দাদুর বন্ধু অনিমেষবাবুও ল্যাজ মাড়িয়েছিল?" বোগির বিরক্ত লাগছিল। "দ্যাখ, ঝগড়ু, বাজে বোকো না। অনিমেষবাবু কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। জানোই তো কালো জোব্বা দেখলে ভুলো রেগে যায়।" "বেশ, বোগিদাদা, বেশ! তোমাদের কুকুরের জন্য তোমাদের হাতে হাতকড়া পড়লে আমার আর কি হবে, বল!"

ঝগড়ু চলে গেলে, বোগি অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। তার পর একবার উঠে, টেবিল থেকে টর্চটা নিয়ে, গুটিগুটি গিয়ে ভুলোকে দেখে এল।

ভুলো নাক ডাকাচ্ছে!

আবার এসে শুতেই রুমু চাপা গলায় ডাকল, "দাদা!"

"চুপ কর। ঘুমো। ঠিক আছে।"

পরদিন সকালে দাঁত মাজতে মাজতে পিছনের বারান্দায় গিয়ে রুমু বোগি দেখে, জানলার শিকের সঙ্গে ভুলোর চেন বাঁধা, তার আগায় কলার আটকানো, কিন্তু ভুলো নেই।

দুই

নেই তো নেই। চা খেতেও এল না। বোগি সে বিষয় কোনো কথা না বলে বাড়ির চার পাশটা একবার খুঁজে এল। রুমু রান্নাঘরের পিছনে ঝগড়ুকে একটু বলতে গিয়েছিল। ঝগড়ু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে এক কাণ্ড করে বসল।—"আমি যেতে পারি নেড়িকুত্তো খুঁজতে এই সাত সকালে, যদি তোমরা দুজন কুয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের চৌবাচ্চা ভরে, রান্নাঘরের ট্যাঙ্কি ভরে, চারাগাছে জল দিয়ে—" দিদিমাও রান্নাঘর থেকে ডেকে বললেন—"আচ্ছা, নেড়িকুত্তো কখনো পোষ মানে শুনেছিস? হাজার চান করিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, কানা-তোলা থালায় করে খেতে দিস, সেই এর বাড়ি ওর বাড়ি আঁস্তাকুড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে—যা দিকিনি এখন, সকালবেলাটা হল গিয়ে সংসারের চাকায় তেল দেবার সময়।"

রুমু ঘরে ফিরে এল। বোগি কোলের উপর বই নিয়ে বসে আছে।

"দাদা, হলদে পালকটা দেখি।"

অদ্ভুত পালকটা। অন্য পালকদের রোঁয়াগুলো একসঙ্গে সেঁটে মোলায়েম হয়ে থাকে। হলদে পালকটার রোঁয়াগুলো কোঁকড়া, রোদ লেগে ঝক্‌মক্ করছে, হাওয়ায় ফুর্‌ফুর্ করছে। গোড়াটা সাদা কাচের একটা ফুলের বোঁটার মতো।

রুমুর একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। এমনি সময় ওরা হাসিটা শুনতে পেল। ঝগড়ুর ঘরের ওদিক থেকে খিল্‌খিল্ করে কে হাসছে। বোগি রুমু তখুনি এক দৌড়ে সেইখানে।

ঝগড়ুদের দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর একটা ছোট্ট কালো ছেলে বসে আছে। এত মোটা যে পেটে ভাঁজ-ভাঁজ পড়ে গেছে, মাথায় কয়েক গাছি কোঁকড়া চুল, খালি গা, এক-গাল হাসি, পাটকিলে রঙের চোখ আর বড়-বড় দুটো কান, মাথা থেকে পাখনার মতো আল্‌গা হয়ে রয়েছে, উপর দিকটা একটু ছুঁচলো।

ঝগড়ুর বউ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে টপ্ করে

কোলে তুলে নিয়ে বলল, "আমার ভাইয়ের ছেলে, এখেনে কয়েকদিন থাকবে। তোমাদের এখন পড়ার সময় না ?"

রুমু জিজ্ঞাসা করল—"কখন এল ? কাল তো ছিল না। কোত্থেকে এল ?"

বউ বললে, "আজ ভোরে এসেছে, দুমকা থেকে। তোমরা যাও, তোমাদের দিদিমা রাগ করবে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ভালো নয়।"

বোগি দাওয়ার উপর বসে পড়ল।

"কেন ভালো নয় ?"

বউ একটু রেগে গেল।

"দ্যাখ, বোগিদাদা, এখন আমার রাঁধাবাড়ার সময়। অন্য সময় এসো।"

"ছেলেটাকে দাও, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।"

"অ মা! ছেলে নিয়ে তুমি কি করবে ?"

"না দিলে কিছুতেই যাব না।"

ঝগড়ুর বউ রেগেমেগে দুম্ করে ছেলেটাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে গেল।

বোগিও অমনি তাকে তুলে নিয়ে দে দৌড়।

বারান্দায় তাকে ছেড়ে দিতেই সে হামাগুড়ি দিয়ে সটান ভুলোর থালার কাছে গেল। তার পর খালি থালা দেখে তার রাগ দ্যাখে কে!

রুমু একটু রুটি এনে দিতে তবে থামল। বোগি আস্তে আস্তে ডাকল—"ভুলো, ভুলো, ভুলো!" ছেলেটা খিল্‌খিল্ করে হেসে, হামা দিয়ে কাছে এসে, ভিজে ভিজে জিব দিয়ে বোগিকে চেটে দিল।

রুমু কাঁদতে লাগল। গোলমালের মধ্যে ঝগড়ু এসে ছেলেটাকে বারান্দা থেকে নামিয়ে মোমলতার তলায় ছেড়ে দিল।

"তোমরা এইখেনে খেলা করো দিদি। বারান্দার উপরে দিদিমা দেখলে রাগ করবে।"

ঝুর্‌ঝুর্ করে মোমলতার ফুল ঝরে পড়ছে, তাই দেখে ছেলেটা আহ্লাদে আটখানা। মুঠো মুঠো তুলে মুখে পুরতে চায়। শিশুগাছে দলে দলে বুনো হাঁস এসে বসেছে, দেখে মনে হয় বুঝি বড়-বড় সাদা ফুলে গাছ ভরে গেছে। তাই দেখে খিল্‌খিল্ করে ছেলেটা হেসে ওঠে।

অমনি যেন নিশানা পেয়ে হাঁসের ঝাঁক একসঙ্গে আকাশে উড়ে পড়ে। আকাশের দিকে দুই হাত তুলে ছেলেটা কাঁদতে থাকে।

রুমু বললে, "দাদা, আগেই তো ভালো ছিল।"

বোগি ছেলেটাকে খুব আস্তে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, "কেন খেইছিলি হলদে পাখি? কে বলেছিল খেতে?"

ছেলেটার কান্না থেমে যায়, এই বড়-বড় ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

রুমু হঠাৎ উঠে পড়ে, ওকে বুকে জাপটে ধরে একেবারে ঝগড়ুর ঘরে বউয়ের কাছে দিয়ে আসে।

বউয়ের হাঁড়িতে টগ্‌বগ্‌ করে ভাত ফুটছে, বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে, ফেটে যাচ্ছে, ফুটন্ত জল ছিটুচ্ছে, বউ ভারি খুশি!

"কি, এরই মধ্যে সখ মিটে গেল? আগেই জানি।"

ওখানে আর দাঁড়ানো নয়। ঘরে এসে দেখে বোগি পালকটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে। বোগি বললে, "ধেৎ। নেড়িকুকুর পুষতে হয় না। ওদের জাত খারাপ, পোষ মানে না যা-তা খায়। তার চেয়ে বিলিতি কুকুর ঢের ভালো। সেজোমামা একটা দেবে, চাইলেই দেবে। তার জন্য নতুন লাল কলার কিনব। এটাকে ফেলে দে।"

রুমু অমনি জানলা গলিয়ে কলারটা বাইরে ফেলে দিল। নেড়ি-কুত্তোর কলার আবার কে পরবে?

বোগি উঠে দাঁড়াল।

"দ্যাখ্‌ রুমু, তার পর যদি কখনো ভুলোটা ফিরে আসে, খবরদার ঢুকতে দিবি না কিন্তু। ঠেলে বের করে দিবি।"

"দাদা, ভুলোকে ঠেলে দিলে যে আবার দৌড়ে দৌড়ে ফিরে আসে! মনে হয় ঠেলে দিলে বোধ হয় খুশি হয়।"

"তা হলে বেঁটে লাঠি দিয়ে মেরে তাড়াবি।"

"ওকে মারলে ও নিশ্চয় আমাকে কামড়ে দেবে। কক্ষনো যাবে না।"

"দ্যাখ্‌, কলারটা বরং আবার তুলে নিয়ে আয়। ছেলেটার গলায়ও মন্দ দেখাবে না। ওকি, এ সময়ে শুয়ে পড়লি যে? সর, আমিও শোব, আমার শরীর খারাপ লাগছে।"

তিন

বিকেলে ঝগড়ু একটা ভাঙা মাটির ভাঁড়ে করে কি যেন নিয়ে এল।

"কি রে ঝগড়ু? কি এনেছিস?"

"উঠেই দ্যাখ না, এ সেই আমাদের দুমকার জাদুকরী মাঞ্জা, ঘুড়ির সুতোয় লাগিয়েছ কি দেখো কি কাণ্ড হয়।"

"কোথায় পেলি রে?"

"আরে দুমকা থেকে কত কষ্ট করে আমার শালা এনে দিয়েছে। আহা, হাত দিয়ো না দিদি, মাঞ্জায় কাচের গুঁড়ো দেয়া থাকে জানো না?"

"তুমিই তো বলেছ দুমকায় কাচ পাওয়া যায় না বলে জানলায় তোমরা চাটাই বুনে দাও, কাচ কোথায় পেল তোমার শালা? রোজ রোজ উলটোরকম কথা বল!"

"বেশ, বিশ্বাস না হয় আমি কুসিদিদিদের বাড়িতে দিয়ে আসছি, জগুরাও সুতো লাটাই কিনেছে দেখে এলাম। তা ছাড়া দুমকায় কাচ নেই বলে থাকতে পারি, কাচ হয় না তা তো বলি নি। জাদুকরী মাঞ্জায় দুমকার সেই কাচের গুঁড়ো না দিলে অন্য মাঞ্জা থেকে কোনো তফাতই থাকে না।"

রুমু বোগি বিছানা থেকে উঠে এসে বলল—

"কিরকম কাচ, ঝগড়ু?"

"তোমরা তা হলে হাত-মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে চলো, শালবনে ফুল ফুটেছে দেখবে চলো। তা হলে জাদুকরী মাঞ্জার কথা বলব।"

"সত্যি গল্প তো ঝগড়ু? তুমি কিন্তু ভীষণ গুল্ মারো।"

"ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস কোরো না, আমি আর কি করতে পারি। তবে এই কথা মনে রেখো, দরকার না হলে আমি কখনো মিছে কথা বলি না।"

শালবন থেকে রেলের লাইন দেখা যায় না, কিন্তু ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় কত দূর থেকে আসছে, আবার তার

পরেই মনে হয় একেবারে কানের গোড়ায়, কিন্তু যেই-না মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেছ, অমনি আবার মনে হবে কত দূরে সরে গেছে।

শালবনে থেকে থেকে দম্‌কা দম্‌কা হাওয়া দেয়, সাদা শুঁড়োর মতো রেণু ওড়ে, শালফুলের সোঁদা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে।

"ভুলো এলে বেশ হত, না দাদা?" গাছের গোড়ায় টিপি টিপি ফুল জমেছে, ভুলো থাকলে ওর মধ্যে নাক ঢুকিয়ে নেচে কুঁদে একাকার করত। বোগি বলল, "ঝগড়ু, আর চালাকি নয়। বলো শিগ্‌গির দুমকার কাচের কথা। না, চুপ করে থাকলে চলবে না ঝগড়ু।"

"চুপ করি কি সাধে! দুমকার কাচের কথা ভাবলেও আমার মনটা উদাস হয়ে যায়। দুমকা কিরকম জায়গা জানো তোমরা? শুকনো খর্‌খর্‌ করে চার দিক, আর যেই শীত পড়ো-পড়ো হয়ে আসে, অমনি শির্‌শির্‌ করে একরকম বাতাস বইতে থাকে। আর গাছে গাছে পাতাগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে বাতাসে গা মেলে দেয়! রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ঐ বাতাসের শব্দ আর পাতা খসার আর দূরে কাদের বাড়িতে শীতলাগা কুকুরের ডাক শোনা যায়। দুমকার লোকেরা কুকুর ভালোবাসে, বোগিদাদা—"

এই অবধি বলে টুক্‌ করে একবার রুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝগড়ু তাড়াতাড়ি বলতে লাগল—

"আর শুধু কুকুর কেন—কুকুরদের পেজোমির কথা তো তোমরা জানোই—দুমকার লোকরা মুরগি ভালোবাসে, শুয়োর ভালোবাসে—বেড়াল বাদে সব জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে—"

"কেন, বেড়াল বাদে কেন?"

"খোলা শত্তুর ভালো, রুমুদিদি, যাদের নখ ঢাকা থাকে আর আলো লাগলে যাদের চোখ ছোট হয়ে যায়, তাদের ভালোবাসতে নেই। দুমকার লোকেরা তাই বেড়াল ভালোবাসে না।"

বোগি বললে, "আঃ, কি বেড়াল বেড়াল করছ, কাচের কথাটা বলো-না।"

"এই বলি শোনো। চাটাই দিয়ে জানলা বন্ধ করে ঝাঁপিঝুঁপি হয়ে শুয়ে থাকি, শরীরটা গরমের মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে কিন্তু মনটা ঐ বাইরে বাইরে শীতের মধ্যে পাতা খসার শুকনো গন্ধের মধ্যে, ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে হু হু করে বেড়ায়।"

"কেন ?"

"আরে চারি দিক অন্ধকার হয়ে গেলে শরীরের চোখ তো বন্ধ হবেই, আর শরীরের চোখ বন্ধ হলে মনের চোখ খুলবে না ? যাই হোক, আমার বুড়ো ঠাকুরদা ভাবলেন ঘরে আলো আনতে হবে। জানলায় কাচ দিয়ে দিনে আলো আনতে হবে, প্রদীপের চার দিকে কাচ দিয়ে রাতে আলো আনতে হবে। কিন্তু দুমকায় কাচ কোথায়, কাচের বড় দাম। তখন আমার বুড়ো ঠাকুরদা শালগাছ, মহুয়াগাছ আর হাজার হাজার মৌচাকসুদ্ধু একটা গোটা বন বেচে দিয়ে, শহর থেকে এক বাবু ভাড়া করে আনলেন, সাহেবদের লেখা কেতাব দেখে কাচ তৈরি করে দেবে। তাকে নিজের ঘর ছেড়ে দিলেন, বিরাট চুল্লী তৈরি করে দিলেন, মালমসলার পাহাড় বানিয়ে ফেললেন, মুরগি আর গাওয়া ঘি খেয়ে খেয়ে রোগা বাবু মোটা হয়ে গেল, কিন্তু কাচ আর হল না।"

"কেন হল না ঝগড়ু ?"

"আরে আজ নয় কাল নয় করে করে বছর ঘুরে গেল, শেষটা বুড়ো ঠাকুরদা একদিন রেগেমেগে তাকে যা নয় তাই বলে বকাবকি করলেন। তার পর সে ঘোর রাত্রে পায়ে হেঁটেই দুমকা থেকে চলে গেল। সারাদিন তাকে খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে ঠাকুরদার বড় চুল্লীটা জ্বেলে, তার মধ্যে ঐ পাহাড় পাহাড় মালমসলা আর রাশি রাশি সাহেবদের বই সব ঢেলে দিয়ে, রাগে দুঃখে সারারাত বনে বনে ঘুরে বেড়ালেন।"

"ওরে বাবা ! বাঘে খেল না ?"

"আরে তোমরা যে কিছুই জান না দেখছি। রাগী মানুষদের আর পাগলদের কেউ কিছু বলে না, তাও জানো না ?"

যাই হোক, সকালে উস্কোখুস্কো চুল আর লাল ভাঁটার মতো চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন, চুল্লীর সেই গন্‌গনে আগুনে সব জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে, আর তার জায়গায় চুল্লীতে ঠেসে রয়েছে পরত পরত কাচ, আর সবার নীচে উনুনের ছাঁচে ঢালাই হয়ে আছে এই বিশাল এক দলা সবুজ কাচ। কাচ কাটে যারা তারা এল, জানলা হল, প্রদীপের ঢাকনি হল, সব হল, দুমকার দুঃখ তখনকার মতো ঘুচল, আর ফালতো কাচ গুঁড়িয়ে জাদুকরী মাঞ্জায় দেওয়া হল।"

"দুমকার দুঃখ ঘুচল তো তুমি কেন দুমকা ছেড়ে এখানে এলে চাকরি করতে ?"

"বললাম-না তখনকার মতো ঘুচল। দুঃখ কি আর চিরকালের মতো ঘোচে, বোগিদাদা? সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বারে বারে ফিরে আসে। তবে হ্যাঁ, এই জাদুকরী মাঞ্জাটাও কিছু কম যায় না!"

"কেন কি হয় ওতে?"

"সেই কথাই তো বলছি, তা তোমাদের কিছুতেই তর সয় না।"

"আচ্ছা ঝগড়ু, সব জানলায় কাচ হল, তবে তোমরা চাটাই লাগাও কেন?"

"সেও এক কাহিনী, রুমুদিদি। ষাট বছর আগে যে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে দুমকার একটি বাড়িও দাঁড়িয়ে ছিল না, কাচ-টাচ সব গুঁড়ো। এই মাঞ্জা তো সেই গুঁড়ো দিয়েই তৈরি। আমাদের দুমকায় ঘরে ঘরে কৌটো করে সেই কাচের গুঁড়ো তুলে রাখে। মাঞ্জার সঙ্গে একটু করে দেয়া হয়, ফুরিয়ে গেলে আর তো পাওয়া যাবে না, দিদি! চল, এখন না ফিরলে আঁধার হয়ে যাবে, সূর্য ডোবার পর এ জায়গাটাও অন্যরকম হয়ে যায়, চল এখন ফেরা যাক।"

"তা হলে রাত্রে শোবার সময় মাঞ্জার কথা বলবে তো ঠিক?"

ঝগড়ু দুজনার কনুই ধরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে হবে 'খন।"

রাত্রে মাংস রান্না হয়েছিল। মোটা হাড়গুলো কে খাবে? তার উপর রুমুর খুব পা কামড়াচ্ছিল। দিদিমা ঝগড়ুকে বকলেন—"কি দরকার ছিল ওদের শালবন অবধি হাঁটাবার, ঝগড়ু? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেখি বুদ্ধি বাড়ছে।"

ঝগড়ু কিছু বলল না। ঝগড়ু বোধ হয় খুব বুড়ো, কানের কাছের চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, হাতের অনেকগুলো নখ ভাঙা, শিরাগুলো উঁচু-উঁচু হয়ে রয়েছে। রুমু একটা আঙুল দিয়ে ঝগড়ুর শিরায় হাত বুলিয়ে দিল। বোগি বলল, "ঝগড়ু, তুমিও চল, আমরা শোব, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

হাত ধুতে গিয়ে রুমু একবার কানাতোলা থালাটার কাছে গেল। বোগির রাগ ধরল, "কি করে আসবে সে? তুই এত বোকা কেন রুমু? হাড়গুলো তুলে এনে থালায় ফেললি?" রুমু পা দিয়ে থালাটাকে একটু সরিয়ে বলল, "ঝগড়ুর বউ সন্ধেবেলা ছেলেটাকে কলা চটকে খাওয়াচ্ছিল। আমার বড্ড পা কামড়াচ্ছে, দাদা।" রুমু মহা কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল।

চার

ঝগড়ু অনেকক্ষণ ধরে রুমুর পা টিপে দিল। পা টিপতে টিপতে মাঞ্জার কথাটা বলল—

"আমরা যখন ছোট ছিলাম, বোগিদাদা, ঐ মাঞ্জা সুতোয় লাগিয়ে একদিন ঘুড়ি উড়িয়েছিলাম। সারাদিন লেগেছিল সুতোয় মাঞ্জা দিতে। লম্বা করে' দুটো শিশুগাছে বেড় দিয়ে সুতো শুকোনো হল। ঘুড়ি উড়োতে সেই বিকেল হয়ে গেল।

"আমি আর আমার ভাই ঝমরু, না খেয়ে না দেয়ে সুতো তৈরি করে আকাশে তো ঘুড়ি ছেড়ে দিলাম। ছাড়তেই মনে হল জ্যান্ত পাখি ছেড়ে দিলাম। ঘুড়ি কাত হল না, গোত্তা খেল না, শোঁ শোঁ করে একেবারে সটান মাঝ আকাশে উড়ে গেল।

"যতই সুতো ছাড়ি ততই ঘুড়ি উপরে উঠে যায়। ঝমরু বললে, দাদা ঘুড়ির কেন ওজন নেই, টান নেই? বাস্তবিকই তাই, এদিকে লাটাইয়ের সুতোও প্রায় শেষ! আমি বললুম, সারাদিন মাঞ্জা দিলাম, সব কটি সুতো যাবে শেষে, থাক, তুই টেনে নামা।

"কি বলব, বোগিদাদা, সে ঘুড়ি নামতে চায় না, জোর করে। ততক্ষণে সুয্যি ডুবেছে, গাঁয়ের লোক আর যারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল সবাই চলে গেছে, তখন ঘুড়ি এসে চোখের সামনে দেখা দিল। দেখা দিল কিন্তু মাটিতে পড়ল না। ঝমরু আর আমি দেখলাম, ঘুড়ির কন্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আশ্চর্য একটা হলদে পাখি! তার পা নেই, মাটি থেকে এক হাত উপরে খালি খালি ফড়্ফড়্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। গলায় স্বর নেই, ডাকছে না, কিন্তু লাল চুনীর মতো দুটি চোখ দিয়ে পাগলের মতো ইদিকে-উদিকে তাকাচ্ছে।"

বোগি জিজ্ঞাসা করল, "তবে না বলেছিলে কেউ ও পাখি চোখে দেখে নি?"

"মিথ্যা কথা বলেছিলাম বোগিদাদা। আর কেউ কখনো দেখে নি, শুধু ঝমরু আর আমি দেখেছিলাম। ঝমরু তাকে খপ্ করে ধরে
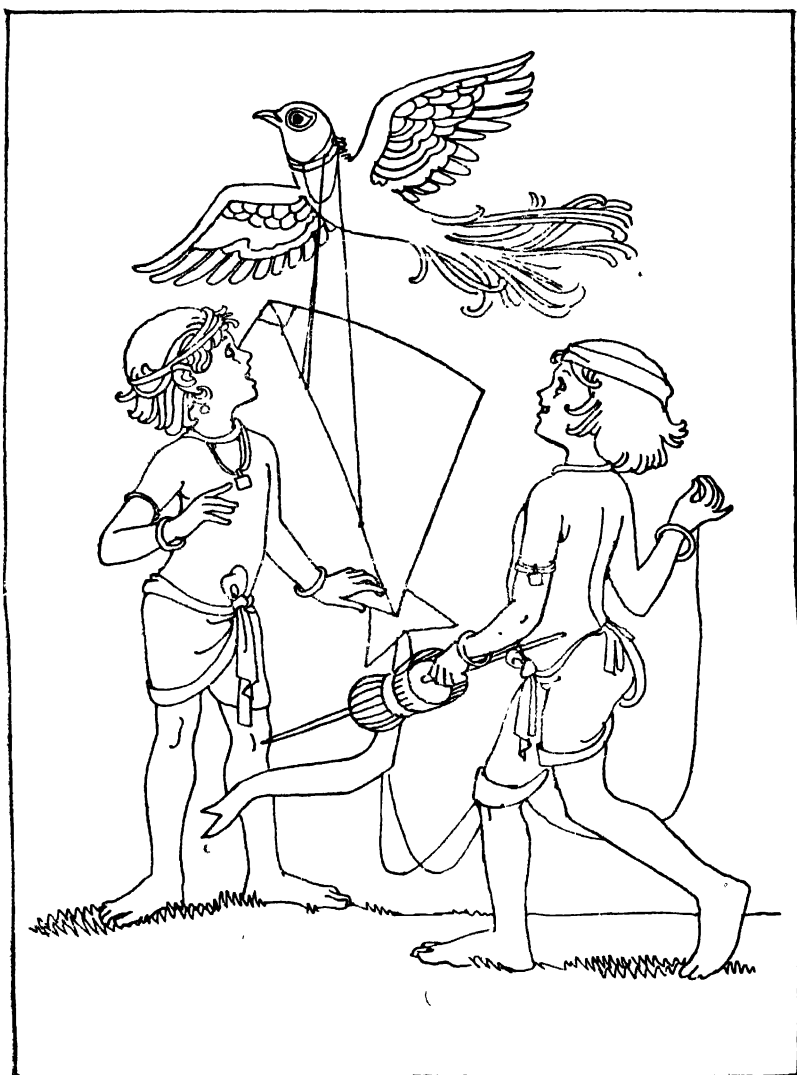
ঝমরু আর আমি দেখলাম, ঘুড়ির কলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে
আশ্চর্য একটা হলদে পাখি ।

ফেলল, অমনি সে চোখ বুজে নিঝুম হয়ে গেল, খালি ওর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। কিন্তু যেই-না আমি তাকে ধরেছি আর ঝমরু তার গলা থেকে সুতোর ফাঁস খুলে দিল, অমনি সে ডানা ঝাপটা দিয়ে আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে, তীরের মতো আকাশে উড়ে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।"

"তার পর কি হল ঝগড়ু ?"

"তার পর আর কি হবে ? ঝমরুর আর আমার আর দেশে থাকা হল না। ঐ পাখির ডানার ঝাপটা যার গায়ে লেগেছে সে কি আর ঘরে তিষ্ঠুতে পারে, বোগিদাদা ? আজ তুমি ঘুমোও বোগিদাদা, দ্যাখ রুমুর চোখ কখন বুজে গেছে।"

তার পরদিনও ভুলো এল না, তার পরদিনও না, তার পর দিনও না।

তার পরদিন রুমু বললে, "ঝগড়ু, যে শেয়ালরা কুকুররা হলদে পাখি খেয়ে মানুষ হয়ে যায়, তারা আর জানোয়ার হয় না ?"

ঝগড়ু বললে, "একবার মানুষ হলে তারা কি আর জানোয়ার হতে চাইবে, দিদি ? তবে শুনেছি নিদুলী-মন্ত্র দিয়ে সব হয়।"

"তুমি জানো সেই নিদুলী-মন্ত্র ?"

"জানি আমি সবই। আমাদের দুমকায় ছেলে-ছোকরারাও নিদুলী-মন্ত্রের কথা শুনেছে। কিন্তু করা বড় শক্ত।"

"কেন শক্ত, ঝগড়ু ?"

"তার জিনিসই পাওয়া যায় না, দিদি ; পাচঠেঙো মাকড়সা চাই, সোনা-রুপোর মাদুলি চাই—এখন আমি বাজারে যাচ্ছি, দিদি, পরে সব বলব।"

"বাজারে যাচ্ছ, ভালোই হল, ঝগড়ু, একটু দেখো তো।"

"কি দেখব, দিদি ?"

"সেই। সেই সোনা-রুপোর মাদুলি যদি পাও।"

"সে কি অত সহজে মেলে দিদি ?"

"তা হলে সেদিন সেই একচোখ লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন ? ওর কাছে হয়তো ছিল। বলল, রক্ত-বন্ধ-করা মাদুলি আছে, স্বপ্ন-দেখা মাদুলি আছে। দেখলে না কেন, ঝগড়ু ?"

"আচ্ছা, এবার দেখলে তাকে ডেকে আনব'খন। কিন্তু কি করবে

তুমি ঐ মাদুলি দিয়ে ?—বিকেলে হীরে খুঁজতে যাবে তো ?"

"হ্যাঁ, যাব। হীরে খুঁজব, আর সেই যে তুমি বলেছিলে সাপের মাথার ফুল, যে ফুল কখনো শুকোয় না, সেই খুঁজব। খোয়াইয়ের মধ্যেই সব পাওয়া যাবে তো ?"

"পাওয়া যাবে কি না জানি না, দিদি। তবে খোয়াইয়ের মধ্যেই ও-সব খুঁজতে হয়। পেলেই তো মজা ফুরিয়ে গেল।"

বিকেলে যেতে হয় খোয়াইয়ে। বর্ষার জলে মাটি খেয়ে খেয়ে লাল কাঁকরের পাঁজরা বেরিয়ে থাকে। ধারে ধারে মনসাগাছ মাথা উঁচিয়ে কাঁটা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো কমে এলেই রুমুর কেমন মনে হয় মনসারা আগের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই, মাথা ঘুরিয়ে ইদিক-উদিক দেখছে। খোয়াইয়ের মধ্যে কতরকম আশ্চর্য সাদা লাল পাথর পড়ে থাকে। ঝগড়ু বলল,

"কিছুই বিশ্বাস করো না, বোগিদাদা, বইয়ে না লেখা থাকলে কিছুই মানতে চাও না। আরে বইয়ে কতটুকুরই-বা জায়গা হয়, বল ? আমাদের দুমকাতে একরকম গাছ আছে তারা চলে বেড়ায়।"

"ফের বাজে বকছ, ঝগড়ু ?"

"আরে না না, নিজের চোখে দ্যাখা। ছোটবেলায় ঝমরু আর আমি পাহাড়ে যেতাম ছাগল চরাতে। আমাদের দেশের জন্তু-জানোয়ারদের বড় কষ্ট, রুমুদিদি, এমনি খরা যে ঘাসগুলো সব জ্বলে পুড়ে যায়। তবে পাহাড়ের উপরে বড়-বড় পাথরের ছায়ায় ছায়ায় লম্বা-লম্বা ঘাস থাকে, ছাগলরা তাই খেতে বড় ভালোবাসে।

"ছাগলরা চরে বেড়ায়, আর ঝমরু আর আমি সারাটা দিনমান এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফিয়ে বেড়াই, বাঁশি বাজাই, আর পাথরের আড়ালে ঘুমুই। ঝমরু একটু রাগী ছিল, দিদি, একটুতেই মেরে-ধরে একাকার করত।"

"কোথায় সে এখন ?"

বোগি একটু কাছে এসে বলল, "মরে গেছে নিশ্চয়।" ঝগড়ু রাগ করল। "মরবে কেন বোগিদাদা, তোমার যেমন কথা! ঝমরু এখন বদ্যিনাথে পুলিশে চাকরি করে, তার পাঁচটা ছেলে পাঁচটা মেয়ে; কেউ মরে নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর বল, ঝমরু ভারি রাগী ছিল, তার পর ?"

"একদিন একটা ছাগল কিছুতেই পাহাড়ে উঠবে না। আমি যতই তাকে ফুস্‌লোই সে উলটে গুঁতোতে আসে। তখন ঝমরু রেগেমেগে দিয়েছে তাকে এক লাথি কষিয়ে। ছাগলটা অমনি তর্‌তর্‌ করে পাহাড়ে উঠে গেল বটে, কিন্তু পাশেই একটা মস্ত-মস্ত শাঁসালো পাতাওয়ালা কাঁটাগাছ ছিল, ঝমরুর পায়ে তার একটা এই বড় কাঁটা গেল বিঁধে। অমনি চুনীর মতো গোল-গোল রক্তের ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করে পড়তে লাগল, আর ঝমরুর সে কি চ্যাঁচামেচি! রেগে গাছটার গোটা ডালটাই ছিঁড়ে ফেলে দিলে, আর তার গা থেকেও একরকম সাদা রস পড়তে লাগল।

"তার পর ব্যথা কমলে আমরাও পাহাড়ে চড়লাম। ঝমরু কি করে, পায়ে ব্যথা, সেদিন আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। তখন সে করল কি, মাঝারি পাথরগুলোকে উলটে উলটে ফেলতে লাগল। কখনো পাথর উলটেছ, রুমুদিদি?"

"না তো। কেন, কি হয়?"

"পাথরের তলাকার ছোট-বড় পোকারা ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারে পালায়। সে ভারি মজা লাগে দেখতে কিন্তু ওদের ভারি কষ্ট হয়।"

"কেন কষ্ট হয়?"

"আরে, ওরা অন্ধকারের পোকা, আলো সইতে পারে না। তা ছাড়া পাথরের তলাটাই ওদের বাড়ি, বাচ্চা-টাচ্চা ডিম-টিম নিয়ে সেখানে ওরা থাকে। পাথর উলটে ফেলে দিলে বাচ্চারা মরে যায়, ডিমরা ভেঙে যায়।"

"ইস্‌! ঝমরু তো ভারি দুষ্টু ছেলে!"

"না, দুষ্টু মোটেই নয়, রুমুদিদি, আমাদের দুমকার ছেলেরা আর যাই হোক, কখনো দুষ্টু হয় না। তবে অতটা ভেবে দ্যাখে নি।"

"আচ্ছা, তার পর বল।"

"তার পর আট-দশটা পাথর ঐরকম উলটে ফেলবার পর, ঝমরুর সে কি চীৎকার! আমি ভাবলাম নিশ্চয় পোকায় কামড়েছে! ছুটে গিয়ে দেখি, ওর পায়ে আবার সেইরকম একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে।

"তাকিয়ে দেখি পাশে ঠিক সেইরকম একটা গাছও রয়েছে। শুধু তাই নয়, গাছটার একটা ডালও ভাঙা, আর সেখানে ফোঁটা ফোঁটা সাদা রস জমে রয়েছে।"

"কি করে হতে পারে ঝগড়ু ? তুমি কি বলতে চাও সেই গাছটাই পাহাড়ে চড়েছিল ?"

"দ্যাখ, বোগিদাদা, তোমাদের সঙ্গে আমাদের এই তফাত যে আমরা যা দেখি তাই মেনে নিই, অত 'কি করে হল' জানতে চাই না। কিছুই মানতে চাও না, এই হল মুশকিল। আমি একবার খোয়াইয়ের মধ্যে ঘোড়ার কঙ্কাল পেয়েছিলাম, তাও বোধ হয় বিশ্বাস করবে না ?"

বোগি বলল, "তা কেন বিশ্বাস করব না ? একটা সত্যি ঘোড়াই হয়তো বুড়ো হয়ে খোয়াইয়ের মধ্যে মরে গেছিল, কিম্বা হয়তো কিছুতে মেরে ফেলেছিল, কিম্বা পথ হারিয়ে না খেতে পেয়ে মরে গেছিল—ও কি, ফের কাঁদছিস রুমু ?"

রুমু ফ্রকের কোনা তুলে চোখ মুছে বললে, "ঘোড়া মরে গেলেও কাঁদতে পাব না ? না খেতে পেয়ে একলা একলা অন্ধকারে খোয়াইয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও কাঁদতে পাব না ?"

বোগি বিরক্ত হয়ে বলল, "ফ্রক নামাও রুমু, তোমার পেট দ্যাখা যাচ্ছে !"

ঝগড়ু ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আহা, কান্নাটা থামিয়ে আসল কথাটাই শোন-না, দিদি। ঘোড়াটার ওরকম কিছুই হয় নি।"

"কি করে জানলে ?"

"শোনোই-না বলি।"

পাঁচ

ঝগড়ু খোয়াইয়ের মধ্যে একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

"ওরকম কিছুই হয় নি বুঝলাম, কারণ কঙ্কালটার কাছে গিয়ে দেখলাম মেলা ঈগল পাখির পালক ছড়ানো।"

"ও, তা হলে হয়তো ওকে ঈগল পাখিতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পাহাড়ের উপরে ঈগল পাখির বাসাতে বাচ্চারা খাবে বলে। তার পর নখ থেকে কি করে খুলে ঘোড়াটা খোয়াইয়ে পড়ে মরে গেছিল।"

"আচ্ছা, রুমু, আবার কি হল ?"

"ঈগল পাখিতে ধরবে কেন ? আস্তাবলে রাখে না কেন ?"

"কি মুশকিল ! আমাকে গল্পটা বলতে দেবে কি না ?"

"ও, গল্প ? তা হলে সত্যি নয় ?"

"সত্যি নয় মানে ? আমার সব গল্পই সত্যি গল্প।"

"বল, তার পর ঈগল পাখির পালক দেখে কি করলে ?"

"ভালো করে দেখে বুঝলাম ঈগল পাখিরই পালক নয়। ঈগল পাখির পালক অত বড়ও হয় না—ওরকম নীল নীলও হয় না।"

"তবে ?"

"বুঝলাম, তা হলে ওরই পালক।"

"ওরই পালক মানে ? ঘোড়ার আবার পালক হয় নাকি ?"

ঝগড়ু উঠে পড়ল, "কি যে বল ! ঘোড়ার পালক হয় না ? এবার হয়তো বলবে ঘোড়ার ডানাও হয় না। কঙ্কালটার কাঁধের কাছে দেখলাম, মুরগিদের ডানার হাড়ের মতো বিরাট দুই হাড়।"

রুমু হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিয়ে চাপা গলায় বলল, "তবে কি—তবে কি ওটা পক্ষীরাজ ছিল, ঝগড়ু ?"

"তা জানি না, তবে শুনেছি পক্ষীরাজরা বুড়ো হলে, পুরনো দেহটাকে ছেড়ে নতুন দেহ গজিয়ে নেয়।"

বোগি বললে, "না, তুমি ভীষণ গাঁজাখুরি গল্প বল, ঝগড়ু, নতুন দেহ গজিয়ে নেয় আবার কি ?"

"তা তোমাদের এখানে কি হয় না হয়, সে বিষয় আমি তো কিছু বলতে পারি না, কিন্তু দুমকাতে হয় না এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। তা ছাড়া টিকটিকির ল্যাজ গজাতে পারে, আর পক্ষীরাজ দেহ গজাতে পারে না বললেই হল !"

"ঘোড়ার কঙ্কাল তো এখানে পেয়েছিলে বললে।"

"এখানে পেলেই তাকে এখানকার ঘোড়া হতে হবে ? আমিও তো এখানে আছি, তা হলে কি আমিও দুমকার ছেলে নই ?"

ঠিক এই সময় ওদের কানে এল স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের শব্দ। সবাই অবাক। তার পরে পাশের গর্ত-মতন জায়গা থেকে হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে উঠে এল একটা হাড়-গির্‌গিরে সাদা ঘোড়া।

তার খুর ছাড়া সবটা সাদা। গায়ের লোম, চুল, ল্যাজ, চোখের পাতি সব সাদা। খালি খুর চারটে আর চোখের মণিটা কুচ্‌কুচে কালো।

ওদের দেখে ঘোড়াটা চারটে পা এক জায়গায় জড়ো করে থমকে দাঁড়াল, তার সমস্ত শরীরটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল, চোখের কালো মণির চার ধারে অনেকখানি করে সাদা দেখা গেল। ঠোঁটের কোনায় একটু সাদা ফেনা লেগে রয়েছে, বুকটা হাপরের মতো উঠছে পড়ছে।

বোগি রুমুর মুখে কথা নেই। ঘোড়াটার প্রত্যেকটা পাঁজর গোনা যায়, আর কাঁধের উপর দুটো হাড় অদ্ভুতরকম উঁচু হয়ে রয়েছে। ঝগড়ু ওদের কানে কানে বলল, "নড়বে না, খবরদার আওয়াজ করবে না।"

তার পর দুহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে, মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত পাখি-ডাকার মতো নরম শব্দ করতে করতে ঝগড়ু ঘোড়াটার দিকে এগুতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোড়াটার কাঁপুনি থেমে গেল, চোখ দুটো কালো মখমলের মতো হয়ে গেল, সেও একটু এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে ঝগড়ুর হাতের তেলোয় মুখ গুঁজে দিল। ঝগড়ু অন্য হাতটা দিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

"এবার তোমরা কাছে আসতে পার, দিদি, ও আর কিছু বলবে না। কিন্তু সামনে দিয়ে এসো, ঘোড়ার পিছন দিক দিয়ে কখনো আসতে হয় না।"

"তুমি এত কথা কি করে জানলে, ঝগড়ু?"

ঝগড়ু মুখটা তুলে, দূরে যেখানে গাছের পিছনে সূর্য ডুবে যায়, সেই দিকে চেয়ে বলল—

"বলেছি তোমাদের, হলদে পাখির ডানার ঝাপটা লেগেছে আমার গায়ে, দেশে আমি তিষ্ঠুতে পারি না। কোথায় কোথায় যে সে আমাকে নিয়ে বেড়িয়েছে সে আর কি বলব। বললেও তোমরা বিশ্বাস করবে না, তোমাদের কেতাবে সে-সব জায়গার কথা লেখে না। ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাজ করেছি আমি পাঁচ বচ্ছর। বোগিদাদা, ভালো ঘোড়া রেসের দিনে কেন দৌড়য় না তাও জানি, খারাপ ঘোড়া কেন হঠাৎ ঝড়ের মুখে খড়ের কুটোর মতো ছুটে চলে তাও জানি। চল, ওঠ, ঘরে যাবার সময় হয়েছে।"

সাদা ঘোড়াটা দুটো কান খাড়া করে ঝগড়ুর কথা শুনছিল, এবার মুখ তুলে ঝগড়ুর চোখের দিকে চেয়ে রইল, ওর চোখ দেখে মনে হল যেন কালো দীঘির জল, তার তল নেই থৈ নেই।

"বল-না ঝগড়ু, হলদে পাখির ডানার ঝাপটা লাগলে কেন ঘরে তিষ্ঠুনো যায় না ?"

"বুকের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়, ফোঁপরা হয়ে যায়, দুনিয়াতে হরেকরকম ভালো জিনিস আছে, কিন্তু কিছু দিয়েই আর সে ফাঁকা ভরানো যায় না, বোগিদাদা ; ঘর ছেড়ে, ঘরের মানুষ ছেড়ে তাই বেরিয়ে পড়তে হয়। চল, আঁধার নামছে।"

"কিন্তু তা হলে সাদা ঘোড়ার কি হবে ? ওকে বাড়ি নিয়ে গেলে হয় না ঝগড়ু ?"

"থাকবে কোথায় ? খাবে কি ? তোমাদের দিদিমা কেন থাকতে দেবে ?"

"তোমার ঘরে থাকবে ঝগড়ু, তরকারির খোসা খাবে, দিদিমা জানতেও পারবে না।"

রুমু বলল, "আর জানলেই-বা কি হবে ? তোমার ঘরে যে কালো ছেলেটা এসেছে, দিদিমা বলেছে কিছু ?"

ঝগড়ু মাথা উঁচু করে বলল, "ও তো দুমকার ছেলে। আর তা ছাড়া এ হল পক্ষীরাজ, এদের ঘরে বেঁধে রাখা যায় না।"

"পক্ষীরাজ তো ডানা কোথায় ঝগড়ু ?"

ঝগড়ু অবাক হয়ে গেল। "সব পক্ষীরাজের কি ডানা গজায় ভেবেছ নাকি ? দেখছ-না ওর কাঁধের উপরকার হাড় কেমন উঁচু হয়ে রয়েছে ? ওর যে ডানার কুঁড়ি রয়েছে বোগিদাদা। ডানার কুঁড়ি থাকলেও সকলের ডানা গজায় না, গায়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে, একটুখানি জিরুতে দেয় না, সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খায়।"

এই বলে ঝগড়ু ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে। ঘোড়াটাও একবার ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার চিঁহি করে ডাক ছেড়ে, পেছনের দুটো পায়ের উপর একবার দাঁড়িয়ে উঠে, খোয়াইয়ের উপর দিয়ে খটাখট্ শব্দ করে দৌড় দিল। চারটে খুর থেকে আগুনের হল্কা ছুটতে লাগল, চারি দিকে ধুলো উড়তে লাগল, কাশবনের মধ্যে দিয়ে, তীরের বেগে ছুটে, দেখতে দেখতে সাদা ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারাটা পথ কারো মুখে কথা নেই। ভুলো সেদিনও ফিরল না। ঝগড়ুর ঘরে কালো ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে বোগি গিয়ে দেখে এল। রাতে খেতে বসে দাদু বললেন, "কি হে নেড়িকুত্তোর দুঃখ ঘুচল ?

আনবে না কি সেজোমামা বিলিতি কুকুরের ছানা ?"

রুমু বোগির মুখের দিকে চেয়ে দেখে, বোগি মাথা নাড়ছে।

দিদিমা বললেন, "কি জানি পায়ে পায়ে অষ্টপ্রহর ঘুরঘুর করত, ভারি বিরক্ত লাগত, এখন আবার কেমন যেন খালি-খালি লাগে।"

বোগি তবুও কিছু না বলে, একটা পরিষ্কার চুলের কাঁটা দিয়ে নলি হাড়ের ভিতর থেকে রস বের করে খেতে লাগল।

রুমু বলল, "ভুলো ছাড়া আর কাউকে আমরা চাই না, দাদু।"

ছয়

রান্নাঘরের পিছনে ঝগড়ুদের ঘর আর রান্নাঘরের পাশে গরমজলের ঘর। সেখানে তিনটে বড়-বড় পাথর দিয়ে উনুন করা আছে, তার উপর কেরোসিনের টিনে স্নানের জল গরম করা হয়।

ঐ উনুনে কয়লার বদলে কাঠ জ্বালানো হয়। কতরকম কাঠ, তাদের কতরকম রঙ, কতরকম গন্ধ। মাঝে মাঝে কাঠে আগুন লাগলে কেমন একটা শোঁ শোঁ শব্দ হয় আর সারা ঘর একটা মিষ্ট মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়।

ঝগড়ু বলে, "তা হবে না, ও যে কাঠপরীদের চুলের সুবাস।"

"কাঠপরী হয় না, ঝগড়ু।"

"কাঠপরী হয় না এটা একটা কথা হল, বোগিদাদা ?"

"কোনোরকম পরীই হয় না, ঝগড়ু, কাঠপরীও না।"

"তবে তোমাদের বইতে লেখে কেন ? দিদিমা কাল যে বই থেকে পড়ে শোনালেন ?"

"সব বানানো গল্প, ঝগড়ু, পরী হয় না।"

"না হয় না! বইতেও লিখেছে, তবু হয় না! তা ছাড়া আমি দেখেওছি।"

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

"না, ঠিক নিজের চোখে দেখি নি, আমার বাবা দেখেছেন। তবে কি আমার বাবা মিছে কথা বলেছেন ?"

"কোথায় দেখেছেন ঝগড়ু, কবে দেখেছেন?"

"অনেক বছর আগে, রুমুদিদি। দুমকার পাহাড়ে দেখেছেন অবিশ্যি, তোমরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না।"

"না, না, ঝগড়ু, বলই-না তোমার বাবার কাঠপরী দেখার কথা।"

ঝগড়ু জল গরমের উনুনে একটা ফিকে সবুজ রঙের কাঠ গুঁজে দিয়ে বলল, "এইরকম কাঠে পরী থাকে, শুকনো মরা কাঠে থাকে না।" বলতেই সারা ঘর একটা মিষ্টি ধুনো ধুনো গন্ধে ভরে উঠল।

ঝগড়ু বলল, "ভালো করে আগুনের মধ্যে চেয়ে দ্যাখ, বোগিদাদা, যেখানে নতুন ধরেছে সেখানে নয়, যেখানে গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে সেখানে দ্যাখ। কিছু দেখতে পাচ্ছ না, ঘরবাড়ি, গাছপালা?" অমনি রুমু বোগিরও মনে হতে লাগল সত্যি বুঝি আগুনের তৈরি ঘরবাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছে, লাল, একটু একটু নীল, দেয়াল ছাদ ডালপালা কেবলই কাঁপছে নড়ছে ভাঙছে আবার গড়ছে। মনে হল আগুনের তৈরি একটা শহরই দেখতে পাচ্ছে।

বোগি চোখ ঢেকে বলল, "শুধু কাঠ জ্বালালে নয়, ঝগড়ু, আমি কয়লার আগুনেও দেখেছি যুদ্ধ হচ্ছে, শহর পুড়ে যাচ্ছে, বিরাট বিরাট প্রাসাদ ধ্বসে পড়ছে।"

"তা হবে হয়তো, বোগিদাদা, দুমকায় আমরা কাঠ জ্বালাই, কয়লার কথা অত বলতে পারব না।"

"দাদা, তুমি অত কথা বল কেন? বল ঝগড়ু তোমার বাবার পরী দেখার কথা।"

"বুঝলে, বাবার তখন বয়স হয়েছে, হাড়ের ভিতরে শীত আর কিছুতেই যায় না, সারাটা দিন গোল লোহার চুল্লির ধারে বসে থাকেন, হাতের কাছে কাঠের গাদা, থেকে থেকে আগুনে একটা কাঠ গুঁজে দেন, ধোঁয়ায় চার দিক ভরে থাকে, যে আসে তার চোখ জ্বালা করে, তারা বাবাকে শুধোয়, তোমার চোখ জ্বলে না, বুড়ো? বাবা বলেন, আরে বুকের জ্বালাই আর টের পাই না, তা আবার চোখের জ্বালা!

"সারাদিন চুলীর ধারে বসে থাকেন বাবা, আর কাঠির আগায় বিঁধিয়ে রাঙা-আলু পুড়িয়ে খান। যে আসে তাকে খাওয়ান। তারা মাঝে মাঝে বলে, রাঙা-আলুতে ইঁদুরের দাঁতের দাগ কেন, বুড়ো? তোমাদের ক্ষেতে বুঝি ইঁদুর হয়েছে? বাবা চোখে ভালো দেখেন না,

রাগ করেন, বলেন—ইচ্ছে না হয় খেয়ো না।

"একদিন আগুনের মধ্যে যেই-না কাঠির আগায় বিঁধিয়ে রাঙা-আলু ফেলেছেন অমনি মনে হল যেন আগুনের ভিতরকার ঘরবাড়িতে মানুষ আছে, কে যেন রাঙা-আলুটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পোড়াতে লাগল, লম্বা দাড়ি কে একজন বুড়ো লোক রাঙা-আলুতে কামড় দিল। অমনি বাবা তাড়াতাড়ি কাঠি টেনে আনতেই রাঙা-আলুর সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও বেরিয়ে এল। একটুক্ষণ দেখতে পেলেন, তার পরেই সে ঝুর্‌ঝুর্‌ করে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বলতে চাও এ-সব বানানো কথা, বোগিদাদা? শুধু বাবা কেন, বনে-জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যায়, তারা সবাই জানে জঙ্গলে এমন অনেক জিনিস আছে, যাদের কথা কোনো বইতে লেখে না। গাছ-গাছালির কথা যারা চারটে দেওয়ালের মধ্যে বাস করে তারা জানবে কোত্থেকে?"

"কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের তো মানুষরা ভালোবাসে, তাদের কথা তো জানতে পারে?"

"কে বলেছে মানুষরা জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে? একবার হাতি-ধরার খেদায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সুন্দর সব পোষা হাতি সাজিয়ে রেখে, বুনো হাতি ধরা হচ্ছে। ভালোবাসে বললে? যারা দলে দলে গাছপালা ভেঙে হুড়্‌মুড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামে, তাদের পায়ে শেকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখলাম।

"হাতির বাচ্ছার ভীষণ কাতুকুতু তা জানো? খর্‌রা বুরুস দিয়ে ঘষে ঘষে তাদের কাতুকুতু ছাড়িয়ে, পিঠে হাওদা চাপানো হয় তা জানো? তা নইলে একটুকু ছুঁলেই তারা হেসে লুটোপুটি। তোমরা কি এগুলোকে ভালোবাসা বল?"

রুমু বলল, "আমরা কুকুর ভালোবাসি, না দাদা? আমরা ভুলোকে ভালোবাসি। তুমিও তো বলেছ দুমকার লোকরা বেড়াল বাদে সব জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে।"

"দুমকার লোকদের কথা আলাদা। একবার দুমকার বনে দাবানল লেগেছিল। দলে দলে জন্তু-জানোয়ার ভয়ের চোটে ছুটে বেরিয়ে এল। গাঁয়ের লোকেরাও তাদের ঘর বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল, জানোয়ারদের কেউ কিছু বলল না।

"একটা ভাল্লুক ছিল, সেরকম ভাল্লুক কেউ কখনো দেখে নি। তার

গলার লোমগুলো ছিল সাদা, মনে হত ফুলের মালা পরেছে বুঝি। আর যেমনি তার গায়ের জোর তেমনি তার সাহস। ওর জ্বালায় কারো মৌচাকে মধু থাকত না, আর কত লোককে যে খুনজখম করেছিল তার ঠিক নেই। কিন্তু এমনি চালাক যে কেউ তাকে মারতেও পারে নি, ধরতেও পারে নি।

"দাবানলের দিন সেও বন থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে একটা বাচ্চা, তার পায়ে কি হয়েছে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পড়ে গেল আমাদের সর্দারের একেবারে সুমুখে। আগের বছর সর্দারের ছেলের পায়ের হাড় চিবিয়েছে ঐ ভাল্লুক, সর্দারের হাতে তীর-ধনুক।"

"মেরে ফেলল?"

"সর্দার ধনুক তুলতেই ভাল্লুক তার বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর সর্দারও ধনুক নামিয়ে পিছন ফিরে চলে গেল। জন্তু-জানোয়ারকে ভালোবাসা চারটি খানিক কথা নয়, দিদি। একটা কুকুর কি একটা বেড়াল ঘরে বেঁধে রেখে তাকে আদর করলেই কি আর ভালোবাসা হল!"

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রুমু ডাকল, "দাদা!"

"কেন, কি হয়েছে?"

"মাঝে মাঝে ভুলো কেন পালিয়ে যায়? হয়তো এখানে ওর ততটা ভালো লাগে না?"

বোগি উঠে বসল, "ভালো লাগে না? এখানে ভুলোর ভালো লাগে না? তুই কি পাগল হয়েছিস?"

"তবে আসছে না কেন?"

বোগি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "আসছে না কারণ আসতে পারছে না। আর হয়তো আসবেও না।"

নিশ্চয় আসবে। একটা পাঁচঠেঙো মাকড়সা আর একটা সোনা-রুপোর মাদুলি পেলেই আসবে দেখ।

সাত

ঝগড়ু বললে, "আমাদের দুমকা একেবারে খর্‌খরে শুকনো হলে হবে কি, আমাদের পাহাড়ে নদীর জলে যখন বান ডাকে তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। এই তিন গাঁয়ে গেলাম দিব্যি সুন্দর পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে, আর ঘণ্টা তিন বাদে এসে দেখি লাল ঘোলা জলে ভরতি বিরাট নদী, আর তার সে কি আওয়াজ, কান ঝালাপালা হয়ে যায়। আবার রাত পোয়ালে যে নদী সেই। পায়ে হেঁটে পার হয়ে গাঁয়ে ফেরা যায়।

কোত্থেকে বানের জলে হাজার হাজার মাছ ভেসে আসে। নদীর জল দুই পাড় ছাপিয়ে ওঠে, তার পর যখন আবার নেমে যায়, যেখানে-সেখানে পাথরের ফোকরে ফাটলে জল আটকে থাকে, তার মধ্যে কত-রকম মাছ কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে।"

"সে মাছ তোমরা ধর, ঝগড়ু?"

"ধরি বৈকি। কদিন ধরে গাঁয়ের লোকে মনের সুখে মাছ খায়। দুমকার লোকরা বড় গরিব হয়, দিদি। তাদের বড় কষ্ট। শীতকালে টোপা কুল পাকলে, বিচিসুদ্ধু পাথর দিয়ে ছেঁচে খায় লোকে। তা হলে অনেকক্ষণ পেট ভার হয়ে থাকে, ভাত খেতে ইচ্ছা হয় না।

"তবে শুধু কি আর মাছ ধরে, তার চাইতেও আশ্চর্য সব জিনিস মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।"

"কি জিনিস, ঝগড়ু?"

"একবার আমাদের গাঁয়ের নান্দু জল নেমে যাবার পর, সন্ধেবেলায় চাঁদের আলোয় গেছে নদীর ধারে, বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথবে, তীরের কাছ থেকে। দ্যাখে কিনা চাঁদের আলোয় কি একটা লম্বা জিনিস বালিতে বেধে গিয়ে, স্রোতের সঙ্গে একটু একটু দুলছে।

"কাছে গিয়ে দ্যাখে আগাগোড়া আশ্চর্যরকম কারিকুরি করা সাদা রঙের একটা ছোট নৌকো। হাতির দাঁতের কি হাড়ের তৈরি বুঝতে পারল না। নৌকোর সামনের দিকটার গড়ন একটি অপরূপ সুন্দরী

মেয়ের মতো কিন্তু তার পায়ের বদলে আঁশে ঢাকা মাছের ল্যাজ।

"হাত বাড়িয়ে নৌকোটাকে টেনে ডাঙায় তুলতেই, নান্দুর চক্ষু চড়ক গাছ!

"নৌকোর মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে আশ্চর্য একটি মেয়ে। তার গায়ের রঙও হাতির দাঁতের মতো, হালকা পালকের মতো গড়নটি, চোখ খুলতেই নান্দু দেখলে তার ঘোর নীল রঙ, পরনে একটা ঘন সবুজ রেশমী কাপড়। চমকে মেয়েটি উঠে বসল, একবার চারি দিকে তাকিয়ে দেখল, তার পরে এক নিমেষে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

"নান্দু তার আঁচলখানি চেপে ধরল, এক মুঠি সবুজ রেশম তার হাতে রয়ে গেল, মেয়েটি স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল আর নৌকোটা বালির উপর পড়ে থাকল। ছোটবেলায় ঐ নৌকো আমিও দেখেছি।"

ঝগড়ু থামলে বোগি রাগ করতে লাগল। "তোমার সব গল্প হারানোর গল্প, ঝগড়ু, পাও নি কখনো কিছু?"

"তা হলে যাবে কাল দোলতলার মেলায়? সেখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে। রুমুদিদি, যাবে নাকি তোমার সেই একচোখ লোকের খোঁজে?"

রুমু বললে, "যাব, যাব, ঝগড়ু। চিনির মঠ কিনে দেবে তো?"

দিদিমাকে নিয়ে একটু গোল বাধল, "ঝগড়ু, তোমার সঙ্গে না গিয়ে ওদের দাদুর সঙ্গে গেলেই ভালো হত-না?"

"না, দিদিমা, দাদু গাছতলায় বসে খালি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে চায়, হাঁটতে চায় না।"

শেষপর্যন্ত ঝগড়ুর সঙ্গেই যাওয়া হল। দিদিমা বললেন, "সারাক্ষণ ঝগড়ুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তেলেভাজা খাবে না, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবে না।"

মেলার মাঠের উপরে মেঘের মতো ধুলো উড়ছে, প্যাঁ পোঁ করে বাজনা বাজছে। বোগি বলল, "সার্কাস দেখাবে তো ঝগড়ু? জানো, বাঁদরে ছাগলটানা গাড়ি চালায়, টেবিল চেয়ারে বসে চা ঢেলে খায়! আছে তোমাদের দুমকাতে অমন বাঁদর?"

ঝগড়ু বলল, "হাসিয়ো না, বোগিদাদা, দুমকাতে ও-সব ছেঁদো বাঁদরকে ঢুকতে দেয়া হয় না। পয়সা নষ্ট করে সার্কাস না দেখে একবার দুমকার বনের মধ্যে যেয়ো দিকিনি।"

"সে কিরকম বন, ঝগড়ু ?"

ঝগড়ুর মুখটা অন্যরকম হয়ে গেল, মেলার মাঠের উপরে ধুলোর মেঘের দিকে তাকিয়ে, হোঁচট খেতে খেতে ঝগড়ু চলতে লাগল। "সে গভীর বন, রুমুদিদি, শালগাছ, মহুয়াগাছ, সীতাহার গাছ, শিমুলগাছের ভিড় সেখানে। গাছের গা জড়িয়ে লতা ওঠে, শীতের আগে সেই লতায় ঝুরো ঝুরো সাদা ফুল ফোটে। বুনো মুরগি দেখেছ রুমুদিদি ? দুমকার বনে বুনো মুরগি চরে, কি তাদের রঙের বাহার। সমস্ত বন জুড়ে জন্তু-জানোয়ারদের খুট্‌খুট্ কিচির্-মিচির্, কিন্তু হঠাৎ চোখে কাউকে দেখতে পাবে না। নজর করে দেখো, দিদি, গাছের ডালের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ছাই রঙের পাখি বসে থাকে, চোখে পড়ে না। যেই-না একটু বাতাস বইল, লতাপাতা ডালপালা শির্‌শির্ দুল্‌দুল্ করে উঠল, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ্দুর এসে পাখির গায়ে লাগল, অমনি সে ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। বাইরেটাই শুধু ছাই রঙের, ডানার তলাটা শাঁখের মতো ঝক্‌ঝকে সাদা। গাছতলায় ঝোপ্‌ঝাপ্ থাকে, দিদি, তাতে ফুল ফোটে, কি তাদের সুবাস, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতিরা সেখানে ঘোরাফেরা করে।

"কিন্তু ঝোপের মধ্যে না যাওয়াই ভালো, বোগিদাদা, সেখানে সাপের বাস। হঠাৎ যখন চক্কর মেলে ওঠেন তাঁরা, যেমনি তাঁদের রূপের ছটা তেমনি তাঁদের বিষের জ্বালা। রূপের বড় জ্বলুনি, দিদি।"

"তোমরা ঝোপের মধ্যে যাও না, ঝগড়ু ?"

"আমরা যাব না, কেন ? দুমকার ছেলেরা সবাই সাপের মন্ত্র জানে।"

"কি মন্ত্র বল।"

ঝগড়ু জিব কেটে বললে, "সে অন্য কাউকে বলা যায় না, বোগিদাদা, তবে ছোট্ট একটা তামার মাদুলিতে ভরে, তোমার হাতে বেঁধে দিলে, আর ওঁরা তোমায় কিছু বলবেন না।"

"বল, দুমকার বনের কথা আরো বল।"

"ঐখানে ছোটবেলায় বাবুদের সঙ্গে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম।"

"পাখি তো বিলের ধারে শিকার করতে হয়। আঃ, রুমু, খালি খালি কাঁদো কেন ?"

"সবুজ পায়রার গলায় বন্দুকের গুলি লাগলে রক্ত বেরয় দেখেছি।"

"না, দিদি, না, সে সবুজ পায়রার সময় নয়। আমাদের বনে

একরকম লালচে রঙের ল্যাজঝোলা পাখি থাকে, মাথায় তাদের কালো ঝুঁটি, বাবুরা তাদের শিকার করে। সে পাখি বিলের ধারে থাকে না।"

"তার পর কি হল ?"

"বাবুরা অন্য পাখি দ্যাখে, ছোট-ছোট জানোয়ার দ্যাখে, কিন্তু সব ছেড়ে দেয়। এমনি সময় এক পাল বাঁদরের সামনে পড়ে গেল। বাঁদর মারতে ওরা যায় নি, শুধু শুধু মজা করে বন্দুক তুলতেই, বিশ্বাস করবে কি না জানি না, বাঁদরগুলো সব হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তাই দেখে বাবুরা হেসে উঠল, কিন্তু একজনার হাতের বন্দুক কি করে জানি ছুটে গিয়ে, একটা বাঁদর মরে গেল। অমনি এক নিমেষে সব বাঁদর হাওয়া! মরা বাঁদরটা পর্যন্ত রইল না।"

"তোমার দুঃখ হয় নি, ঝগড়ু ?"

"দুঃখ বলে দুঃখু, রুমুদিদি ? কিন্তু কি করি, বাবুরাও কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য কথা, বনটার চেহারাও যেন বদলে গেল। হঠাৎ এক সময় সকলের খেয়াল হল, কোথাও একটা টুঁ শব্দ নেই। গহন বনটা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে, কোথাও একটা পাখি নেই, কাঠবেড়ালী নেই, পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ নেই, ঝোপের মধ্যে চক্‌চকে চোখ নেই।"

"তার পর, ঝগড়ু ?"

আট

ঝগড়ু বললে, "তার পর ? তার পর বাবুদের মনে ভয় ঢুকে গেল, তারা বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। যার হাতের বন্দুক ছুটে গেছিল, সে যাচ্ছে সবার আগে, এমন সময় তাকে খরিশে ছোবলাল।"

"খরিশ ? খরিশ কি ঝগড়ু ?"

"খরিশ আমাদের সাপ, রুমুদিদি, ভারি তাঁর তেজ। মাথায় তাঁর খড়ম আঁকা থাকে।"

"তার পর লোকটা বোধ হয় মরে গেল ?"

"না, বোগিদাদা, আমরা পাঁচজনা দুমকার ছেলে ছিলাম সাথে, মরবে

কেন? তাকে আমরা ওষুধ করে বাঁচিয়ে দিলাম, তবে তাকে কথা দিতে হল আর বন্দুক ধরবে না।"

"তা কেন ঝগড়ু? তোমরাও তো জানোয়ার মারো।"

"বোগিদাদা, আমরা মারি পেটের জ্বালায় কিম্বা প্রাণের তরে। তার পর শোনই-না, এমনি সময় আমার নাকে এল কি মিষ্টি গন্ধ সে আর কি বলব। বাবুরা এগিয়ে গেল, আমি খুঁজে খুঁজে মরি, দেখি গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ফুটে আছে এক গোছা ভুঁই-চাঁপা। কি তাদের রূপ দিদি, মনে হয় সাদা মোমের তৈরি, তার মধ্যে বেগনী রঙের চিত্তির করা। আর ভুঁই-চাঁপার পাশে মাটির উপর পড়ে আছে সাপের মাথার মণি।"

"না, ঝগড়ু, যা-তা বললে হবে না, আমাদের বইতে আছে, সাপের মাথায় মণি হয় না।"

"সে তো তুমি বললেই হবে না, বোগিদাদা, নিজের চোখে দেখলাম।"

"কোথায় সে?"

"আরি বাবা! সাপের মাথার মণিতে হাত দেব আমি! তুমি কি পাগল হলে? তা হলে উনিই-বা আমাকে ছাড়বেন কেন? যেখানেই লুকোই-না কেন, ঠিক খুঁজে বের করবেন। না, বোগিদাদা, যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে ঘরে ফিরে এলাম।"

"সাপের মাথার মণি কেউ নেয় না, ঝগড়ু?"

"নেবে না কেন, দিদি? যাদের দেখাশুনো শেষ হয়ে গেছে, তারা নেয়। আমার যে এখনো ঢের বাকি আছে। চলই-না মেলায়, সেখানে একটু খুঁজে দেখা যাবে।"

ততক্ষণে মেলার কাছে ওরা পৌঁছে গেছে। কি নেই ঐ মেলায়? বোগি রুমু মাথা উঁচু করে নাক তুলে বুক ভরে মেলার গন্ধ শুঁকে নিল। সব্বাই তেলেভাজা খাচ্ছে, পাঁপড় খাচ্ছে, আলুকাবলি খাচ্ছে, গোলাপী বাতাসা খাচ্ছে, টানাল্যাবেঞ্চুষ খাচ্ছে।

ঝগড়ু বললে, "এদিকটা ঢের ভালো, দিদি, দ্যাখ এই-সব ভালো ভালো বাঁশি, আয়না, কাচের পুতুল, দু-আনা করে বিলিয়ে দিচ্ছে। দ্যাখ কেমন কাচের চুড়ি, মোতির মালা, চুলের ফিতে। ছাঁচি পান খাবে? দিদিমা তো পানের কথা কিছু বলেন নি—"

ঝগড়ু এইরকম বলছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত লোক এসে ওদের

পাশে দাঁড়াল। বেজায় লম্বা, বেজায় রোগা, হাড়গোড় বের করা, গর্তের মধ্যে চোখ ঢোকা, তার ঢাকনি পিট্‌পিট্‌ করছে, ভুরু নেই, ছক-কাটা সরু ঠ্যাং পেন্টেলুন পরা, মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা টুপি, বগলে রুপো-বাঁধানো ছড়ি আর একটা থলে, আর দশ আঙুলে দশটা চমৎকার লাল-নীল পাথর বসানো আংটি।

তাকে দেখেই বোগি রুমুকে অন্য পাশে টেনে নিল। তাই দেখে লোকটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার পেরেক ফোটানো লম্বা-লম্বা দাঁত বের করে খিক্‌খিক্‌ করে হাসতে লাগল।

"কোথায় সরাবে ওকে, খোকাবাবু, ইচ্ছে করলেই আমি ওকে এক্ষুনি একটা জোনাকি পোকা বানিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তা জানো? অমনি আমার কত আছে, এই দ্যাখ।" বলেই লোকটা হাতের মুঠো খুলে দেখাল, আট-দশটা কালো পোকা কিল্‌বিল্‌ করছে।

রুমু বলল, "যাঃ, বাজে কথা, ওগুলো মোটেই জোনাকি পোকা নয়, জোনাকি পোকাদের আলো জ্বলে।"

লোকটা খুব হাসল। "রাতে এদের দেখো খুকি, চোখে তাক লেগে যাবে। সুন্দর জিনিস চেনো না? সাদা চোখে কালো কুচ্ছিৎ, নকল আলোয় চমৎকার।"

পোকাগুলোকে লোকটা পকেটে পুরে রাখল।

"ওরা মরে যাবে না?"

"গেলই-বা, এমনি আরো কত পাব।"

বোগি রুমু একটু সরে দাঁড়াল। "ঝগড়ু, চল।" লোকটাও একটু ঘেঁষে এসে বলল, "ভয় পাচ্ছ?" ঝগড়ু বলল, "যাদের সঙ্গে সঙ্গে দুমকার ছেলে রয়েছে, তাদের আবার ভয় কিসের?" লোকটা খুব হাসল। "উত্তরমেরুতেও ঘুরে এসেছি, ভয় কোথায় নেই বলতে পার?" ঝগড়ু বুক ফুলিয়ে বলল, "দুমকায় ভয়ের জায়গা নেই।"

"নেই, যাবে আমার সঙ্গে ঘোর রাত্রে তোমাদের মহা শিরীষগাছের তলায়?"

ঝগড়ু বোগি রুমুর হাত ধরে টানতে লাগল, "চল, দিদিমা-না অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে মানা করেছেন?"

তাই শুনে লোকটা হেসেই খুন।

"কে অচেনা? যে মনের কথা জানতে পারে, তাকে দ্যাখে নি

বলেই ব্যস্ সে অচেনা হয়ে গেল ? তোমার সাহস থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির বহরটি তো বেশ ! তা ছাড়া আমার কাছ থেকে একটা কিছু না কিনে যেতে পাবে না ।"

"না, না, ওদের কাছে বেশি পয়সা নেই, মেলা কেনবার আছে ।"

লোকটা রুমুকে বলল, "ঘুম থেকে উঠে কি খেয়েছিলে দিদি ?"

"ডিমসেদ্ধ, রুটি, দুধ, কলা ।"

"তার পর দুপুরে ?"

"মাছ ভাত ।"

"আর আমি কি খেইছি জানো ? সেই কাল রাত্রে চাট্টিখানিক বকফুল ভাজা । তাও একজনকে ভাঁড়িয়ে, পাঁচটা মিথ্যে কথা বলে । মিথ্যে বলা ভারি খারাপ জানো তো ? কিনবে কিছু ? সেই পয়সা দিয়ে আমি আলুকাবলি কিনে খাব ।"

ঝগড়ু তখনো বোগি রুমুর হাত ধরে টানছে । রুমু বললে, "কই, দ্যাখাও কি আছে ?"

লোকটা বললে, "তিনফলা ছুরি কিনবে ?"

বলেই একটা আশ্চর্য তিনফলা ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো ছুরি বের করল ।

ঝগড়ু বলল, "না, ওতে ধার থাকে না ।"

"তবে কি জাপানী তারের ধাঁধা কিনবে ?" বলেই একটা চক্‌চকে সোনালী জড়ানোমড়ানো তারের গোছা বের করল ।

"না, ও দুদিনে পাকিয়ে যায় ।"

"তা হলে এই সাপের মাথার মণিটা কেনো ।" বলেই ফস্ করে থলে থেকে একটা লাল ন্যাকড়ার টুকরো বের করল । তার মধ্যে এই এত্ত বড় একটা সাদা পাথর হীরের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করছে, চার দিকে তার পল কাটা, তাতে রোদ পড়ে রামধনুর রঙ ঠিকরোচ্ছে । ঝগড়ু চেঁচিয়ে বললে, "দ্যাখ রুমুদিদি, ওতে হাত দিলে, ভালো হবে না বলছি ।"

লোকটা হেসে বলল, "কেন, কি হবে ?"

"তা হলে আমি—দুমকা চলে যাব ।"

"না, ঝগড়ু না, সাপের মাথার মণি নেব না । আর কি আছে দ্যাখাও ।"

লোকটা রুমুর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "সাপের মাথার মণি দিতে আমারও একটু আপত্তি ছিল, খুকি, নেহাত তুমি

লোকটা বললে, "তিনফলা ছুরি কিনবে ?"

বলেই দিচ্ছিলাম। তা ভালোই হল, কলজের জিনিস কি আর অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে হয়? তবে তুমি কি বাক্সের ভিতর বাক্সের ভিতর বাক্সের ভিতর আশ্চর্য জিনিস নেবে?"

বলে একটা কাঠের বাক্স বের করল। এতটুকু, রুমুর হাতের মুঠির সমান হবে। "চীনে কারিগররা ছাড়া এ জিনিস বড় একটা কেউ করে না, খুকি। এই দ্যাখ কেমন ডিমের খোলার মতো পাতলা বাক্সের গা।"

একটার ভিতর—একটার ভিতর একটা করে দশটা বাক্স বেরুল। শেষেরটার মুখ এটে রয়েছে, ঝাঁকালে ভিতরে কি নড়ে।

নখের কোনা দিয়ে খুঁটে লোকটা সে বাক্সটাও খুলে ফেলল। ভিতরে একটা লম্বা লাল বিচি, অনেকটা নিমের বিচির মতো, কিন্তু অনেক বড়। পালিশ করা চক্‌চক্‌ করছে, এক কোনায় একটা সাদা চোখের মতো।

"কি ওটা?"

"ঐখান দিয়ে ওর শেকড় গজাবে, দিদি। পৃথিবীতে এরকম গাছ আর একটাও পাবে না খুঁজে। পুঁতবে কিন্তু ছাইয়ের গাদায় কি আঁস্তাকুড়ে। ফুল যখন ধরবে দেখবে কোথায় লাগে পারিজাত। ভালো জায়গায় লাগালে ফুল ধরবে না কিন্তু।" ঝগড়ুর বোধ হয় একটু রাগ হয়েছিল, দূর থেকে টাকাটা ফেলে দিয়ে, ওদের টেনে নিয়ে চলল। প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলল ঝগড়ু।

লোকটা গোড়ালি ঠুকে একটা সেলাম ঠুকল। রুমু বললে, "রাগ করলে, ঝগড়ু?"

ঝগড়ু ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

"না, দিদি রাগ করি নি। মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে ওঠে। রাগ করি নি। ও গাছ হল গিয়ে মানুষের মনের গুণের মতো, কষ্ট না পেলে ফুটে ওঠে না। ওর নাম দিয়ো গুণমণি। আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছাইগাদার মধ্যে পুঁতো।"

নয়

বাড়ি ফিরেই ছাইগাদার মধ্যে বোগি বিচিটা পুঁতে ফেলল। ঝগড়ু একটু হেসে বলল, "কই নাচ-গান হল না? গাছ পুঁতলে যে নাচতে হয়, গাইতে হয়?"

রুমু বোগি কি করে? অবিশ্যি একটু নাচলে গাইলেও হয়। ঝগড়ু ছাড়া কেই-বা দেখবে। কিন্তু ঝগড়ুই বলল, "এ গাছের জন্য নাচগান লাগে না, বোগিদাদা, অমনি পুঁতে দাও। এ হল দুঃখীদের গাছ, তোমাদের ঘটা করার জন্য বসে থাকবে না। তিনদিন বাদে দেখো এসে, ওর কল বেরুবে।"

থেকে থেকে কালো ছেলেটার জ্বর হয়। ঝগড়ুর বউ তখন রাঁধাবাড়া ফেলে তাকে দিনরাত বুকে করে বসে থাকে। রুমু ওর কপালে হাত দিয়ে দেখে, আগুনের মতো গরম।

"একটু ওষুধ খাইয়ে দাও-না, সেরে যাবে।"

ঝগড়ুর বউ বলে, "দুমকা থেকে মাদুলি আনতে দিয়েছি, দিদি, তা হলে আর জ্বর আসবে না।"

ঝগড়ুকে বোগি জিজ্ঞাসা করল, "শেয়ালরা কুকুররা হলদে পাখি খেয়ে মানুষ হয়ে, তার পর যদি মরে যায়, তা হলে কি আবার শেয়াল কুকুর হয়ে যায়?"

ঝগড়ু তাই শুনে অবাক। "মরে গেলে আবার শেয়াল কুকুর কি, বোগিদাদা? মরে গেলে মানুষই-বা কি? দ্যাখ গিয়ে ছাইগাদায় গুণমণির কল গজিয়েছে।"

ওমা তাই তো। বিচি পুঁতেছিল বোগি ছাইগাদার ঠিক মাঝখানে, কেমন করে সরে গিয়ে, ছাইগাদার একপাশে মস্ত একটা বাঁকানো বোঁটা দেখা যাচ্ছে।

দিদিমাও দেখতে এলেন। "ওমা, ঐ বুঝি তোদের সেই মেলায় কেনা শিমগাছ? ছুঁস নে, রুমু, ও জায়গাটা বড় নোংরা, ভালো জায়গায় লাগালি না কেন? তবে ওখানে সার পাবে যথেষ্ট, দেখতে

দেখতে লক্‌লকিয়ে উঠবে দেখিস।"

ভালো জায়গায় লাগালে গুণমণির ফুল ধরবে না। মেলার সেই লোকটা কোথায় থাকে কোথায় শোয় কে জানে? ঝগড়ুকে জিজ্ঞাসা করতে হল।

"ঐ লোকটা? ওকে নিয়ে আবার তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটা। কাচের গোলা নিয়ে বলে সাপের মাথার মণি!"

"ওটা সত্যি সাপের মাথার মণি নয়, ঝগড়ু?"

বোগিও বিরক্ত হল। "তবে ওটা দেখে ঘাবড়াচ্ছিলে কেন? আমাদের হাত দিতে বারণ করেছিলে কেন? তোমার চালাকি আমরা বুঝি না ভেবেছ? সারাক্ষণ দুমকা দুমকা কর, কতদিন দুমকা যাও নি বল তো?"

ঝগড়ু জল গরমের কাঠ কাটছিল। কুড়ুল দিয়ে কাঠ লম্বা করে চিরে, কাঠের গাদায় কাঠটা আর কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে, বারান্দার কোনায় ওদের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল।

"দিনের হিসাব আর রাখি না, বোগিদাদা। দুমকা যাবার আমার দরকারটাই-বা কি বল? আমার মনের মধ্যে আমি দুমকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। দুমকায় কি করে যাই? সেখানে বড় কষ্ট।"

"কেন, তোমার মনের দুমকায় কষ্ট নেই?"

ঝগড়ু একবার বোগির মুখের দিকে, একবার রুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে।

"কষ্ট কাকে বলে জানো?"

রুমু বলে, "ভুলো চলে গেছে বলে আমাদের কষ্ট হয়, ঝগড়ু। ভুলোকে আমরা ভালোবাসি। তোমার বাড়ির লোকদের তুমি ভালোবাসো না?"

ঝগড়ু হেসে বললে, "তা আর বাসি না? বুড়ি মাকে মাস মাস টাকা পাঠাই। সে রুপোর পৈঁচে গড়িয়েছে। ভারি খুশি হয়েছে। আর বোশেখে আমার সবার ছোটো ভাই নানকুর বিয়ে দেব, যাব তখন।"

"নানকুর বিয়েতে আমাদের নিয়ে যাবে, ঝগড়ু? আমাদের দুমকায় যেতে ইচ্ছে করে।"

"সে তো আমার মনের দুমকায়, বোগিদাদা। পাহাড়ের ধারের ঐ দুমকা হয় তো বদলে গেছে, শুনেছি ভালুকরা আর মহুয়া খেতে

আসে না।"

"ঝগড়ু, তুমি কি ঐ সত্যি দুমকাকে ভালোবাস না?"

"কি জানি দিদি, আজকাল আমার ভালোবাসাগুলো কেমন গুলিয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক যে দুমকার মতো জায়গা নেই কোথাও।"

দিদিমা ভুলোর থালা, ছেঁড়া কম্বল, আর চেনকলার জল গরমের ঘরের তাকে তুলে রাখলেন। কিন্তু দরজায় জানলায় যেখানে সেখানে ভুলোর নখের সব আঁচড়ের দাগ, বারান্দার দেয়ালে ভুলোর পিট ঠেসার দাগ।

ঝগড়ুর ঘরের কালো ছেলেটা রুমু বোগির কোলে আর আসতে চায় না; ওদের দেখলে বউয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

বউ ওদের বুঝিয়ে বলে, "জ্বর হলে ওদের মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যায়, বোগিদাদা। রাতে ভালো ঘুমোয় না।" রুমু জিজ্ঞাসা করল, সেই মাদুলি আনলে না? কিসের তৈরি হয় সে মাদুলি?"

"তা সে তামার হয়, সীসের হয়, অনেকরকম হয়।"

"সোনা-রুপোর হয় না বউ?"

"আমরা গরিব মানুষ, সোনা-রুপো কোথায় পাব বল? দ্যাখ গিয়ে তোমাদের শিমগাছে পাতা হয়েছে।"

"না। আমাদের গাছের উপর কাল ঝগড়ু ভুলে ছাই ঢেলে দিয়েছে, গাছ মরে গেছে।"

"তোমরা দ্যাখই-না গিয়ে।"

গিয়ে দ্যাখে সত্যি সত্যি রাতারাতি গুণমণি আরো খানিকটা লম্বা হয়ে, আবার ছাইগাদার উপর মাথা তুলে আছে, ছোট-ছোট ফিকে সবুজ চারটি পাতা বাতাসে নড়ছে।

ঝগড়ু শুনে বললে, "তাতে আর আশ্চর্যটা কি, বোগিদাদা? দুনিয়াটাই তো আশ্চর্য জিনিসে ঠাসা; তোমার বুইওয়ালারা সে-সব কথা না লিখলে আর আমি কি করব?"

বোগি বলল, "বইতেও অনেক আশ্চর্য জিনিসের কথা থাকে, ঝগড়ু। তুমি জানো উত্তর মেরুতে ছমাস করে রাত হয় আর ছমাস করে দিন হয়?"

ঝগড়ুকে নিয়ে মহা মুশকিল, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। "হ্যাঁ! ছমাস ধরে দিন হয় বৈকি! তবে কি বলতে চাও সূর্যটার ছমাস

লাগে আকাশটা পেরুতে ?"

"না ঝগড়ু, আমার বইতে লিখেছে, ওখানকার সূর্য মাঝ আকাশ পর্যন্ত ওঠেই না, চাকার মতো আকাশের চার দিকে ঘোরে। প্রথমে, যেখানে মাঠ গিয়ে আকাশে মিশেছে—তাকে দিগন্ত বলে ঝগড়ু—সেইখানে চার দিকে বালার মতো ঘুরে আসে। তার পর তিনমাস ধরে একটু করে উঁচুতে উঠে ঘোরে। আবার তিনমাস ধরে একটু করে নীচে নেমে ঘোরে। শেষটা ছমাস হলে, গাছের পিছনে তলিয়ে যায়, তার পর ছমাস আর তার মুখ দেখা যায় না। জানতে এ-সব ?"

ঝগড়ু হেসে বলল, "এত সব কথা বিশ্বাস কর বোগিদাদা, অথচ আমি যদি আমাদের জাদুকরা ছাগলের গল্প বলি, বিশ্বাস করবে না তো ?"

বোগি রুমু ঝগড়ুর কাছে এসে বলল, "বল-না জাদুকরা ছাগলের গল্প, ঝগড়ু।"

দশ

ঝগড়ু বললে, "তোমরা ছাগল ভালোবাসো, দিদি—"

রুমু বললে, "দাদুকে ছাগলে তাড়া করেছিল, জানো ঝগড়ু ?"

বোগি বলল, "হ্যাঁ, ভীষণ দুষ্টু হয় ওরা। ছাগলটা অনেকক্ষণ দাদুর পিছনে পিছনে ঘুরেছিল, যাতে দাদুর কোনোরকম সন্দেহ না হয়। তার পর একটি পেয়ারা গাছে শিঙে একটু শান দিয়ে নিয়ে, হঠাৎ তেড়ে এল। দাদু দারুণ ছুটতে পারে, জানো ঝগড়ু ? তবু অমরকাকাদের বারান্দায় উঠে তবে প্রাণ বাচল।"

রুমু আরো বলল, "আর দাদু বলেছে, ছাগলটা যখন দেখল শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন সে রেগে নাক দিয়ে হাওয়া ছাড়তে লাগল, আর মাটিতে খুর ঠুকতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু হয়।

ঝগড়ু রাগ করে বলল, "বেশ, তা হলে রইল জাদুকরা ছাগলের গল্প। কোথায় কার দাদুকে ছাগলে একটু তাড়া করেছিল, কামড়ায় নি পর্যন্ত আর তাই সব ছাগল দুষ্টু হল, এরকম কথা তো কখনো শুনি

নি। উঠি আমি, কাজ আছে অনেক।"

"না ঝগড়ু, না। দুমকার ছাগলের কথা বলি নি আমরা। বলতেই হবে তোমার গল্প।"

ঝগড়ু খুশি হয়ে বলল, "আচ্ছা, তা হলে একটা পান মুখে দিয়ে আসি।"

ঝগড়ু বলতে লাগল—

"আমার বুড়ো ঠাকুরদার কাচ তৈরির গল্প তো তোমাদের বলেইছি। তাঁর ছেলে, আমার ঠাকুরদা ভারি নেশা করতেন।"

"ইস্, কি খারাপ!"

"কেন, খারাপ কেন?"

"দিদিমা বলেছেন খারাপ লোকরা নেশা করে।"

"তা বলতে পারো তোমাদের ইচ্ছে হলে, তবে কি জানো, খারাপ লোকরা তো ভাতও খায়। আর আমার ঠাকুরদা অন্য কারণে নেশা করতেন।"

"কি কারণে বল, ঝগড়ু।"

"কি মুশকিল, এত ভালো লোক ছিলেন সব বিষয়ে, আর নেশা করবার জন্য এক পয়সা খরচাও হত না, বনভরা মহুয়া ছিল, কত খাওয়া যায়। জানো বোগিদাদা, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারটে তো মোটে দিক। তা ছাড়া এক যদি কয়লার খনিতে মাটির নীচে সেঁধিয়ে যাও, তা হলে আবার শুনেছি বাইরের চোখ কান আর মনের চোখ কান সবেতে নাকি ধাঁধা লেগে যায়। নয় তো উপরে আকাশের দিকে ডানা-ভাঙা চিলের মতো চেয়ে থাকা যায়। মোট কথা ঠাকুরদার অতটুকু জায়গাতে কুলোত না, তাই নেশা করতে হত। নেশা করা খারাপ হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরদা খারাপ ছিলেন না।"

"না, না, আমরা জানতাম না। বল তার পর।"

"তার উপর ঠাকুমার ছিল যেমনি রাগী স্বভাব তেমনি গায়ে জোর। ঠাকুরদাকে নানারকম ফন্দি করে বাড়ি থেকে দূরে দূরে গিয়ে থাকতে হত। অথচ বাড়ির মতো আরামটি কোথায় পাবেন?

"তখন ঠাকুরদা বুদ্ধি করে ওখানকার সব চাইতে উঁচু পাহাড়ে ছাগল চরাতে যেতে আরম্ভ করলেন। ছাগলরা খুশিমতো চরে বেড়ায় আর ঠাকুরদা গাছতলায় পড়ে ঘুম লাগান। যেই সূর্য নেমে যায়, পাহাড়ের

উপর থেকে রোদ সরে যায়, ঠাকুরদার শীত করে, আর অমনি ঘুম ভেঙে যায়, ছাগল গুণে নিয়ে ঠাকুরদা পাহাড় থেকে নেমে আসেন, ছাগল নিয়ে গিয়ে ঘরে তোলেন, ছোট্ট কাঁসার বালতিতে দুধ দোয়ান, তবে তাঁর কাজ শেষ হয়।

একদিন কেমন যেন বেশি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কখন রোদ নেমে গেছে টের পান নি। ঘুম ভাঙতে চেয়ে দ্যাখেন গাছের ছায়াগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, হিম পড়ছে, ছাগলরা পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে!

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে নেমে এলেন। জায়গাটার নাম বড় খারাপ—ঠাকুরদা ছাড়া কেউ সেখানে যেতেই চায় না—ছাগল গুণে নেবার আর তর সইল না, সরাসরি বাড়িমুখো চললেন।

দোরগোড়ায় ছাগল গুণে ঠাকুমা দেখেন একটা ছাগল কম! ঠাকুমার রাগ দ্যাখে কে! 'সোনালিয়াকেই ছেড়ে এলে! এত নেশা কর! যাও তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।'

ঠাকুরদার নেশার ঘোর তখনো ছোটে নি, রাগ হল বটে, কিন্তু যা কান বোঁ বোঁ করছে, রাগটা আর দেখাতে পারলেন না। ফিরে গেলেন পাহাড়ে।

চাঁদের আলো ফুট্‌ফুট্‌ করছে, পাহাড়ে উঠে দ্যাখেন সেই চাঁদের আলোয় হাজার হাজার ছাগল চরছে। মাঝখান দিয়ে ঝির্‌ঝির্‌ করে এক ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, তার এপারে ওপারে ছাগল চরছে। কই দিনের বেলায় তো ঝরনা চোখে পড়ে নি!

কয়েকজন দাড়িওয়ালা বুড়ো লোক ছাগল চরাচ্ছে, ঠাকুরদা তাদের কাছে গিয়ে সোনালিয়াকে চাইলেন। তারা উত্তর না দিয়ে ছাগলের পাল দেখিয়ে দিল।

ঠাকুরদা সোনালিয়াকে চিনতে পারেন না। যে ছাগলের দিকে তাকান তাকেই মনে হয় সোনালিয়া। রগড় দেখে দাড়িওয়ালা বুড়োরা হেসেই কুটোপাটি। সেই হাসি শোনবামাত্র ছাগলরা সব দলে দলে ঝরনা পার হয়ে চলে যেতে লাগল।

তখন ঠাকুরদা সামনে যাকে পেলেন, তাকেই মনে হল সোনালিয়া, তাকেই কোলে তুলে নিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে পাহাড় থেকে নেমে একেবারে বাড়িতে।

সোনালিয়াকে দুইতে গিয়ে ঠাকুরদা অবাক হয়ে গেলেন, বালতি

ভরে দুধের গঙ্গা বয়ে যেতে লাগল, তবু থামে না। এমন সময় ঘরের দরজায় কে টোকা দিল।

গিয়ে দেখেন একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে, সঙ্গে তার সোনালিয়া। এতক্ষণে সত্যি সোনালিয়াকে চেনা গেল। ঠাকুরদা অন্য ছাগলটাকে এনে দিলেন। লোকটা যাবার আগে মুচকি হেসে ঠাকুরদার তামাকের দিকে দেখিয়ে দিল। দিলেন তাকে একদলা তামাক, তার বদলে সে তাঁকে এই জিনিসটে দিয়ে গেল।"

এই বলে ঝগড়ু তার কোঁচড় থেকে ছোট্ট একটা কালো গোল ফল বের করে দেখাল, তার বোঁটার কাছটা রুপো দিয়ে বাঁধানো।

"কি হয় এতে, ঝগড়ু? কেন দিয়েছিল?"

"কি হয়? এ কাছে থাকলে লোকে স্বপ্ন দ্যাখে বোগিদাদা, আর কোনো দুঃখু তার গায়ে লাগে না। নেশা করবারও দরকার লাগে না। চল, চল, মেঘ করে আসছে, দেখ এবার জোর জল পড়লে গুণমণির কি দশা হয়।"

এগারো

রুমু দেখল কিছুতেই কিছু হয় না গুণমণির; ছাই দিয়ে চাপা পড়ে যায়, বৃষ্টির তোড়ে শুয়ে পড়ে, পরদিন সকালে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, জোড়া জোড়া পাতার কুঁড়ি ফুটে যায়। দিনে দিনে গুণমণি বাড়তে থাকে।

কিন্তু ভুলো আর আসে না।

"দাদা, ভুলো একদিন কাদাপায়ে তোমার খাটে উঠেছিল বলে তুমি ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে কেন?" রুমু খুব কাঁদতে থাকে।

ঝগড়ু এসে বলে, "ও কি, খালি খালি চোখের জল! তবে আর সুখনের কথা কাকে বলি?" রুমু চোখ মুছে বলে, "কে সুখন, বল ঝগড়ু।"

ঝগড়ু বলে, "আমার ছোট ঝমরু, তার ছোট সুখন, তার ছোট নানকু। সুখনও মাটিতে শেকড় গাড়লে না।"

"মাটিতে কেন শেকড় গাড়বে, ঝগড়ু ?"

"ফেরারী হয়ে রইল, দিদি, ঘর বাঁধল না কোথাও। আগে কিন্তু ভারি সুখের প্রাণ ছিল তার। ভালোটি খাবে, ভালোটি পরবে, এ চাই, ও চাই। সেই লোভে সর্দারের বোবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলল সুখন, কারো মানা শুনল না। এমন সময় ভারি জলের কষ্ট হল সেবার।

আমাদের গাঁয়ের লোকে চাঁদা করে বড় ইঁদারা কাটাবে ঠিক করল। জল-খোঁজারা এল।"

"জল-খোঁজা কারা, ঝগড়ু ?"

"তারা বেদেনী, বোগিদাদা। হাতে একটা তিন মুখো কাঁচা লাঠি নিয়ে ঘুরতে লাগল, পাহাড়ের কোলের কাছে এসে লাঠির মুখ বেঁকে মাটিতে ঠেকে গেল। বেদেনীরা সর্দারকে বলল, এইখানেই খোঁড়ো, সর্দার, এইখানে জল আছে।

"অমনি আমাদের গাঁসুদ্ধু লোকে, পুরুষ মেয়ে, ছেলে বুড়ো কোদাল নিয়ে লেগে গেল। খুঁড়তে খুঁড়তে এক মানুষ, দুই মানুষ মাপ করে করে যায়। আট মানুষ হয়ে গেল, তবু আর জল বেরয় না।

"বেদেনীদের আবার ধরে আনা হল। তারা তবু বলে, আছেই জল, ঝরনার মুখে কিছু বেধে আছে, বের করে ফেল, জল পাবেই।

"সেদিন বিকেলে খুঁড়তে খুঁড়তে সুখনের কোদালে কি একটা জিনিস লাগল। বের করে দ্যাখে, পাথরের মতো শক্ত একটা বাঁশের চোঙ। কিছুতেই খুলতে পারল না, কোদাল দিয়ে ভেঙে ফেলতে হল। খানিকটা কাঠের গুঁড়োর মতো কি জিনিস ঝুর্‌ঝুর্ করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল, আর পড়ল একটা ফিকে হলদে পাথরের মূর্তি।

"আধ হাত লম্বা হবে দিদি, পাতলা ফিন্‌ফিন্ করছে, লতাপাতার মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ নিচু করে। পড়ন্ত রোদে সুখন তাকে হাতে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি কাছে যেতেই বলল, দ্যাখ, দাদা, ওর বন্ধ চোখের তারা দিয়ে আমার বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

"ঘরে নিয়ে গেলাম মূর্তিটাকে। গাঁসুদ্ধু সবাই দেখতে এল। সর্দার বললে ওর পুজো না দিলে খারাপ হবে সুখন, মাটি থেকে না তুললেই ভালো ছিল। বন্ধ চোখে দৃষ্টি থাকে এমন তো কখনো শুনি নি।

সর্দার বললে, "সুখন, পুজো না দাও, কাল আমাকে সদরে যেতে হবে, ওকে সরকারের কাছে জমা দিয়ে আসি। এ-সব জিনিস ঘরে রাখতে নেই, সুখন।"

"তার পর কি হল, ঝগড়ু?"

"তার পর কি হল? সেই রাত্রেই মূর্তিটাকে নিয়ে সুখন কোথায় চলে গেল। আর তাকে দেখি নি।"

"মরে গেছে তা হলে।"

"সবাই মরবে কেন, বোগিদাদা? সুখন মোটেই মরে নি, মাঝে মাঝে দেশে টাকা পাঠায়। তবে ওর শেকড় কেটে গেছে।"

"তা হলে দেশকে ভালোবাসে না বোধ হয়।"

"দেশে না থাকলেই দেশকে ভালোবাসা যায় না? ভালোবাসার জিনিসকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে হবে নাকি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা। আর ইঁদারার কি হল?"

"ইঁদারায় সে কি মিষ্টি জল উঠল, দিদি। এখনো আমাদের গাঁয়ের লোক ঐ ইঁদারার জল খায়, ফটিকের মতো পরিষ্কার, মধুর মতো মিষ্টি। জষ্টিমাসে দারুণ খরার সময়ও ঐ কুয়োতে দু-মানুষ জল থাকে। কিন্তু সুখনকে আর দেখলাম না।"

"তোমাদের বাড়ি কিরকম বল-না ঝগড়ু।"

"মাটির বাড়ি বোগিদাদা, শীতের ভয়ে ছাদগুলো নিচু করে তৈরি। তবে চার দিকে ঘুরে উঁচু মেটে দাওয়া, গোবর দিয়ে নিকিয়ে আমার মা তক্‌তকে করে রাখে। জানলার চাটাইয়ে, দোরের দুই পাশে আমার মা নিজের হাতে ফুল লতাপাতা মাছ শাঁক এই-সব এঁকে রাখে। সে দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, বোগিদাদা, মনে হয় মনের পাখি ডানা ঝাপটানি বন্ধ করে বাসায় এসে বসুক। আমার মা রাঁধে ভালো, রুমুদিদি, মেয়েমানুষকে রাঁধা-বাড়া শিখতে হবে।"

"দিদিমা আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না।"

"আঃ, রুমু, চুপ কর। বল, ঝগড়ু, তুমি এতকাল দেশে যাও না, তোমাদের বাড়ি কেমন দেখতে হয়েছে জানলে কি করে?"

"বাঃ, তা জানব না, আমার চোখের মণিতে গাঁথা হয়ে থাকে, কেমন দেখতে জানব না?"

"দিদিমাকে বলে একবার যাও-না কেন ঝগড়ু? তোমার বুড়ি মা

কত খুশি হবে।"

"নানকুর বিয়ে দিতে যাব মনে ঠাউরেছি। কি জানো, দিদি, আমাদের গুষ্টির ছেলেরা যে ধানের চাল খাবে সে হেথা-হোথা কত দূর দূর দেশে বোনা হয়েছে।"

"তা কেন, ঝগড়ু ? তোমার বাবা, ঠাকুরদা তো দেশে থাকত।"

"চিরকাল কি আর দেশে থাকত বোগিদাদা ? আমার বাবা সে একরকম ছিলেন। আর জন্তু-জানোয়াররা ছিল তাঁদের ঘরের লোক। একবার দুমকার ঘোর জঙ্গলে কাঠের খোঁজে গিয়েছিলেন, দেখেন কিনা গাছের গোড়ায় একটা এতটুকু বনবেড়ালের বাচ্চা মিউ-মিউ করে কাঁদছে। বাবাকে দেখে সে দারুণ খুশি, দু পা তুলে নেচে-টেচে একাকার। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার চোখের দিকে চাইলেন। মনে হল তার হলদে চোখের পিছনে আলো জ্বলছে। বুকে করে বাবা তাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

সে রাত্রে আমাদের গাঁয়ের কেউ ঘুমুতে পারল না, নেকড়ে বাঘ এসে সারারাত দাপিয়ে বেড়ালো। বাবা বনবেড়ালের বাচ্চাকে বুকে নিয়ে শুয়েছিলেন, শেষরাত্রে মনে হল বাঘ বুঝি উঠোনে এসে কেঁদে বেড়াচ্ছে। জানলার ঝাঁপি খুলে বাবা তখন বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলেন, অমনি নেকড়েও তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে একছুটে চলে গেল।"

"তা হলে বনবেড়ালের বাচ্চা নয়, ঝগড়ু, নেকড়েরই বাচ্চা।"

"কি জানি, রুমুদিদি, ওদের জাতই আলাদা। ওরা মানুষের বাচ্চাও পোষে তা জানো ? আমাদের গাঁয়ের একটা ছোট্ট ছ মাসের ছেলে হারিয়ে গেছল তার গলায় মোটা রুপোর কণ্ঠি ছিল। দশ বছর বাদেও নেকড়ের দলে একটা মানুষের ছেলেকে চার হাত-পায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, তার গলায় রুপোর কণ্ঠি।"

"ওর বাবা মা ওকে ধরে আনলে না কেন ?"

"সে কি আর চেষ্টা করে নি, দিদি, মানুষ দেখলেই সে কামড়াতে আসত, ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যেত। যে মানুষের রক্তে নেকড়ের দুধ মিশেছে সে কি আর অন্য মানুষের মতো হয় কখনো ?"

"ঝগড়ু, তোমার বাবা চিরকাল দেশে থাকেন নি বললে, কোথায় গেছিলেন ?"

"বর্মা জানো বোগিদাদা ? সমুদ্দুরের ওপারে বর্মা আছে, সেইখানে।"

"বল তোমার বাবার বর্মা যাওয়ার গল্প।"

"এখন তার সময় কোথায় দিদি? ঐ দ্যাখ নাথু এল কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে।"

বারো

নাথু হল ঝগড়ুর বন্ধু। ঝগড়ুর জন্য নাথু ট্যাঁকে করে গুড়ি নিয়ে আসে। ঝগড়ুর বউ নাথুকে দেখতে পারে না, তাই নাথুর কাজ সারা হলে ঝগড়ু ওর সঙ্গে মোমলতার তলায় বসে গল্প করে।

বোগি বলে, "কেন তোমার বউ নাথুকে দেখতে পারে না ঝগড়ু?"

নাথু মুচকি হেসে বলে, "আমার পা দুটো ডুবে থাকে এখানকার নদীর জলে কিন্তু মন কোথায় থাকে ঝগড়ুর বউ জানে না, তাই আমাকে দেখতে পারে না।"

"কেন, নাথু, কোথায় থাকে তোমার মন?"

"বাতাস দিলে তোমাদের বাঁশবনের শির্‌শির্‌ সর্‌সর্‌ শব্দ শুনেছ, দিদি? বাতাস থামলে কোথায় থাকে সেই শব্দ? অমন বোকার মতো কথা জিগ্‌গেস কোরো না।"

বোগি বললে, "ভারি বোকা রুমুটা, নাথু। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। আমি মজা করে বলেছিলাম, পুতুল ভেঙেছে কাঁদিস না, পুঁতে রাখ গাছ হবে। ও সত্যি পুঁতে রেখেছিল।"

রুমু বললে, "মোটেই আমি বোকা না। মোটেই আমি যে যা বলে বিশ্বাস করি না। খালি তুমি যা বল বিশ্বাস করি।" রুমুর কান্না পাচ্ছিল।

নাথু তাড়াতাড়ি বলল, "আর বিশ্বাস করবে নাই-বা কেন? কিসের গাছ হয় আর কিসের হয় না, তার তুমিই-বা কি জানো বোগিদাদা? যারই বুকের মধ্যে শেকড়ের কলি আছে তারই গাছ হয়। আমাদের গাঁয়ের কাছে এক সাধু থাকত, তার একটা কানাকড়িও ছিল না। সেবার বান ডাকার পর দুর্ভিক্ষ হল। সে সারা গাঁকে দশদিন খাওয়াল কি করে? খালি রাশি রাশি চক্‌চকে পয়সা এনে দেয়। তার পর সরকারি সাহায্য এল, সবার দুঃখ ঘুচল, তখন লোকে বললে, সাধু, তুমি পয়সা

জাল কর নাকি, অত নতুন পয়সা পেলে কোথায়? তাকে নাস্তানাবুদ করলে গাঁয়ের লোক, মনের দুঃখে সে আস্তানা ছেড়ে চলেই গেল! সে গেলে সবাই বললে—দাও, জালিয়াত সাধুর ঘর পুড়িয়ে. ভণ্ডামি করবার জায়গা পায় নি। ঘরে ঢুকে দেখে কয়েকটি মাটির বাসন আর একটা চট আর ঘরের মাঝখানে ছোট একটা শুকনো গাছ। তাকে উপড়ে ফেলতেই বেরুলো একটা পয়সা, তার চার দিকে গাছের শেকড় জড়িয়ে রয়েছে। ও কিসের গাছ?"

বোগি বললে, "তাই বলে তো আর পয়সার বুকে শেকড়ের কলি থাকে না যে গাছ গজিয়ে উঠবে। ওটা আপনিই কেমন করে শেকড়ে জড়িয়ে গেছিল।"

নাথু গাঁটরি তুলে মাথায় নিয়ে বলল, "পয়সার বুকে শেকড়ের কলি না থাকলেও, দয়ার বুকে তো আছে।"

"নাথু, যেয়ো না, তুমি একবার কি মাছ ধরেছিলে সেই কথা বল।"

নাথু আবার গাঁটরি নামিয়ে রেখে বলল, "ঝগড়ু বলেছে বুঝি? ঝগড়ু তুমি বড্ড বেশি কথা বল! মনের কথা যাকে-তাকে বিলিয়ে দিতে হয় না। হ্যাঁ, তবে বোগিদাদা রুমুদিদিকে বলা যায়, ওদের চোখেও ঘোর আছে কিনা।"

"বল, নাথু, বল। ঝগড়ুকে বোকো না। ঝগড়ু খুব ভালো। ঝগড়ুর ঠাকুরদার ঠাকুরদার পাঁচটা বন ছিল। গাছপালা জন্তু-জানোয়ার মৌচাক সব তাঁর ছিল। দারুণ সাহস ছিল তাঁর; আর এই বুকের ছাতি।"

"একবার কুড়ুল দিয়ে লম্বালম্বি ল্যাজের ডগা পর্যন্ত বাঘ চিরে ফেলেছিলেন।"

"একবার ডাকাতে ধরেছিল তাঁকে, গাঁ থেকে এক কোশ দূরে, এমনি জোরে গাল বাজিয়ে লোক ডেকেছিলেন যে ঝড় উঠেছিল, ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!"

শুনে নাথু খুব হাসল, "কে বলেছে এ-সব? ঝগড়ুই তো? ও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে তাও জানো না? তবে শোনো আমার মাছ-ধরার গল্প।

যারা জলে জলে কাজ করে জানো তো তাদের জলের নেশা লেগে যায়, জল্ ছেড়ে থাকতে পারে না। আমারও হল তাই। রোজ কাঁপুনি

দিয়ে জ্বর আসে, সে কি দারুণ শীত সে আর কি বলব, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে যায়, তার পর বিকেলবেলায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। কাজও করতে পারি না, অথচ ঘরে শুয়েও থাকতে পারি না।"

"কেন, নাথু, শুয়ে থাকতে পারো না কেন?"

"শুলে যে সময় চলে যায়, রুমুদিদি, একটু-একটু করে সময় ফুরিয়ে যায়। শোনোই-না গল্প। আমাদের গাঁ ছেড়ে খানিকটা উত্তরে একটা আমগাছ আছে জলের কিনারায়। সেইটে ঠেস দিয়ে বসে মাছ ধরি। পোকামাকড়ের টোপ্ দিই না, দিদি, পোকামাকড়ে সাধারণ মাছ ওঠে।"

"সাধারণ মাছ উঠলে কি হয়, নাথু?"

"কি জ্বালা! সাধারণ মাছ তো হাটেও কিনতে পাওয়া যায়, ও দিয়ে আমি কি করব?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বল।"

"একদিন আমি বঁড়শিতে একটা লাল টুকটুকে কুঁচফল গেঁথে ছিপ ফেললাম। ভারি জল তখন, আমাদের এখানে রোদ ঝক্‌ঝক্ করছে, কিন্তু নদীর গোড়ায় কোথায় বৃষ্টি পড়েছে, ভারি জোর স্রোত। ভাবছি এত স্রোতে মাছ পড়বে না, সারা গা রোদে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বুকের বরফ কিছুতেই গলছে না, এমনি সময় সুতোয় টান লাগল। টেনে তাকে তুলতে পারি না, হাঁপ ধরে গেল, শেষে অনেক কষ্টে তাকে ড্যাঙায় ওঠালাম। ওরকম মাছ তোমরা চোখে দ্যাখ নি, বোগিদাদা, রুমুদিদি। দেখবেও না কখনো।"

"থামলে কেন, নাথু? বল, বল।"

"আঃ! থামলাম সে কথা মনে করেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বলে। শোনো মন দিয়ে। মাছটা দুই হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রোদের আলোতে পষ্ট দেখলাম তার মাথাভরা কালচে সবুজ চুল ঘাড়ে গলায় লেপটে রয়েছে, ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে বড় কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলছে, মুক্তোর সারির মতো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, কানের কাছে চুলের সঙ্গে বঁড়শি আটকে আছে, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। ছোট দুটি কানে দুটি সোনার মাকড়ি পরা। দেখলাম পদ্মফুলের মতো হাত দুটি দিয়ে শক্ত করে ঘাস আঁকড়ে রয়েছে, নীল-নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, দীঘির মাঝখানকার মতো ঘন সবুজ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে,

বুকটা কত যন্ত্রণায় উঠছে পড়ছে। কোমরের তলা থেকে মাছের মতো দেখতে, ল্যাজটার কি রঙের বাহার, ময়ূরের পেখমের মতো মেলে রয়েছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে তার সব রঙ ফিকে হয়ে আসতে লাগল, নিঃশ্বাসের ওজন যেন একশো মণ, দু ফোঁটা চোখের জল আমার হাতে এসে পড়ল। অমনি আমার বুকের ভিতরকার বরফ গলে গেল, আমি তাড়াতাড়ি ট্যাঁক থেকে আমার ছুরিটা বের করে ছিপের সুতো কেটে দিলাম। ভয় হল এখুনি বুঝি এলিয়ে পড়বে, কোলে তুলে তাকে মাঝ-নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সারা গা আমার ভিজে গেল। তার পর আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ঘরে শুয়ে আছি, জ্বর-গায়ে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য বাড়ির লোকরা রাগারাগি করল। এখন যাই, বোগিদাদা রুমুদিদি। ঝগড়ুর গল্প সব সত্যি না-ও হতে পারে। ও জেগে জেগে স্বপ্ন দ্যাখে।" যেতে যেতে থেমে বলে, "এই আমার এক কানে সোনার মাকড়ি দেখছ, এটিকে পরদিন ঐ আমগাছের তলায় পেয়েছিলাম।"

নাথু গাঁটরি নিয়ে চলে গেল, আর ঝগড়ু হেসে বললে, "জ্বরও হল গিয়ে স্বপ্নেরই জাতভাই, দাদা। স্বপ্ন দেখতে না পারলে আর পারলে কি? উঠি। গা-টা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে, কাঠ ফেড়ে ঘাম ঝরিয়ে শরীরটাকে ঝর্‌ঝরে করে ফেলি। কাল সারারাত ঘুমোই নি, বোগিদাদা, চাঁদনী রাতে কুকুররাও ঘুমোয় না, আমারও চোখে ঘুম থাকে না, আমার শালার ছেলেটা কিন্তু খুব ঘুমিয়েছে।"

"চাঁদনী রাতে ভুলো তো ঘুমোত, ঝগড়ু।"

"ভুলো? সে তো সুখী কুকুর, সুখীদের ঘুমতে বাধা নেই।"

"সুখী তো পালিয়ে যায় কেন, ঝগড়ু?"

"সুখীরা পালায় না কে বলেছে দিদি? সুখীরা পালায় ঐ সুখের কাছ থেকেই; দুঃখ পায় না বলে দুঃখকে খুঁজে বেড়ায়। বলব একদিন আমার বাবার বর্মা যাওয়ার কথা!"

তেরো

চাঁদনী রাতে দুঃখী কুকুররা সত্যি ঘুমোয় না, সারারাত চাঁদের দিকে মুখ তুলে হু-হু করে কাঁদে। তাই শুনে রুমুরও কান্না পায়, বোগির খাটে উঠে এসে শোয়। ঝগড়ু এসে বলে—

"শুনবে নাকি আমার বাবার বর্মা যাওয়ার গল্প ?"

"হ্যাঁ, ঝগড়ু শুনব।"

"বুঝলে, আমার ঠাকুরদার তখন খুব ভালো অবস্থা। আমার বাবা আর কাকা রাজার হালে থাকে, কাজকর্ম বিশেষ করতে হয় না, সারাদিন হরিণ শিকার করে, বাঁশি বাজিয়ে, মাছ ধরে ঘরে ফিরে মাংস ভাত খেতে পায়। রাতে বিছানায় নরম তোশক পায়, কম্বল পায়। সোনার আংটিও হল দুজনার, যার যা সখ ছিল মিটে গেল। তখন তারা আর সইতে না পেরে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।"

"কেন, ঝগড়ু, ভালো ছিল তো, পালাল কেন ?"

"সখ মিটে যাওয়া ভালো নয়, দিদি, তখন পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।"

"ঝগড়ু !"

"কি, বোগিদাদা ?"

"তোমার কি মনে হয় ভুলোর সব সখ মিটে গেছিল ?"

"তা কি করে মিটবে, বোগিদাদা ? কয়েকটা সখ তো মেটে নি জানি। যেমন আমার পায়ের গুলি কেটে নেবার সখ। রেবতীবাবুদের বেড়াল খাবার সখ। তোমার দাদুর ইজিচেয়ারে বসবার সখ। না, দাদা, ভুলোর সখ মিটতে দেরি আছে।"

"আচ্ছা, তোমার বাবার কথাই বল। কোথায় গেল তারা ?"

"কাঠের আড়তে লোক নিচ্ছিল, বর্মায় কাঠ কাটতে যেতে হবে। বাবা আর কাকা সেইখেনে গিয়ে নাম লিখিয়ে, সেই রাত্রের গাড়িতেই এক দলের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। গাঁয়ের কেউ জানতে পারল না। ঠাকুমা কেঁদে কেঁদে সারা।

তার পর বর্মা গেল বাবা আর কাকা। জাহাজে করে সমুদ্দুর পার হয়ে। সমুদ্দুর জানো, দাদা?"

"বাঃ, সমুদ্দুর জানি না? পৃথিবীর তিন ভাগই তো সমুদ্দুর, আর শুধু এক ভাগ ড্যাঙা!" ঝগড়ু তাই শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। হ্যাঁ, জীবনের বেশিটাই কেটে গেল, একবারও সমুদ্দুর দেখলাম না, বললেই হল তিন ভাগ সমুদ্দুর! যদি জানতে, ঐ সমুদ্দুর পৌঁছতে আমার বাবা কাকাকে কত কষ্ট করতে হয়েছিল, তা হলে আর ও কথা বলতে না, দাদা।" রুমু বললে, "আচ্ছা, দাদা, তুমি থামো না। হ্যাঁ, ঝগড়ু, তার পর।"

"তার পর বর্মায় পৌঁছে দ্যাখে সে কি দেশ গো! ছেলেদের ভারি মজা, মেয়েরাই সব কাজ করে দেয়। বাবাদের দেখে দেখে হিংসে হয়—"

"এই-না বললে সুখে থেকে আর সইতে পারছিল না ওরা, তবে আবার হিংসে কেন?"

"নাঃ, তোমরা বড় বোকা, সুখী লোকরা হিংসুটে হবে না তো কারা হিংসুটে হবে? দুঃখীরা? দুঃখীরা তো সুখ কি তাই জানে না, তবে আর হিংসে করবে কেন? এখন গল্পটা শোনো তো।

"বাবাদের পাঠিয়ে দিল একেবারে ঘোর জঙ্গলে, সেগুনগাছের ঘন বনে। সেখানে একটা ছোট্ট ডেরা ছিল। দারুণ বেঘো জঙ্গল, ডেরার চার দিক ঘিরে পনেরো হাত উঁচু করে শক্ত কাঠের দেয়াল করা। তার গায়ে একটা মজবুত দরজা। বাঘ নাকি পনেরো হাত লাফাতে পারে না। ডেরাতে বিশেষ কিছু নেই, ওরা বারোটা লোক সারাদিন কাঠ কাটে, সূর্য ডোবার আগে ডেরায় ফিরে আসে। একটা বড় ঘর, তাতে বারোটা খাটিয়া আর বারোটা পিঁড়ে, পাশে রান্নাঘর, ছোট্ট কুয়ো। আর কিই-বা লাগে? সারারাত দরজা এঁটে ঘুমিয়ে থাকে সকলে, সকালে কাজে বেরোয়।

"একদিন কাকার দারুণ জ্বর এল। জ্বরের হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই, দাদা। সবাই কাজে চলে গেল। কাকা একলা কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপটি করে পড়ে আছে। পায়ের কাছে দরজা খোলা।

"এমনি সময় একটা শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখে কিনা একটা এই বড় বাঘ বেড়া টপ্‌কে ভিতরে এল। কাকা তো কাঠ!
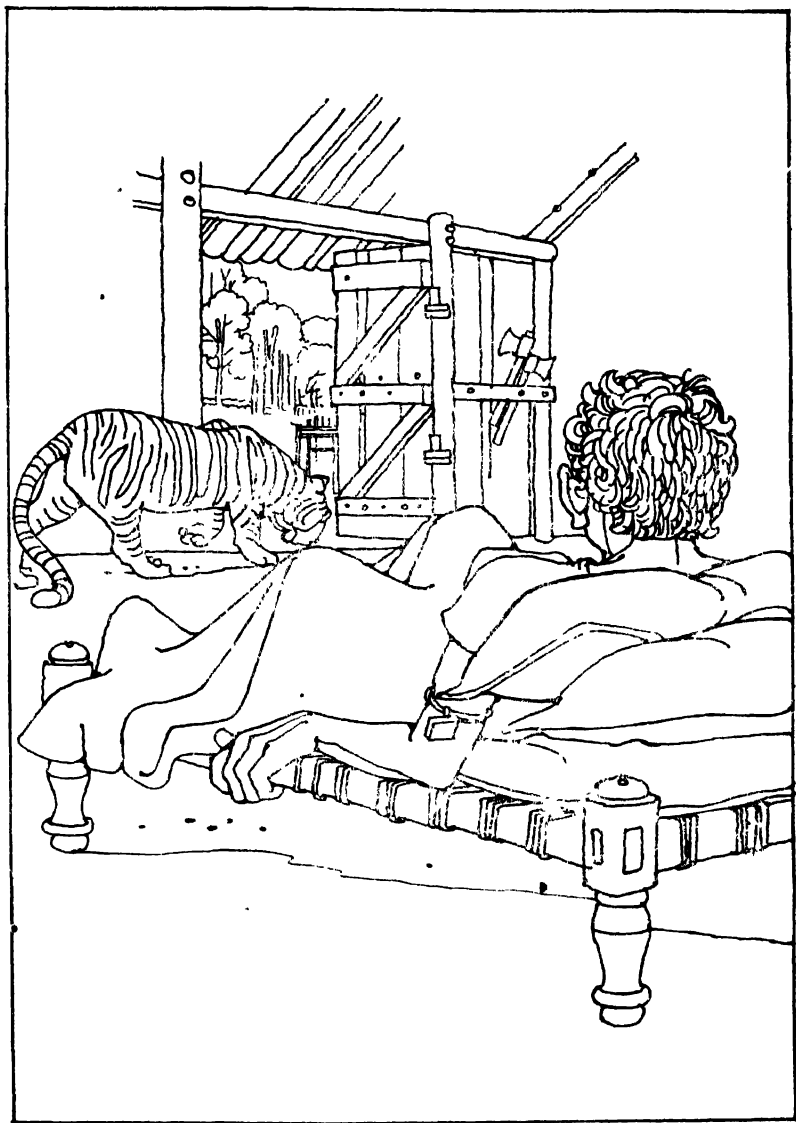
বাঘ শুঁকে শুঁকে পিঁড়েগুলোকে গুণে গেল

"বাঘটা ঘরে ঢুকে একটু ঘুর্‌ঘুর্‌ ছোঁক্‌ছোঁক্‌ করে বেড়ালো, চার ধারে মানুষের গন্ধ, বোধ হয় তাই কাকাকে অতটা লক্ষ্য করল না। কিন্তু কাকা পষ্ট দেখলেন বাঘ শুঁকে শুঁকে পিঁড়েগুলোকে গুণে গেল। তার পর আবার যেমন এসেছিল লাফ দিয়ে বেড়া টপ্‌কে চলে গেল।

"বিকেলে সবাই ফিরলে পর কাকা বাবাকে ডেকে সব কথা বলল। বলল, সবাইকে বল। বাবা বলল, যাঃ, বাঘ কখনো অত উঁচুতে লাফাতে পারে না। আর এলই যদি, তোকে কিছু বলল না? তুই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখে থাকবি। কি করে কাকা! সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, কাকা দেখল প্রথম রাত্রে বাঘটা এসে একটা লোককে তুলে নিয়ে গেল। খানিক বাদে এসে আরেকটাকেও নিয়ে গেল। তখন বাবা সবাইকে বলল, কিন্তু কেউ বেরুতে রাজি হল না, বলল, বাঘ কখনো মানুষ মুখে করে অতটা লাফাতে পারে? ওরা দুজনে আছে কোথাও এইখানে।

"শুধু বাবা কাকাকে বলল, চল্‌, কোথায় যাবি।

"একটু দূরে নদী, তার জলে কাঠ কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সেইখানে নৌকো বাঁধা থাকে। কাকা বললে, ঐখানে চল নৌকো করে গাঁয়ে চলে যাই।

"নদীর ধারে গিয়ে ওরা দা দিয়ে কাঠ ছুলে কয়েকটা বল্লম বানিয়ে নিল। তার পর যেই-না নৌকোয় চড়েছে, বাঘও এসে হাজির। ততক্ষণে ওরা মাঝনদীতে। বাবা নৌকোর উপর উঠে দাঁড়িয়ে বাঘের বুক লক্ষ্য করে একটা বল্লম ছুঁড়ল। দুমকার ছেলের হাত ফস্‌কায় না, বোগিদাদা, বল্লম গিয়ে বাঘের বুকে বিঁধল। বাঘও অমনি মানুষের মতো চীৎকার করে উঠ্‌ল। আর বাবা টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ল, কাকা তাকে টেনে নৌকোয় তুলে, দাঁড় বেয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে সেখান থেকে চলে গেল। নদীর বাঁকে ফিরে চেয়ে দেখেছিল, মনে হল, বুকে বল্লম বিঁধে পড়ে আছে ওটা হয়তো বাঘ নয়, বাঘের ছাল-পরা মানুষ।"

"তার মানে, ঝগড়ু?"

"কে জানে, সত্যি কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন কোথায় শুরু হয়। আর যায় নি ওরা ডেরায় ফিরে। গাঁ থেকে পালিয়ে চলে এল দেশে।"

বোগি বল্‌লে, "না, ঝগড়ু, তোমার বর্মার গল্প ভালো না।"

অমনি রুমুও কান্না ধরল, "মরে গেল কেন ? ও বিশ্রী গল্প। দাদা, ভুলো কেন আসছে না ?"

ঝগড়ু বললে, "আসবে দিদি, আসবে। সময় হলে সব এসে তোমার হাতের কাছে জড়ো হবে। আজ গুণমণিকে দেখেছ নাকি ? লক্‌লক্ করে ছাদ ছোঁয়-ছোঁয়। কুঁড়ি ধরেছে গুণমণির। আর তিনটে দিন সবুর কর-না। আচ্ছা, যাবে আজ সন্ধ্যাবেলায় ম্যাজিক দেখতে ? খেলার মাঠে এত বড় কানাৎ পড়েছে। চোখের সামনে যা হয় না তাই হচ্ছে। হাজার লোক অবাক হয়ে যাচ্ছে। চোখ মোছ দিকিনি। দিদিমাকে বলে চল যাই।"

চোদ্দো

বোগি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, "আসলে কিন্তু ম্যাজিক হয় না, সব চালাকি। দাদু বলেছে সব হাত-সাফাইয়ের বুজরুকি। লোকেরা সেধে পয়সা দিয়ে বোকা বনতে যায়।"

ঝগড়ু রুমুর জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে বললে, "ম্যাজিক যে একেবারেই হয় না, তা বোলো না, বোগিদাদা। এদের কথা আমি জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ব্যাপার ঘটে তাতে ম্যাজিক হয় না এ কথা বলা চলে না। ঐ তো নাথু এসেছে, ও-ই বলবে 'খন।"

"নাথু, যাবে তুমিও ম্যাজিক দেখতে ? আমাদের গল্প বলতে হবে কিন্তু।"

নাথু খুব ভালো কাপড়জামা পরে, গোঁফ আঁচড়ে, এসেন্স মেখে, সেজেগুজে এসেছিল। পায়ে চক্‌চকে পাম্‌সু, তার গোড়ালির কাছে তুলো গোঁজা। নাথু জুতোজোড়া বোগির খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে ওদের সঙ্গে চলল।

"ম্যাজিকের গল্প বল এবার নাথু।"

নাথু বললে, "সে আর এমন কি কথা। বছর বারো আগে একবার হাটের দিনে একটা লোক এসে নানরকম ম্যাজিক দেখিয়ে, এক-পয়সা দু-পয়সা নিচ্ছিল। লোকেরা সব মজা পেয়ে গেল, ওকে ঘিরে

তারাও ঝগড় করতে লাগল। লোকটাকে একটু বোকা মতন মনে হয়েছিল।

"ক্ষেত্রী বলে একজন দোকানদার ছিল, ভারি পাজি আর কেউ পয়সা রোজগার করছে দেখলে তার গা জ্বলে যেত। লোকটা তার কাছে আট-আনার কি সব জিনিস কিনে যেই তাকে একটা আধুলি দিয়েছে, অমনি সেও ঢং করে অন্য হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলেছে, 'ফুস্ মন্তর লাগ্ লাগ্ লাগ্—কই হে, আধুলি দাও নি তো, এ তো একটা পয়সা!'

"লোকটা একটু যেন অবাক হয়ে আবার একটা আধুলি দিয়েছে, অমনি আবার সেটা পয়সা হয়ে গেছে। হাটের লোকেদের হেসে হেসে পেটে ব্যথা ধরে গেল। লোকটা ভারি বোকা বনেছে তো।

"তখন কে একজন বললে, 'আরে, তুমিও কি কিছু কম যাও নাকি হে? দাও-না ওকে ধুলো-পড়া করে উড়িয়ে!'

"বলবামাত্র লোকটা একমুঠো ধুলো তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, আর হাটসুদ্ধু সকলের সামনে থেকে ক্ষেত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন এমনি একটা সোরগোল উঠল যে তার মধ্যে কোন ফাঁকে যে সে লোকটা সরে পড়ল, কেউ টেরও পেল না। ক্ষেত্রীর টিকিটি আর কেউ দ্যাখে নি। "ম্যাজিক যে একেবারেই হয় না, তা বোলো না বোগিদাদা।"

"তার পর ক্ষেত্রীর কি হল?"

"সে আর আমি কি জানি। যেমনি ব্যাটা পাজি ছিল, তার ঠিক সাজাই হল। ওকি রুমুদিদি, আবার কি হল?"

"যদি কেউ ভুলোকে ধুলো-পড়া করে দেয়?"

"আহা, ভুলো তো আর দুষ্টু নয়, ভুলো তোমাদের ভালো কুকুর।"

"ভুলো যে দাদুর দুধ খেয়ে ফেলেছিল? অনিমেষবাবুকে কামড়েছিল? দিদিমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছিল?"

বোগি বললে, "কেউ ভুলোকে ধুলো-পড়া করে নি রুমু, ন্যাকামি কোরো না। একটা রুমালও আনতে পারো না।"

ম্যাজিক দেখে বাড়ি ফেরবার সময় বোগি দ্যাখে রুমু. ফ্রকের কোঁচড়ে করে কি নিয়ে চলেছে।

"আঃ, রুমু, ফ্রক নামাও, আবার পেট দ্যাখা যাচ্ছে।"

রুমু মাথা নাড়ল। ঝগড়ু বললে, "কি আছে দিদি? দাও আমার হাতে, আমি নিয়ে যাই।—ওকি! তোমার তো ভারি সাহস

হয়েছে দেখছি, অত বড় মাকড়সাকে কোলে তুলেছ !"

বোগি ব্যস্ত হয়ে উঠল। "ছিঃ রুমু, মাকড়সারা বিষাক্ত হয়, কি বলে ধরলে? ভয়ও করল না? ফেলে দাও, ঝগড়ু।"

রুমু কেঁদে ফেলল, "না, ঝগড়ু, না, ওর পাঁচটা ঠ্যাং, ওকে ফেলো না।"

ঝগড়ু একটুক্ষণ কি ভেবে, পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে মাকড়সাটা তার মধ্যে পুরে নিল।

রুমু খুশি হয়ে বলল, "এত দিন পরে !"

নাথু বললে, "ব্যাপার যেন ঘোরাল বলে মনে হচ্ছে, দিদি।"

ঝগড়ু বললে, "ওকে বিরক্ত কোরো না, নাথু। বলবার হলে বলবে, কারো মনের কথা কেড়ে নিতে হয় না।"

রুমু জিজ্ঞাসা করল, "নিদুলী-মন্ত্রটা কি, ঝগড়ু?"

"ঘুমিয়ে পড়বার মন্ত্র, দিদি, বদলে যাবার মন্ত্র।"

"ঘুমোলেই কি বদলে যায়, ঝগড়ু?"

ওদের কথা শুনে বোগি খানিকটা এগিয়ে এল, "তুমি বেশ বদলে যাও, রুমু। শোবার সময়ে খিট্‌খিট্ কর, কথায় কথায় কাঁদ। আর সকালে ওঠ হাসিমুখে।—ঝগড়ু তুমি তো জানো নিদুলী-মন্ত্র?"

"বলেছি-না দুমকায় সবাই জানে নিদুলী-মন্ত্র, দাদা। দুমকার ঘুম তো আর এখানকার ঘুমের মতো ছিল না। দুমকায় লোকে ঘুমোত এক চোখ আর এক কান খুলে রেখে। সেও একরকম ঘুম, আবার ঘুমোয় না এমন লোকও তো আছে। তাদেরই জন্য নিদুলী-মন্ত্র হয়েছিল। ঘুম পাড়াবার মন্ত্র, বোগিদাদা। তোমার রাতে ঘুম হয় তো?"

রুমু বললে, "ও ঘুমোয়, আমার কিন্তু ঘুম হয় না। যখনি ঘুম ভেঙে যায়, তখনি দেখি জেগে আছি।"

"আরে, তা হলে তোমারই জন্য তো নিদুলী-মন্ত্র, দিদি।"

রুমুর আর পা চলতে চায় না, পা ব্যথা করে, এমন সময় ওরা বাড়ি এসে পৌঁছয়। রাত্রে শুলে পর ঝগড়ু এসে পা টিপে দেয়। রুমুর কি যে আরাম হয়; ঝগড়ুকে বলে—

"ঝগড়ু, তুমি কি ঐ কালো ছেলেটাকে ভালোবাস?"

"তা বাসি বৈকি, দিদি, বউয়ের ভাইয়ের ছেলে, ভালো না বেসে কি

আর আমার উপায় আছে?"

"আচ্ছা, ঝগড়ু, ওকে না দেখলে তোমার কষ্ট হবে?"

"কষ্টকে ভয় করলে তো আর ভালোবাসা যায় না, দিদি। ওর বাবা-মা এসে ওকে নিয়ে গেলে আর দেখতে পাব না। ভুলোকে দেখতে পাচ্ছ না বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে তো দিদি? তবে কি ভুলোকে ভালো না বাসলে ভালো হত?"

রুমু হঠাৎ এক গাল হেসে বলল, "ভুলো তো আবার আসবে। তুমি একটা সোনা-রুপোর মাদুলি খুঁজে পাও-না ঝগড়ু?"

"কি হবে দিদি?"

"বাঃ, তুমি-না বললে নিদুলী-মন্ত্র দিয়ে যে কুকুররা শেয়ালরা হলদে পাখি খেয়ে মানুষ হয়ে যায়, তাদের আবার জানোয়ার করে দেয়া যায়? কিন্তু সে ভারি শক্ত, পাঁচঠ্যাং মাকড়সা চাই, সোনা-রুপোর মাদুলি চাই। বল নি তুমি?"

বোগি অন্য খাট থেকে মাথা তুলে বললে, "বল নি তুমি? তবে কি ফের বাজে বকছিলে? গাঁজাখুরি কথা বলছিলে ঝগড়ু?"

"না, না, বোগিদাদা। বিশ্বাস কর, আমি যেমন করে পারি সোনা-রুপোর মাদুলি এনে দেব। কিন্তু কাকে জানোয়ার বানাতে হবে তা তো বললে না?"

পনেরো

রুমু বোগি উঠে বসল।

"বল, দাদা, তুমি বল।"

"ঝগড়ু, ভুলো যেদিন পালিয়ে গিয়ে রাত করে ফিরেছিল, সেদিন ও কোথা থেকে হলদে পাখি খেয়ে এসেছিল, ওর ঠোঁটের কোনায় হলদে পালক গুঁজে ছিল।"

"সে কি, বোগিদাদা?"

"হ্যাঁ, ঝগড়ু, হ্যাঁ। পরদিন সকালে দেখি ভুলো নেই, কিন্তু তোমার ঘরে একটা কালো ছেলে। তার চোখ পাটকিলে রঙের

আর কানের উপর দিকটা খোঁচা মতো। তুমি মুখ ঢাকছ কেন, ঝগড়ু ?"

"বেজায় আশ্চর্য লাগছে কিনা। কিন্তু ও যে আমার শালার ছেলে।"

রুমু ব্যস্ত হয়ে উঠল। "না, ঝগড়ু, ও-ই ভুলো। সোনা-রুপোর মাদুলিটা জোগাড় কর, অমনি দেখবে ও ভুলো। আচ্ছা ঝগড়ু, তোমার বউ কিছু বলবে না তো?"

"আরে বউকে কিছু বলে কাজ নেই। তবে নাথুর সাহায্য দরকার হবে। এক-আধ দিন অপেক্ষা করতে পারবে তোমরা? আমাদের গাঁয়ের লখনিয়া ময়ূর-মেয়ের জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিল, আর তোমরা এক-আধ দিন অপেক্ষা করতে পারবে তো?"

"পারব, ঝগড়ু, পারব! ময়ূর-মেয়ের কথা বল।"

"বুঝলে বোগিদাদা, লখনিয়া তোমাদের মতো ছিল, কষ্ট পাবার ভয়ে কাউকে ভালোবাসত না, কোনো মানুষকে না, কোনো জিনিসকে না। মানুষ চলে যায়, ভুলে যায়, মরে যায়, আর জিনিস ভেঙে যায় চুরি যায়, হারিয়ে যায়, মরচে ধরে, পোকায় খায়। কি হবে ভালোবেসে?

"মেলা টাকাপয়সা ছিল লখনিয়ার, দিব্যি খেত-দেত, ফুর্তি করত। একদিন চাঁদনী রাতে লখনিয়া পাশের গাঁ থেকে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে, দ্যাখে মহুয়া গাছতলায় ময়ূর নাচছে।"

"যাঃ, শুধু মেঘলা দিনে ময়ূর নাচে।"

"না বোগিদাদা, চাঁদের আলোতেও ময়ূর নাচে। লখনিয়া তাই দেখে থমকে দাঁড়াল, ময়ূরটা নেচে নেচে একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, কি জানি কেন লখনিয়ার তাকে ভালো লাগল। যেই ভালো লাগল, চোখের সামনে ময়ূরটা একটি সুন্দর মেয়ে হয়ে গেল। ময়ূরের পেখমের মতো ঝল্‌মলে তার রূপ। চেয়ে চেয়ে আর লখনিয়ার মন ভরে না, হাত বাড়িয়ে যেই-না তাকে ধরতে গেল, অমনি মেয়েটি বাতাসের মতো মিষ্টি সুরে বললে, 'অত সহজে পাওয়া যায় না, লখনিয়া, অপেক্ষা করতে হয়।' বলেই কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

"সবাই বললে, লখনিয়া বিয়েবাড়িতে নেশা করেছিল, কি দেখতে কি দেখেছে। কিন্তু লখনিয়া ময়ূর-মেয়ের জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিল।"

"থামলে কেন, ঝগড়ু, তার পর সে এসেছিল ?"

"তা আর আসবে না ? ততদিনে লখনিয়া বুড়ো হয়ে গেছিল, চোখে ভালো দেখতে পেত না, কিন্তু তবু ময়ূর-মেয়ের রূপটি ঠিক চিনতে পেরেছিল। মরার আগে চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠেছিল, মুখখানি হাসিতে ভরে গেছিল। এটাও বিশ্রী গল্প, দিদি ?"

রুমু বললে, "না, ঝগড়ু, খুব ভালো গল্প।" বোগি বললে, "তাই বলে সত্যি করে ময়ূর কখনো মানুষ হয় না।"

ঝগড়ু একটু হেসে উঠে গেল।

চার দিকের শব্দ যেন ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। টেবিলের উপর ঘড়ির টিক্‌টিক্ কখনো এত জোরে মনে হয় যে কান ঝালাপালা হয়ে যায় ; আবার তার পরই এত দূরে সরে যায় যে প্রায় শোনাই যায় না। চার দিক চুপ হয়ে যায়, এত চুপচাপ যে কানে তালা লেগে যায়। ঘুমে বোগির চোখ জড়িয়ে আসছে, মনে পড়ল সেজোমামা বলেছে কানের মধ্যে বোঁ বোঁ আওয়াজ হল নিজের রক্ত-চলাচলের শব্দ।

ঠিক তার পরেই যেন সকাল হয়ে গেল। দিদিমা দরজা খুলে, জানলার পরদা সরিয়ে বললেন, "কত ঘুমুবি তোরা ? ওঠ্ শিগ্‌গির, চেয়ে দ্যাখ্ তোদের আঁস্তাকুড়ের শিমগাছে কি সুন্দর ফুল ধরেছে!"

এক লাফে রুমু বোগি রান্নাঘরের সামনে। একটা দুটো ফুল নয়, ছড়া ছড়া ফুল, ফিকে নীল, গাঢ় নীল, বেগনী, গোলাপী, আশ্চর্য তাদের রঙ, প্রজাপতির মতো গড়ন, মিহি একটা সুগন্ধ।

ঝগড়ুও এল একটু বাদে, কুয়ো থেকে জল তোলা হলে। নাথুও এসেছিল কাপড়ের গাঁটরি মাথায় করে।

"আজ আমার বড় ভালো দিন, দিদি, গাধা কিনেছি, আর বোঝা বইতে হবে না। আর এখানে এসে দেখি গুণমণির ফুল ধরেছে। একটা বিড়ি খাইয়ে দাও, ঝগড়ু, আজ বড় ভালো দিন।"

নাথুকে নিয়ে ঝগড়ু কুয়োতলায় গেলে পর ঝগড়ুর বউ এল কালো ছেলেটাকে কোলে করে গুণমণিকে দেখতে ; ছেলেটার গায়ে লাল ফতুয়া।

"কি রূপ গো, দিদি, বাড়িখানি আলো হয়ে গেছে!"

ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে, বউ ছেলেটার গায়ের ফতুয়া ছাড়িয়ে দিল। তার গলায় একটা সোনা-রুপোর মাদুলি বাঁধা।

"কি দেখছ, দিদি, দাদা কাল রাতে পাঠিয়েছে দুমকা থেকে, জ্বর

বন্ধু হবার জন্য।"

"তুমি যে বলেছিলে সোনা-রুপো কেনবার পয়সা নেই?"

"কি জানি, দিদি, পাঠিয়েছে তো দেখছি।" সেদিন বিকেলবেলায় ভুলো ফিরে এল। নোংরা, ধুলোমাখা গলায় একটা নারকোলের দড়ি বাঁধা, হাঁপাতে হাঁপাতে জিব ঝোলাতে ঝোলাতে এল। রুমু বোগিকে দূর থেকে দেখেই ভুলো দৌড়তে লাগল। কাছে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নোংরা পা দিয়ে ওদের কাপড়চোপড় ময়লা করে দিয়ে, ওদের মুখ চোখ চেটে একাকার করল।

দিদিমা এসে বললেন, "স্নান না করিয়ে ছুঁস নে ছুঁস নে বলছি!"

দাদু বললেন, "দেখেছ বেটার কাণ্ড! কেউ বেঁধে রেখেছিল নিশ্চয়।"

এমন সময় ঝগড়ু এসে দাঁড়াল।

ভুলোকে ফেলে রুমু ঝগড়ুর গলা জড়িয়ে ধরল। আর ভুলোও সেই সুযোগে দিল ঝগড়ুর পায়ের গুলিতে দাঁত বসিয়ে। পেজোমি একটুও কমে নি।

অনেক পরে, রাতে, ভুলোকে ঘরে নিয়ে শুয়ে বোগি বলল—

"রুমু!"

"কি দাদা?"

"ঝগড়ুর ঘরে কালো ছেলেটা নেই। বউ বলল, ওর বাবা মা ওকে নিয়ে দুমকায় চলে গেছে।"

"সত্যি, দাদা, সত্যি?"

"নেই তো দেখলাম।"

"ও-ই তবে ভুলো, না দাদা? সত্যিই তবে ও-ই ভুলো।"

"কি জানি, রুমু, ঝগড়ু বলে সত্যি যে কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয় বলা মুশকিল।"

বহুরূপী

সূচীপত্র

বহুরূপী	৩২৫
মহালয়ার উপহার	৩৩০
ভানুমতীর খেল	৩৩৪
পঞ্চমুখী শাঁখ	৩৩৯
হুঁশিয়ার	৩৪৫
সেকালে	৩৪৯
চোর	৩৫৫
টাইগার	৩৫৮
লোমহর্ষণ	৩৬৫
ভালোবাসা	৩৬৭
তেজী বুড়ো	৩৭৩
দিনের শেষে	৩৭৬
আমাদের দেশে	৩৮৩
পালোয়ান	৩৮৬
গুণ-করা	৩৯১
কি বুদ্ধি	৩৯৮
বনের ধারে	৪০১
মেজোমামার প্রতিশোধ	৪০৭

বহুরূপী

ছোটবেলাকার কত কথাই যে মনে পড়ে, কত কাণ্ডই যে তখন হত। একবার গুপের মামাতো ভাই ভোঁদা বলেছিল যে বহুরূপীরা পর পর সাতদিন আসে, একেক দিন এক এক নতুন সাজে। কখনো কখনো সবাই তাকে বহুরূপী বলে চিনে ফেলে, আবার কখনো কখনো সে এমনি চেহারা বানিয়ে আসে যে কেউ তাকে বহুরূপী বলে টেরই পায় না। তার পর একদিন নিজের সত্যিকার চেহারা নিয়ে এসে, যে যা কিছু টাকা-পয়সা দেয় চেয়ে নিয়ে যায়।

সেবার মধুপুরেও ঠিক তাই হল; সকালে মামিমা তরকারি কুটছেন, একজন গয়লার মেয়ে এসে কি চমৎকার খোয়া-ক্ষীর বিক্রি করে গেল। পরদিন বিকেলে একজন ঝোলা-ঝোলা পোশাক-পরা ফিরিঙ্গী পাদরি এসে মামার কাছে পোস্টাপিসের রাস্তা জিজ্ঞাসা করে, আধ ঘণ্টা বসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় ইংরাজিতে গির্জার ঘণ্টা-মেরামতের গল্প করে গেল। তার পরদিন আবার দেখি যে দশ-মুণ্ডুওয়ালা রাবণ-রাজা সেজে এসেছে। গুপেরা হৈ-চৈ করে উঠল। মামিমার ছোট মেয়ে বুঁচ্‌কি ভয় পেয়ে খুব খানিকটা কাঁদল। তার পরদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অন্ধকার বারান্দায় খট্‌ খট্‌ শব্দ শুনে ভোঁদা বাইরে গিয়ে দ্যাখে কি সর্বনাশ, থামে ঠেস দিয়ে বিকট একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, বাতাসে তার হাত দুটো একটু একটু দুলছে, আর হাড়গোড় থেকে খটাখট্‌ শব্দ হচ্ছে। ভোঁদা দারুণ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু গুপে এসেই বলল—"এই বহুরূপী! তুমি তো ভারি চালাক

হয়েছ!" অমনি কঙ্কালটা এমন করে অন্ধকার ঝোপের পাশে গা ঢাকা দিল যে সত্যি মনে হল বুঝি মিলিয়ে গেল? ততক্ষণে মামাও বেরিয়ে এসেছেন, ধমক দিয়ে বললেন—"এই বহুরূপী, সাজতে হয় মজার মজার সাজ কর। এইরকম ভয়াবহ চেহারা করে এলে ছেলে-পিলেরা ভীতু হয়ে যাবে যে।" অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা খিল্-খিল্ হাসি শোনা গেল! তার পর সব চুপচাপ। বড়দের অনেকেরই নাকি গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল!

পরদিন বহুরূপী মাতাল সেজে এসে আধঘণ্টা সবাইকে খুব হাসাল। বললে হয়তো সবাই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সারাক্ষণ সে ঠ্যাং দুটো উঁচু করে হাতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। বলল নাকি মাথা ঘুরছে বলে কিছু ঠাওর করতে পারছে না। আর সে যে কি-সব আবোল-তাবোল বকছিল সবাই হেসে লুটোপাটি। যাবার আগে আবার এক গেলাস জল চেয়ে, সেটা পায়ের আঙুল দিয়ে ধরে, জলটা গলায় ঢেলে নিল। সবাই তো হাঁ!

তার পরদিন সারাদিনই সবাই আশা করে আছে কখন বহুরূপী আসবে, এমন সময় একজন সাপের ওঝা এসে জোরজার করে সাপ খেলা দেখাবেই দেখাবে। সবাই তাকে বহুরূপী মনে করে খুব রসিকতা করছে। এমন সময় একজন পুলিশ-সাহেব এসে মহা সোরগোল লাগিয়ে দিল; ও নাকি সত্যি ওঝা নয়, ডাকসাইটে চোর, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেয় কোথা দিয়ে কিভাবে গিয়ে জিনিসপত্র সরানো যেতে পারে। ওঝাটাও তাকে দেখেই জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে দে দৌড়। তাড়াতাড়িতে একটা সত্যিকারের সাপও ফেলে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বটু মালী বলল ওটা হেলে সাপ, কাউকে কিছু বলে না, তবে কেউ কেউ বলে যে ওদের শনি-মঙ্গল বারে বিষ হয়, কাজেই সাবধানের মার নেই। ততক্ষণে সাপটা যে কোথায় পালিয়েছে তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। কিন্তু ঐ লোক দুটোর মধ্যে কেউ বহুরূপী কি না তা বোঝাই গেল না।

পরদিন বিকেলে একজন বাউল এসে অনেকক্ষণ গান গেয়ে নেচে-কুঁদে একাকার! বহুরূপীটার কত যে বিদ্যে জানা ছিল!

সন্ধেবেলা পাশের বাড়ি থেকে হরিপদবাবুরা বেড়াতে এসে খুব রাগ করতে লাগলেন যে এই-সব বহুরূপী সেজে যারা বেড়ায় তারাই

দাগী চোর হয়, বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়, আর মামা কিনা তাদের আশকারা দেন। একদিন যখন চেঁচেপুঁছে সব নিয়ে যাবে তখন পস্তাতে হবে, ঠিক হবে। যত সব ফেরিওয়ালা, বাউল, বহুরূপী, নাচিয়ে-গাইয়ে বাড়িতে পুরে এখন মহাদেবের মতো বুঁদ হয়ে থাকুন গে, সংসারের ভারি কল্যাণ হবে। এদিকে পাড়ায় তো হামেশাই এটা হারাচ্ছে ওটা হারাচ্ছে। তাতে আর কার কিবা এসে যাচ্ছে! মামার নিশ্চয় মনে মনে খুব রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বললেন না।

তবে হরিপদবাবু চলে গেলে ডাক দিয়ে মামিমাকে বললেন, "দ্যাখ, ওর সাতদিন হয়ে গেছে, কাল দুটো টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়ো। যদিও অনেকদিন থেকেই ওকে জানি, তবু পাড়া-প্রতিবেশীকে চটাতে নেই।" ভোঁদা বলল, "বা ব্বা! বিদেয় করে দিয়ো মানে। কাল ও তো একটা সাজ দেখাবে, একদিন যে আসে নি।" মামা অবাক হয়ে বললেন, "সে আবার কবে?" "কেন, যেদিন সেই সাপের ওঝা আর পুলিশ-সাহেব এসেছিল। ঐ ওঝাকে এখানে অনেকে চেনে, ও বহুরূপী নয় কখনো। আর পুলিশ-সাহেবের ওরকম সাজ-পোশাক করা একে তো বহুরূপীর কম্ম নয়, অনেক খরচা লাগে। তার উপর পটলাদের কে হন উনি, নতুন এসেছেন।"

সবাই ভাবল তা হবেও-বা। মামা আবার বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, কালকের সাজটা নাহয় দেখেই নিয়ো, কিন্তু ও যাবার সময় দুটো টাকা ওর হাতে দেবে আর বলবে যেন আর এদিকে না আসে।"

পরদিন সবাই তাগ্ করে আছে কখন বহুরূপী আসবে এমন সময় একটা নেংটে-পরা লোক বগলে একটা নোংরা পুঁটলি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মামিমার পা জড়িয়ে ধরে হাঁউ-মাঁউ করে কাঁদতে লাগল: "মা, মিছিমিছি পাড়ার লোকে আমার পাছু নিয়েছে, আমাকে রক্ষা করুন, দৌড়ে দৌড়ে আর তো পারি নে, এক পেয়ালা চা না পেলে, দু-দণ্ড না জিরুলে, আমার বুকটা ফেটে যাবে।"

এমন চমৎকার বলল যে মনে হল সত্যিই যেন অনেক কষ্টে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, চা না পেলে আর বিশ্রাম না করলে এক্ষুনি মরে যাবে।

সবাই মিলে তার পিঠ চাপড়ে চায়ের জন্য বাড়ির পিছনে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। মামিমা তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, খুব

একটা নেংটে-পরা লোক মামিমার পা জড়িয়ে ধরে হাঁউ-মাঁউ করে কাঁদতে লাগল :
"মা, আমাকে রক্ষা করুন।"

ভালো সেজেছ, আজকের সাজটা সব চেয়ে ভালো হয়েছে। আর দ্যাখ বাছা, উনি এখন বাড়ি নেই, তোমায় বলতে বলেছেন যে আমরা খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু তুমি আর এ বাড়িতে এসো না, পাড়ার লোকে আমাদের মন্দ বলে। তুমি চা খেয়ে গোয়ালঘরে বিশ্রাম করে, বাড়ি যেয়ো কেমন? বহুরূপী এমনি চালাক যে তবু কিছু ভাঙল না, সুড়্‌সুড়্‌ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে হন্তদন্ত হয়ে মামা এসে হাজির। "ওগো, সর্বনাশ হয়েছে, একেবারে দিনে ডাকাতি। কাল এত বক্তৃতা করে গেলেন আর আজই হরিপদবাবুরা ওপরে ঘুমুচ্ছেন আর নীচে থেকে তাঁদের সর্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে, টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, ফাউন্টেন পেন, হাতঘড়ি, মায় চশমাটি অবধি। হরিপদবাবুরা তাকে দেখতে পেয়েছেন পর্যন্ত, হাতে-নাতে ধরাও পড়ত, সবাই মিলে তাড়া করেছিল, কিন্তু এই দিকেই কোথায় যে গিয়ে গা ঢাকা দিল, সবাই মিলে এতক্ষণ গোরুখোঁজা করলাম, তবু টিকিটিও আর দ্যাখা গেল না! এদিকে আসে নি তো?"

মামিমা মাথা নাড়তে যাচ্ছেন এমন সময় রোগা তেল-চুকচুকে একজন লোক এসে নমস্কার করে হাতজোড় করে দাঁড়াল, মামা বললেন—"আরে বহুরূপী যে! চুরির কথা শুনেছ তো? এবার তোমাদের সন্দেহ করবে সব। হরিপদবাবু কালকেই সে কথা বলে বেড়াচ্ছিলেন। দাও তো ওর টাকা দুটো! তুমি বাপু এদিকে আর এসো-টেসো না।"

বহুরূপী একগাল হেসে বলল—"এজ্ঞে না বাবু, আমি এক্ষুনি আটটার গাড়ি ধরে একেবারে রামকিষ্টপুরের ওদিকে মামাবাড়ি চলে যাচ্ছি। ঐ হরিপদবাবুটির যেমনি সন্দেহ বাতিক তেমনি অসাবধান।"

মামিমা কি আর করেন, দিলেন দুটো টাকা; মামা রেগে যাবেন, বলাও যায় না সব কথা। যাবার সময় বহুরূপী মামার মামিমার পায়ের ধুলো নিয়ে, গুপে আর ভোঁদার দিকে ফিরে একবার চোখটা টিপল!

পরে আমরা শুনলাম নেংটি-পরা লোকটা, চা খেয়ে জিরিয়ে-জুরিয়ে, ঠাকুরের কাছ থেকে পান খাবার জন্য চার-আনা চেয়ে কখন গুটিগুটি কেটে পড়েছে। মামিমা বললেন চেপে যেতে। আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।

মহালয়ার উপহার

শিবু, শিবুর মা আর শিবুর বউ তিন নম্বর হোগলাপট্টি লেনের দোতলার তিনখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত।

একটা ঘরে শিবুর মা শুত, সেটা সব থেকে বড় ও ভালো, কারণ বুড়ি ভারি খিট্‌খিটে। আরেকটাতে শিবু আর শিবুর বউ. শুত, সেটা মাঝারি সাইজের। আর সব থেকে ছোটটাতে শিবু, শিবুর মা আর শিবুর বউ তিনটে কাঁঠালকাঠের পিঁড়িতে বসে কানা-তোলা বড়-বড় কাঁসার থালায় ভাত খেত, বড়-বড় কাঁসার বাটিতে ঝোল খেত, আর বড়-বড় কাঁসার গেলাসে জল খেত ; কিন্তু নুন আর লঙ্কা রাখত থালার পাশে সান-বাঁধানো মেঝের উপর।

আগে খেত শিবু আর শিবুর মা, দরজার দিকে পিঠ করে পাশাপাশি বসে। তারা উঠে গেলে খেত শিবুর বউ দরজার দিকে মুখ করে। কিন্তু শিবুর বউ সব থেকে বড় মাছটা নিজের জন্য তুলে রাখত। শিবু জানত না বলে রাগ করত না।

শিবু রোজ রাত্রে খেয়ে-দেয়ে, মুখে একটা পান পুরে, একটা শাবল, একটা শেড-লাগানো লণ্ঠন আর এক থলে হাতিয়ার হাতে নিয়ে চুরি করতে বেরুত। কারণ শিবু ছিল অসাধারণ সাহসী। পুলিশ-টুলিশ দেখে কেয়ার করত না। তা ছাড়া শিবু অসম্ভবরকম দৌড়তে পারত, আর টিকটিকির মতন জলের পাইপ বেয়ে নিমেষের মধ্যে তিনতলায় উঠে যেতে পারত!

যাই হোক, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শিবু নিজের ঘরে যেত রেডি হবার জন্য, আর শিবুর বউ অমনি রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ করে খেতে বসত।

শিবুর মা নিজের ঘর থেকে ডেকে বলত, "হ্যাঁরে শিবে! জামা ছেড়ে উঁচু করে ধুতি মালকোচা মেরে পরেছিস তো?"

শিবু বলত, "সে আর তোমায় বলে দিতে হবে না!"

শিবুর মা বলত, "গায়ে আচ্ছা করে তেল মেখে নিতে ভুলিস না।"

শিবু বলত, "আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ!"

শিবুর মা তবু বলত, "শাবল, লণ্ঠন, থলে সব নিয়েছিস?"

শিবু বলত, "কী মুশকিল!"

তখন রান্নাঘর থেকে শিবুর বউ ভাত-খাওয়া গলায় বলত, "দেখে-শুনে আনবে, ছেঁড়া-ফাটা না হয় যেন।"

শিবু বলত, "জ্বালালে দেখছি!"

আর শিবুর মা আর শিবুর বউ একসঙ্গে বলত, "দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! হরিনারায়ণ!"

শিবুও অমনি চট্‌ করে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত।

শিবুর মা তখন নিজের ঘরে আবার ফিরে খাটের নীচে ট্রাঙ্কের পিছনে, আনাচে-কানাচে দেখত সব জিনিস ঠিক আছে কি না। তার ঘরভরা কত জিনিস: রুপো-বাঁধানো গড়গড়া, দাঁড়ানো ঘড়ি, গ্রামোফোনের চোঙ, মেমদের হ্যাণ্ডব্যাগ, পাউডারের কৌটো—এই-সব। এদিকে চোর-ছ্যাঁচড়ের যা উপদ্রব!

বুড়ির ছিল সজাগ ঘুম। শিবু বাড়ি ফিরতেই যেই সিঁড়ির আলগা রেলিঙটা ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ করত, তার ঘুম যেত ছুটে, আর যা-কিছু ভালো জিনিস বুড়ি আগেই গাপ্‌ করত।

বউয়ের এদিকে অ্যায়সা ঘুম যে সকালে চা তেণ্টা না পেলে ঠেলা না দিলে ওঠে না। সেও উঠেই কতক জিনিস বাক্সে তোলে—মালা, আংটি, রুমাল, সিগারেট কেস। আর বাদবাকি যা থাকে শিবু তাই বিক্রি করে সংসার চালায়।

তবে দিনে-দিনে শিবুও চালাক হয়ে গেছে। সেও অর্ধেক জিনিস আগেই গছিয়ে আসে।

এমনি করে পুজোর সময় এসে গেল।

মহালয়ার দিন। শিবু রাতে খেতে বসে ভাবছে যে একটা মোটারকমের দাঁও মারতে না পারলে তো আর এই মা-টিকে আর গিন্নিটিকে ঠেকানো যাবে না!

এমন সময় একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রান্নাঘরের দরজায় ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়াল। শিবুর বউ অমনি জিব কেটে ঘোমটা দিল।

লোকটার একটা চোখ আছে, আরেকটার উপর সবুজ একটা তাপ্পি

মারা। নাকটা কার ঘুষি খেয়ে থ্যাবড়া-পানা হয়ে গেছে, থুতনিটা বুলডগের মতন, মাথার চুলে কদমছাঁট, গায়ে একটা কালো হাফপ্যান্ট আর সাদা হাতওয়ালা গেঞ্জি। শিবুর তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে জল খেয়ে, গেলাসটা থালার ঠিক মধ্যিখানে রেখে, লোকটিকে বলল, "গুপি! কী মনে করে?" গুপি কোনো কথা না বলে ডান হাতের বকবার আঙুল বেঁকিয়ে শিবুকে ডাকল। শিবু উঠে বাইরে গেল। এতক্ষণ শিবুর মা ও শিবুর বউ একহাত করে ঘোমটা দিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিল। এবার তারা আবার এদিকে ফিরল। শিবুর মা মস্ত একগ্রাস ভাত মুখে পুরল আর শিবুর বউ নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে গুপি শিবুর কানের কাছে মুখ দিয়ে জোরে-জোরে ফিস্-ফিস্ করে বলল, "শিবে, তুই রাজা হবি! আজ তোর কপাল খুলে যাবে রে শা—! চিংড়িহাটার জমিদারের বাড়ি চিনিস তো? সেই যেখানে আমার মামাতো ভাই চাকরি করে, সেই যে দোতলার লোহার সিন্দুকে ইয়া ইয়া পায়রার ডিমের মতন মণিমুক্তো আছে! আজ কেউ বাড়ি থাকবে না। গিন্নি রেগে-মেগে ছেলেপুলে, সেপাই, ডালকুত্তা আর বাপের বাড়ির গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। জমিদারবাবুও রেগে-মেগে মাছ ধরতে চলে গেছেন। কাল সব ফিরে আসবে যে যার রাগ পড়লে। আজ রাতে বুঝলি কি না—"

শিবু বলল, "গয়না-না নিয়েই চলে গেছে?"

গুপি বলল, "সে তো শুধু বাপের বাড়ির গয়না। আসলগুলো এখানে!"

শিবু—"তোর তাতে কী?"

গুপি—"তুই কাজ বাগাবি, তিন ভাগ তোর। আমি খবর এনেছি, এক ভাগ আমার। রাজি?"

শিবু বলল, "রাজি!" গুপি চলে গেল।

মায়ের আর বউয়ের উৎসাহ দ্যাখে কে! "ওরে শিবে, দেরি করিস নি! পায়রার ডিমের মতন দুটো-একটা আমরা নেব!"

শেষপর্যন্ত তোড়জোড় করে শিবু বেরুল।

গভীর রাত্রে চিংড়িহাটার চেহারা বদলে গেছে। বাড়িগুলো আরো কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে, মাঝের গলিগুলো আরো সরু, আরো লম্বা হয়ে গেছে। থেকে-থেকে বিরাট বিরাট ষাঁড় দিব্যি নিশ্চিন্তে পথ জুড়ে শুয়ে

আছে। অন্ধকারে তাদের ফোঁস্‌-ফোস্‌ নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানুষের সাড়া নেই, খালি পথের ধারে ডাস্টবিনের পাশে মড়াখেকো খেঁকিকুকুর পিছনের ঠ্যাঙের ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে আকাশের দিকে মুখ করে বিশ্রী করে ডাকছে। আকাশে একটু-একটু মেঘ, আর চারি দিকে অন্ধকার।

এমন সময় শিবু এসে সেখানে পৌঁছল।

মস্ত বাড়িটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। কিন্তু শিবুর নাড়ি-নক্ষত্র সব জানা ছিল। পিছন দিক দিয়ে গিয়ে উঠোনের পাঁচিল টপকে শিবু একগাদা ঘুঁটের উপর পড়ল। সামনে একটা কাচের জানলা, তাতে শিক দেওয়া নেই; অন্যদিন এখানে ডালকুত্তা বাঁধা থাকে।

শিবু তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করল। বাঁ হাতে একটা আঠা-লাগানো কাগজের একটা দিক জানলার কাচে সেঁটে দিল, তার পর ডান হাতে একটা ন্যাকড়া-জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে এক-ঘা দিতেই কাচটা ভেঙে গেল। কোনো আওয়াজ হল না। ভাঙা কাচটা কাগজে আটকে ঝুলে রইল। শিবু তখন সেই ফুটো দিয়ে হাত গলিয়ে ছিটকিনি তুলে জানলা খুলে ফেলল আর এক নিমেষে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

একেবারে নিঝুম ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, শিবু খুব সাবধানে এগুতে লাগল। আলোর ঢাকনিটা একটু তুলে দেখল চওড়া শ্বেতপাথরের ছক-কাটা বারান্দা, তার এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। তার আবার ধাপে-ধাপে খোঁচা-খোঁচা কি সব গাছপালা পেতলের হাঁড়িতে বসানো।

জনমানুষের সাড়া নেই।

শিবু উপরে ওঠবার জন্য সবে এক পা তুলেছে, এমন সময় নাকে এল কিসের একটা কেমন চেনা-চেনা সোঁদা-সোঁদা আঁশটে গন্ধ।

শিবু ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখচোখের চেহারা অবধি বদলে গেল। শিকার দেখলে বেড়ালের যেমন হয়।

নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে একেবারে ভাঁড়ারঘরের সামনে হাজির। দরজায় মস্ত তালা মারা, কিন্তু শিকলির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা চোখ-ভোলানো একটা আটসেরি কাতলা মাছ ঝুলে রয়েছে।

শিবুর মন থেকে আর সব-কিছু মুছে গেল। এ যে সাত রাজার

ধনের বাড়া কাতলা মাছ! শিবু কাতলা মাছের দড়ি কেটে নামিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে সোজা সদর দরজা খুলে, আবার সেটা সযত্নে ভেজিয়ে রেখে, একেবারে সটান তিন নম্বর হোগলাপট্টি।

সিঁড়ির ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ শুনে শিবুর মা দৌড়ে এসে বলল, "কই পায়রার ডিমের মতন?" তার পর মাছ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে, "অ শিবে! এমনটি যে পনেরো বছর দেখি নি! সের-দশেক হবে, না রে?"

বউও জেগে ছিল, ধুপ্‌ধাপ্‌ করে দৌড়ে এসে বলল, "পায়রার ডিমের মতন সত্যি?" তার পর মাছ দেখে গালে হাত দিয়ে বলল, "আরে বাবা রে! এমনটি যে জন্মে দেখি নি! বড় বঁটিটা বের করতে হবে দেখছি!"

শিবু মাছটা তার হাতে দিয়ে বলল, "তিন ভাগ আমার, একভাগ গুপির। ও খবর এনেছে!"

ভানুমতীর খেল

গোরুদের ঘরের পিছনের ছোট ফটকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। গোয়ালের কোনায় একটা মাটির ঢিবির উপর ঝোপের আড়ালে বসে-বসে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে আর একটু-একটু পা দোলাচ্ছে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, কাপড়-চোপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, খালি পা, এখানে-ওখানে কেটে গেছে।

আমাকে দেখেই বলল, "আঃ, তোকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলুম রে! এখন বড় একঘটি জল দিয়ে প্রাণটাকে বাঁচা দিকিনি বাপ্‌!"

কেউ কোথাও নেই, গুটিগুটি গোরুর ঘরে গিয়ে শ্যামলী-কপলীদের দুধ দোয়াবার বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল নিলাম, ওদের মস্ত পিতলের ঘটির নীচে অনেকখানি দুধ পড়েছিল, তাও নিলাম।

লোকটা জল দিয়ে হাত-পা মাথা সব ধুয়ে ফেলল, পকেট থেকে একটা জঘন্য নোংরা রুমাল বের করে ঘাড়টা মুছে নিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে সব দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল।

খপ্ করে শূন্য থেকে এক এই মস্ত এক তলোয়ার ধরে নিয়ে, পাঁই-পাঁই করে ঘুরিয়ে আবার সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল !

তার পর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলা নেই কওয়া নেই আমার পায়ের উপর সটাং এক প্রণাম ঠুকে বসল। আমি তো মহা অপ্রস্তুত।

তার পর আমার মুখের দিকে পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে বলল, "তা শাহেন-শার নাকে-চোখে জলের দাগ কেন? কাঁদা-টাঁদা হয়েছে নাকি? আজ্ঞা করেন তো এখুনি সব ব্যাটার মুণ্ডু কেটে নিয়ে আসি।" বলেই খপ্‌ করে শূন্য থেকে এই মস্ত এক তলোয়ার ধরে নিয়ে, মাথার চার দিকে সেটাকে পাঁই-পাঁই করে বার-দশেক ঘুরিয়ে, আবার সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল আর সেটাও তখুনি কোথায় মিলিয়ে গেল।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "কি সার্‌, অবাক হলেন নাকি? চোখ যে গোল-গোল হয়ে গেল, ঠোঁট যে ঝুলে পড়ল। তা, কাঁদাকাটির কি হল তা তো বান্দাকে বললেন না?"

আমি নাকটা একটু মুছে নিয়ে বললাম, "বাড়িসুদ্ধ সব্বাই স্কুলের মাঠে ম্যাজিক দেখতে গেছে। আমার কাল জ্বর হয়েছিল বলে মেজো-মামা আমাকে নিয়ে গেলেন না।"

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "ও কি জাঁহাপনা! আবার চোখে জল কেন? আরে, আপনিও যেমন! কি ম্যাজিক দেখাবে সরু ঠ্যাঙ-ওয়ালা ঐ গুঁপো হতভাগা! ও-ব্যাটা জানেই-বা কি, আর পারেই-বা কি! পারে এরকম করতে?" বলেই ঘটিটা তুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটার পর একটা কুড়ি-পঁচিশটা খরগোশ বের করে চারি দিকে ছেড়ে দিল, তারাও ল্যাজ তুলে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

"হ্যাঁ! ব্যাটা জোচ্চুরি করে পাঁচজন পার্টনারের টাকা হাতিয়ে মস্ত এক তাঁবু ফেঁদে বসলেই কি ম্যাজিসিয়ান হয়ে গেল! পারে এরকম?" বলেই বালতিটাকে একটা ঠেলা মারতেই সেটা আমার চোখের সামনে একটা কচ্ছপ হয়ে গিয়ে গুড়্‌গুড়্‌ করে ঝোপটার দিকে এগিয়ে চলল। লোকটাও "আরে! যাও কোথায় চাঁদ!" বলে ছুটে গিয়ে আমাদের বালতিটা এনে আমার হাতে দিল। আমি তো থ!

তার পর পা-দুটোকে সোজা করে পকেট থেকে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি বের করে ঝাঁকড়া কটা-রঙের চুলগুলো আঁচড়াতে লাগল আর মাথা থেকে রাশি রাশি হলদে প্রজাপতি উড়ে যেতে লাগল। তার পর চিরুনিটাকে এক ঝাড়া দিয়ে পকেটে পুরল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম চারি দিক ছোট্ট-ছোট্ট সাদা কাগজের ফুলে ছেয়ে গেল।

লোকটা বলল, "ছিঃ! ওটাকে আপনারা ম্যাজিসিয়ান বলবেন না। ব্যাটা শুঁটকি খায়, ঘুমোলেই নাক ডাকে, আর ভারি পাজি, ছোটলোক। তবে আজ একহাত নিয়েছি ব্যাটার উপর। আমার কাছে ম্যাজিক শিখে আমাকেই আজকাল তোয়াক্কা করে না। জানেন, ওটার এমনি আস্পদ্দা বেড়েছে যে দরোয়ানদের বলে দিয়েছে আমাকে যেন তাঁবুতে ঢুকতে না দেয়। হুঁ! পীরের সঙ্গে মামদোবাজি! ওর চোদ্দোপুরুষের ভাগ্যি যে ওকে ধুলো ফুঁকে উড়িয়ে দিই নি। ঠিক দিতাম। নেহাত ওর মার মনে কষ্ট হবে কিনা তাই ছেড়ে দিলাম। তবে একেবারে ছেড়ে দিই নি, সার্। তাঁবুর বাইরে থেকে এমনি করে একটা তুড়ি মারলাম, আর ওর ট্যাঁকের পয়সা সব এমনি করে আমার ট্যাঁকে চলে এল!" বলেই লোকটা একটা তুড়ি মারল আর অমনি কোত্থেকে সব রাশি রাশি টাকা টুপ্‌টাপ্ করে ওর পায়ের কাছে জড়ো হল। সেগুলিকে গোছা করে কুড়িয়ে আবার পকেটে রেখে, লম্বা একটা সেলাম ঠুকে আমাকে বলল, "খোদ কর্তা আজ আমাকে দুধে-জলে বাঁচিয়ে দিলেন, নইলে ছুটতে-ছুটতে খিদেয় তেষ্টায় প্রাণপাখি এক্ষুনি ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছিল আর-কি! ব্যাটাচ্ছেলে কি কম বদমাইস! ওর ট্যাঁকের পয়সা আপনা থেকেই আমার পকেটে চলে এল, আমি মোটে নিই নি, আর হতভাগা আমার পিছনে কিনা পুলিশ লাগিয়ে দিল! উঃ! আরেকটু হলেই বুকটা একেবারে ফেটেই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস বাঁচিয়ে দিলেন। এখন আপনাকে কি দেওয়া যায় বলুন দিকি? এগুলোর খানিকটা নিয়ে আমাকে কেতাত্থ করবেন কি?" বলেই শূন্য থেকে একমুঠো টাকাপয়সা ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি মাথা নাড়লাম। সে বললে, "নিন-না সার্। লজ্জা কিসের। আমি হলফ করে বলছি ওর একটা পয়সাও আমার নিজের নয়, সব ভেলকি! সত্যি নেবেন না, সার্? আমার কিন্তু কোনো ক্ষতি হত না।" আমি বললাম, "না! পয়সাকড়ি চাই না।" তখন সে টাকাপয়সা-গুলোকে আবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "মনে বড় দুঃখ দিলেন, জাঁহাপনা। প্রাণটা বাঁচালেন, এখন আমি যদি উলটে কিছু না করি তবে যে আমি ঋণী থেকে যাব। সেটা কি ভালো হবে? আচ্ছা। নাহয় ফরমাশ করুন শেষ একটা খেল দেখিয়েই যাই। কি হুকুম বলুন।"

আমি বললাম, "ঐ লোকটা নাকি টেবিল-চেয়ার নাচাতে পারে।"

সে হো হো করে হেসে বলল, "ওঃ, এই! টেবিল-চেয়ার তো যে-সে নাচাতে পারে, সময় থাকলে আপনাকেও শিখিয়ে দিতাম। ও কিছু নয়। তার চেয়ে ঢের ভালো নাচ দেখাচ্ছি আপনাকে।" বলেই তার ময়লা রুমালটাতে তিনটে-চারটে গিঁট দিয়ে নিল, অবাক হয়ে দেখলাম দূর থেকে দেখতে অবিকল একটা ছোট্ট মানুষের মতো হল। তার পর সেটাকে ছুঁড়ে একটু তফাতে ফেলতেই সেটা লাফিয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকে, কোমরে হাত দিয়ে ঠ্যাং তুলে এমনি নাচতে শুরু করে দিল যে আমার চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড়!

তখন লোকটা আমার দিকে ফিরে বলল, "না, একা-একা বেশি জমাতে পারছে না। আপনার রুমালটিও দেবেন সার্?"

আমি বললাম, "না, না, রুমাল যদি নাচে তা হলে আমি নাক মুছব কি দিয়ে?"

সে বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে সার্!" বলে নিজের রুমালটিকে আবার হাতে তুলে নিল, আর ওটা ওর হাতের উপরেই নাচতে থাকল। তার পর আস্তে ওর মাথায় একটা টোকা দিতেই দেখি যে একটা রুমাল নাচছিল, তার জায়গায় দুটো রুমাল নাচছে। কতক্ষণ যে ঐ নাচ দেখলাম তার ঠিক নেই। শেষে যেন দূরে লোক-জনের সাড়া পেলাম। লোকটা অমনি লাফিয়ে উঠে কুর্নিশ করে বলল, "চলি, জাঁহাপনা। বান্দাকে মনে রাখবেন!" অমনি রুমাল-দুটোও হাত তুলে আমাকে সেলাম করে ওর সঙ্গ নিল। যতক্ষণ দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, ওরা তিনজনে নাচতে নাচতে আমাদের বাড়ির পিছনের রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে! তার পর পথটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেইখানে পৌঁছে ওরা একবার ফিরে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে নেচে নিয়ে, হাত নাড়তে-নাড়তে মোড় ঘুরে চলে গেল।

দাদারা সন্ধ্যাবেলা কত কি যে বলতে লাগল তার ঠিক নেই। আমার হাসি পাচ্ছিল। একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, "লোকটার মস্ত গোঁফ আছে না, আর পেন্টেলুনের ঠ্যাং সরু না?" "আরে, সত্যিই তো রে তাই। তুই কি করে জানলি? আর জানিস, শেষের খেলাটি অদ্ভুত, স্টেজের উপর টেবিল-চেয়ারগুলো ডুগ্‌ডুগ্ করে নাচতে শুরু করে দিল!" আমি বললাম, "ও আর এমন কি? একটু শিখে নিলেই

ওরকম সবাই পারে। কুনিশ করেছিল ? সেলাম করেছিল ? যাবার সময় হাত নেড়েছিল ?" দাদা বলল, "হ্যাঁরে, তুই পাগল হলি নাকি ?" আমি শুধু পাশ ফিরে একটু মুচকি হাসলাম।

পঞ্চমুখী শাঁখ

বটুদের দেশের বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড পঞ্চমুখী শাঁখ আছে। শুনেছি শাঁখটা নাকি দেড়শো বছর ধরে ওদের বাড়িতে রয়েছে। ওর নানারকম গুণটুনও নাকি আছে। আগে রোজ ওর পুজো হত, পুরুতঠাকুর আসত, খাওয়া-দাওয়া হত। তবে সত্তর বছর হল পুজোটুজো সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ওটা বসবার ঘরের তাকের উপর সাজানোই থাকে। দুপাশে দুটো কাচের ফুলদানিতে কাগজের ফুল থাকে, আর মাঝখানে শাঁখটা পাঁচটা শিং তুলে চক্‌চক্ করে। রঙটা ফিকে কমলালেবুর মতো, দারুণ ভারী, আর সারা গায়ে কেমন একটু ধুপধুনোর গন্ধ।

গত বছর পুজোর সময় কয়েকদিনের জন্য ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শাঁখটা দেখে আমি তো অবাক। শাঁখ যে আবার এত প্রকাণ্ড হয় তা আমার জানা ছিল না। ঘরে কেউ ছিল না, আস্তে আস্তে গিয়ে ওর গায়ে একটু হাত বুলোলাম, কি সুন্দর পিছলা-পিছলা মনে হল। এমন সময় পিছন থেকে বটুর ছোট্‌দাদু বললেন, "একটু ধরতে ইচ্ছে হয় তো ধর্। কিন্তু খবরদার যেন আবার বাজিয়ে বসিস না, হাঁ, তা হলেই সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। ওটাকে শেষ বাজিয়েছিলেন আমার ছোট্‌ঠাকুরদা। তার পর থেকে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস, ঠিক ঐখানটিতে তাঁর লাল মখমলের চাপকান, চুড়িদার ইজের আর নাগরা জুতোজোড়া পড়ে ছিল। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে থেকে ছোট্‌ঠাকুরদা একেবারে বেমালুম নিখোঁজ। সেই থেকে আর ও শাঁখ বাজানো হয় না।"

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে একটু সরে দাঁড়ালাম। ছোট্‌দাদু বললেন, "না বাজানো অবধি কোনো ভয় নেই। ঐ শাঁখটা কি এ বাড়ির জন্য কম করেছে। এ গুষ্টির যা-কিছু একরকম সবই বলতে

গেলে ঐ শাঁখেরই দয়ায়। তার পর কেন যে বিগড়ে গিয়ে ও সর্বনাশটি করল কে জানে। দেখিস আবার ফেলে-টেলে দিস নে যেন। আঙুলও ছেঁচে যাবে, আবার কি হতে গিয়ে শেষটা কি হয়ে যাবে।" এই বলে ছোট্‌দাদু ঘরের কোনা থেকে লাঠিগাছি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরে বটুর কাছে আরো শুনলাম। সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার। দেড়শো বছর আগে ওদের কে একজন পূর্বপুরুষ মেলা ধারধোর করে শেষটা পাওনাদারদের তাগাদার চোটে সন্ন্যাসী হয়ে সটান রামেশ্বর। সেখানে গিয়ে ঐ অত বড় মন্দির, যার বারান্দাটাই শোনা যায় চার হাজার ফুট লম্বা আর তার মধ্যে থাকে থাকে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি সাজানো, এই-সব দেখে তাঁর মনের একটা ভারি পরিবর্তন হল। গেলেন সমুদ্রের ধারে, স্নান সেরে একবার পুজো দেবেন।

সে কি বিশ্রী সমুদ্রের ধার সে আর কি বলব। একেবারে জলের কাছাকাছি পর্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো গাছগাছালি, জলে মোটে ঢেউ নেই, তীর ঘেঁষে শ্যাওলা পড়েছে, আর সে যে কি বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ। কিন্তু মনের বদল হয়েছে, এখন তো আর ও-সব ভাবলে চলে না। বটুর পূর্বপুরুষ একটা গামছা পরে, তার মধ্যেই ঝুপ্‌ঝাপ্ করে নেমে পড়লেন। ওমা, পায়ের আঙুলে আবার কুট্‌কুট্ করে কামড়ায় কিসে? পূর্বপুরুষ সেখান থেকে খানিকটা সরে গিয়ে স্নানের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। কিন্তু কি জ্বালা! আবার আঙুলে কিসে কুট্‌কুট্ করে কামড়ায়! কি আপদ! এরকম করলে তো মন বদলানো মুশকিল! পূর্বপুরুষ বিরক্ত হয়ে জল থেকে উঠে পড়লেন!

বালিটুকু পার হবেন, এমন সময় পিছনে একটা সর্‌সর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন এ কি কাণ্ড! একটা বিরাট পাঁচমুখী শাঁখ কুকুর-বাচ্চার মতো পিছন পিছন আসছে। এখন কি করা যায়! শাঁখটাকে তাড়া দিলেও যায় না। পূর্বপুরুষের শুকনো ধুতির খুঁটে বাঁধা একটু মুড়ি-নারকেল ছিল তাই খানিকটা ছুঁড়ে দিলেন, অমনি গুড়্‌গুড়্ করে এগিয়ে এসে শাঁখটা সেটার উপর চেপে বসল।

তার পর তার সাহস আস্তে আস্তে আরো বেড়ে গেল, একেবারে নাকি কোলে চড়ে বসল! পূর্বপুরুষ তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, কি জানি আবার কামড়াবে-টামড়াবে না তো? ওজনটিও নেহাত কম নয়। যেই-না ও কথা ভাবা, পূর্বপুরুষ একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি

যেমনি ভাবা অমনি ঠুক্ করে পায়ের কাছে কি একটা পড়ল!

শাঁখটাও কোল থেকে গড়িয়ে বালির উপর চিৎ হয়ে পড়ল। পূর্বপুরুষ অবাক হয়ে দেখলেন, ওটার ভিতর পোকা-টোকা কিছু নেই, একদম ফাঁকা, এমন-কি, মাথায় একটা ফুটো অবধি রয়েছে। তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন, অমনি মাঝ-সমুদ্রের অগাধ জলের শোঁ শোঁ শব্দ কানে এল, পূর্বপুরুষের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। শাঁখটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একবার একটু ফুঁ দিয়ে বাজাতেই আকাশ বাতাস জুড়ে গম্‌গম্‌ শব্দ উঠল।

মনে ভাবলেন, যদি কিছু টাকা পেতাম শাঁখটা নিয়ে দেশে ফিরে যেতাম। ধারকর্জ শোধ করে দিয়ে, শাঁখটাকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। যেমনি ভাবা, অমনি ঠুক্‌ করে পায়ের কাছে কি একটা পড়ল। তুলে দ্যাখেন ময়লা একটা ন্যাকড়ার থলি-ভরা রুপোর টাকা। পূর্বপুরুষ আর সময় নষ্ট না করে, বুকে শাঁখটাকে জাপটে ধরে, হাতে টাকার থলি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তার পর ধার-ধোর শোধ করে দিয়ে, এই বাড়িটা তৈরি করলেন। শাঁখের জন্য আলাদা একটা ঘর হল, ভারি ধুমধাম করে রোজ তার পুজো হত। আর তার দৌলতে ওদের আর কোনোরকম দুঃখকষ্ট রইল না, কারণ রোজ রাত্রে পুজোর পর একবারটি বাজিয়ে ওর কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত।

বটু এতদূর বলে একবার আমার দিকে তাকাল, তার পর আরো বলল, "দিনের মধ্যে কিন্তু ঐ একবারই ওর কাছে চাওয়া হত, আর যা চাওয়া যেত ঠিক তাই পাওয়া যেত। কিন্তু খুব সাবধানে চাইতে হত, কারণ ঠিক যেমনটি বলা হত, তেমনটি ফলে যেত। কথার একটু নড়চড় হত না। তার জন্য মাঝে মাঝে খুব অসুবিধাও হত। বুড়ি ঠাকুমা শাঁখ বাজিয়ে প্রণাম করে সবেমাত্র উঠেছেন, নাতি-নাতনিরা এমনি জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে যে ওঁর পানের ডিবের সব পান কটি খেয়ে ফেলে, ওঁর হাড় একেবারে ভাজা-ভাজা করে তুলেছে। বিরক্ত হয়ে যেই বলেছেন, 'চুলোয় যাক্‌ গে!' আর যাবে কোথা। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ সব রান্নাঘরের উনুনে গিয়ে পড়েছে, উনুন-টুনুন নিবে একাকার, এখানে ছ্যাঁকা, ওখানে ছ্যাঁকা! তবে মাঝে মাঝে আবার সুবিধাও হয়ে যেত। বেয়াইবাড়ির লোকরা মহা বাড়াবাড়ি লাগিয়েছিল। কিছুতেই মেয়ে পাঠাবে না। বুড়ো ঠাকুরদা সবে পুজো সেরে শাঁখকে বাজিয়ে

প্রণাম করে উঠেছেন, এমন সময় যারা মেয়েকে আনতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিল। বুড়োও রেগে বললেন, 'বেয়াই-বেয়ান ফিরিয়ে দিল বুঝি? যাক্ গে, মরুক গে।' বাস্! আর যাবে কোথা। তৎক্ষণাৎ বেয়াই-বেয়ান চোখ তুলে একেবারে অক্কা।"

আমি বটুকে বললাম, "তবে তুই শাঁখকে বলে একটু অঙ্কের নম্বর-টম্বর বাড়িয়ে নিস-না কেন?"

বটু বলল, "সে হবার জো নেই। সত্তর বছর থেকে আর ওর কাছে কিছু চাওয়া বারণ।" আমি শাঁখটার আরেকটু কাছে এগিয়ে বললাম, "কেন, চাইলে কি হয়?"

"আরে, কি হয় মানে? ঠাকুরদার ঠাকুরদা যে একেবারে কপ্পুরের মতো উড়ে গেলেন, সেটা বুঝি কিছু নয়?"

যদিও ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা উড়ে গেছেন বলে আমার কিচ্ছুও হয় না, তবু ওদের বাড়িতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, তাই আরো কিছু না বলাই ভালো মনে হল।

কিন্তু অমন সুন্দর একটা শাঁখ, এতকাল ঘরে রয়েছে, কাউকে কিছু বলে-টলেও না, তাকেই-বা অত ভয় কিসের ভেবে পেলাম না। একটু হাত দিয়ে সরালাম, কিচ্ছু হল না। দু হাতে তুলে নিয়ে একটু শুঁকলাম, বেশ গন্ধ। কানের কাছে উঠিয়ে শুনলাম, অগাধ সমুদ্রের জল শোঁ শোঁ করছে। কেমন যেন গায়ের লোমগুলো সর্‌সর্ করে সব খাড়া হয়ে উঠল। শাঁখটাকে আবার নামিয়ে রাখলাম। বটু একটু কাষ্ঠ হেসে বলল, "দেখিস, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললে কিন্তু শেষে কষ্ট পেতে হবে।"

বটুদের পাড়া ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে, বটতলার মাঠে পুজোর সময় যাত্রা হয়। কিন্তু বটুদের বাড়ির লোকেরা এমনি যে কিছুতেই ছেলেদের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেবে না। বলে নাকি আমার বাবা শুনলে রাগ করবেন। বাবা এদিকে নিজে—যাক্ গে সে কথা। বটু বলল, "অত সহজে ঘাবড়ালে চলবে কেন! দ্যাখই-না!" তার পর খাওয়া-দাওয়া সারা হলে, ঘরে গিয়ে খানিক ঘাপ্‌টি মেরে থাকলাম। তার পর উঠে পাশবালিশ আর মাথার বালিশ দিয়ে দুই বিছানায় দুই মানুষ বানিয়ে তাদের গায়ে-মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে, মশারি গুঁজে, আলো নিবিয়ে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

আমার বুক টিপ্ টিপ্ করছিল, হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। বটু বলল, "এ তো আমরা বহুবার করেছি। চল রান্নাঘরের জানলা দিয়ে।"

দূরে যাত্রার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে। আমরা বসবার ঘর পেরিয়ে যাবার সময়, তাকের উপর চোখ পড়ল, অন্ধকারেও শাঁখটা কিরকম জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, পা চালিয়ে এগোলাম।

বাইরে তারার আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরে জানলা বাইরে থেকে ঠেসে দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড় দৌড়, একেবারে বটতলার মাঠের যাত্রায়।

উঃ, কি ভালোই যে লাগল! কুম্ভকর্ণ যে কি মজাটাই করল! কখন যে রাত কেটে গেল টেরই পেলাম না। ভোরের আগে যাত্রা ভাঙল, বটু আর আমি ঢুলু ঢুলু চোখে বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

এই পর্যন্ত কোনো গোলমাল হয় নি। কিন্তু রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ঢুকেই বটু একটা বালতি না কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে, একগোছা থালা ঝন্‌ঝন্ করে ফেলল। তার এমনি আওয়াজ যে, মরা মানুষরাও উঠে বসে।

কোনোরকমে সেখান থেকে ছুটে বসবার ঘর অবধি এসেছি, আর ততক্ষণে চার দিকে হৈ-চৈ। ছোট্‌দাদু লাঠি নিয়ে, টর্চ নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ধরলে আর আস্ত রাখবেন না। একবার টর্চটা আমাদের মুখে পড়লেই আমার ছুটিতে মজা-মারা সারা! অন্ধকারে শাঁখটা তখনো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। এক দৌড়ে সেটাকে বুকে নিয়ে আস্তে একটু ফুঁ দিলাম। অমনি সারা বাড়িময় গম্ গম্ করে উঠল। মনে মনে বললাম, এইবার দেখি তোমার ক্ষমতা। ওমা! ও কথা ভাবামাত্র শাঁখটা আপনি আপনি আমার হাত থেকে সুড়ুৎ করে ছুটে গিয়ে একেবারে ছোট্‌দাদুর পায়ের উপর! আর কি! ওরে বাবা রে, বোমা ফেলল নাকি রে, মরে গেলাম রে, জল আন্ রে! দেখতে দেখতে চারি দিকে লোকজন গিজ্ গিজ্ করতে লাগল। সেই সুযোগে বটু আর আমি খাবার ঘর থেকে লম্বা!

হুঁশিয়ার

যখন সামনের লোকটার লোমওয়ালা ঘেমো ঘাড়টার দিকে আর চেয়ে থাকা অসম্ভব মনে হল, চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলাম। অমনি কার জানি একরাশি খোঁচা-খোঁচা গোঁফ আমার ডান দিকের কানের ভিতর ঢুকে গেল। চমকে গিয়ে ফিরে দেখি ভীষণ রোগা, ভীষণ লম্বা, ভীষণ কালো একটা লোক গলাবন্ধ কালো কোট পরে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে! তার পিছনে আরো অনেক লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কোন পা-জোড়া তার বুঝে নিতে আমার একটু সময় লাগল। শেষটা টের পেলাম খুব সরু লোমওয়ালা, আর খুব কালো ঠ্যাং দুটো ওর। তায় আবার একজোড়া দাঁত-বের-করা ছেঁড়া চটি পরা, তার ফুটো দিয়ে নোংরা বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে।

এই লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে আস্তে আস্তে আমার কানের মধ্যে থেকে তার গোঁফটাকে সরিয়ে নিতে নিতে বলল, "মনিব্যাগটা আরেকটু খাম্‌চে ধরুন, যা চোর-চামারের উপদ্রব!" লোকটার কথাগুলো যেন কত দূর থেকে এল, কিরকম একটা হালকা ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ। তার চোখ দুটোও যেন আর কিছুতেই গর্তের মধ্যে থাকছিল না, একেবারে বেরিয়ে এসে আমার মনিব্যাগের ভিতরের খোপের মধ্যে পড়ে যেতে চাচ্ছিল। সবাই একজনের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শেয়ালদা স্টেশনের ইনটার ক্লাস টিকিট-ঘরের দিকে এগোচ্ছিলাম। খুব সাবধানে, কারণ একটু এক পাশে সরলেই ধাক্কার চোটে লাইন থেকে বেরিয়ে পড়বার ভয়। এমনি করে যখন খাঁচার ভিতরে বেশ কালো-কালো মেমসাহেবের কাছে পৌঁছলাম, তখনো টের পাচ্ছিলাম, পিছনে সেই লোকটার ফোঁস্‌ফোঁস্ নিঃশ্বাস আর আস্তে আস্তে গোঁফ-নাড়া।

লোকটা দেখলাম আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। মেমসাহেবকে যখন টাকা দিলাম লোকটা ঝুঁকে ব্যাগের মধ্যে দেখতে দেখতে বলল, "চেঞ্জ গুনে নেবেন, বেটিরা ভারি ছ্যাঁচড়!" মেম রেগে এ-গাল থেকে ও-গালে চুইং-গামটা ঠুসে দিয়ে বলল—"চোপরাও বাবু!" তার পর

লোকটা আমাকে সেইরকম যত্ন করে উপদেশ দিতে দিতে প্ল্যাটফর্মের দিকে নিয়ে চলল। একটা কলার খোসা আর কি যেন খানিকটা খুব কসরত করে এড়িয়ে বলল, "সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সবারটা গিলবার ফিকিরে আছে।" গেটের কাছে চেকার বাবু চিকিত চিকিত করে টিকিট ছেঁটে দিলে পর আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। বলল, "এই যে গাড়ি"—অবিশ্যি সেটা বলবার কিছু দরকার ছিল না।

আমার সঙ্গে একটা ইনটার ক্লাস গাড়িতে ঢুকে আমার পাশে বসে বলল, "জিনিসপত্র আগলে রাখুন, সুটকেসটা দূরে রাখবেন না, নিজের সীটের তলায় রাখাই ভালো। এটা জেনে রাখবেন শিয়ালদা স্টেশন, চোর-বাটপাড়ের আড়ত।" তার পর আমরা দুজনেই জুতো খুলে পা তুলে আরাম করে বসলে পর বলতে লাগল, "সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজে যতগুলো চোর-জোচ্চর দেখেছি সবগুলোকে একটার পিছনে একটা দাঁড় করালে এখান থেকে বোলপুর স্টেশন অবধি লম্বা একটা লাইন হয়।" এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম।

তখন সে আরো বলতে লাগল, "আর ছিঁচকে চুরির জন্য তারা যে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও বুদ্ধি দেখিয়েছে, ভালো কাজে যদি লাগাত এতদিনে ভারতবর্ষ উদ্ধার হয়ে যেত।"

তার পর তার কালো কোটের পকেট থেকে একটা চারকোনা পানের ডিবে বের করে বলল—"গিরিডির মতন সভ্য শহরে, যে জায়গা সজ্জনের বাস বলে বিখ্যাত এমন শহরে, সেবার পুজোর সময়ে সচ্চিদানন্দ জ্যাঠামশাইয়ের পাজামা-সুটের ইজের গা থেকে খুলে চোরে নিয়ে চলে গেল, এর বেশি আর কি বলা যায়!"

আমি নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগলাম। আর সে গোটা দুই পান মুখে পুরে, একটু চুন দাঁতে লাগিয়ে বলে যেতে লাগল—"গরমের জন্য বাইরে মাদুর পেতে, তায় চাদর বিছিয়ে, বালিশ মাথায়, চাদর গায়ে, পায়ের কাছে চটি, বালিশের নীচে হাতঘড়ি, মাথার কাছে জলের গেলাস নিয়ে, ভগবানের নাম করে রোজকার মতন শুয়ে পড়েছেন। আর সকালে উঠে দ্যাখেন কিনা চটি নেই, গেলাস নেই, বালিশ নেই, হাতঘড়ি নেই, এমন-কি, পরনের ইজেরটা পর্যন্ত কখন যেন আস্তে আস্তে খুলে নিয়েছে!"

শুনে আমি আশ্চর্য হলাম।

তখন সে বলল "কাউকে মশাই বিশ্বাস করা যায়? অরুণবাবু ট্রেনে করে আসছেন। সেকেন কেলাস গাড়ি, সঙ্গে উঠলেন দিব্যি খাকি প্যান্ট-শার্ট-হ্যাট-পরা বাঙালি-সাহেব। ক্যায়সা ভাব জমে গেল দেখতে দেখতে। ইনি ওঁর বিস্কুট খেলেন, আবার উনি এঁর সিগারেট টানলেন। তার পর মুড়ি-সুড়ি দিয়ে দুজনে ঘুম। সকালে উঠে অরুণবাবু দেখলেন বাঙালি-সাহেবও নেই, তার জিনিসপত্রও নেই, আর অরুণবাবুর সুটকেসও নেই।"

আমি একবার আমার সুটকেস ও পুঁটুলিটা দেখে নিয়ে ঠ্যাং বদলে বসলাম। আর সে বাইরে এঁদো পুকুরে ধোপাদের কাপড় কাচা দেখতে দেখতে নিচু গলায় বলতে লাগাল :

"ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে পিসিমার কাছে থাকতাম। গ্রামের একধারে বাঁশঝাড়ের কাছে খড়ের চালের বাড়ি। যেই-না সন্ধে হওয়া আর অমনি বাড়ির আর উঠোনের আনাচে-কানাচে ভয়ভীতিরা ভিড় করে আসত। বাঁশঝাড়ের শুকনো পাতা খসার শব্দ থেকে আরম্ভ করে আমাদের মেনি বেড়ালটার ক্যাঁক্ করে ইঁদুর ধরার আওয়াজটা পর্যন্ত সূর্য ডোবার পর কেমন যেন অন্যরকম লাগত। আর পিসিমা শোবার আগে প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেকটা খিল ভালো করে দেখে নিতেন, বাক্স-প্যাঁটরার উপর নানান ভাবে ঘণ্টা বাসন সব এমন করে সাজিয়ে রাখতেন যাতে একটু সরালেই সব দুম্‌দাম্ পড়ে আমাদের কেন, পাড়ার অন্য লোকদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই-সব করতে করতে পিদ্দিমের তেলটুকু পুড়ে যেত আর আলো নিবে যেত। পিসিমাও অমনি খচ্‌মচ্ করে বিছানায় ঢুকতেন। মাঝে মাঝে ওঁর ঠাণ্ডা খড়্‌খড়ে পা আমার পায়ে লেগে যেত, আমি শিউরে উঠতাম! শুয়েই আবার পিসিমার মনে হত—কি হবে, খাটের তলা দ্যাখা হয় নি, যদি কোনো ধূর্ত চোর ছোরা-হাতে সেখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে! আমাকে বলতেন 'এই, তোর একটা মার্বেল খাটের তলা দিয়ে গড়িয়ে দে-না, ওদিক দিয়ে বেরোলে বুঝব খাটের তলায় কেউ নেই!' ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যেত, পিসিমা যা বলতেন তাই করতাম। একবার খাটের পায়ায় মার্বেল আটকে গেল, আর সারারাত পিসিমা আর আমি জেগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। আর কখনো যদি পিসিমা আগে শুতেন আর আমাকে অন্ধকারে পরে শুতে হত, খাটের তিন হাত

দূর থেকে এক লাফ মেরে খাটে উঠে পড়তাম, যাতে খাটের তলায় লুকিয়ে বসা বদমায়েসটা তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার ঠ্যাং ধরে টেনে নিতে না পারে। একদিন হিসেব ভুল হওয়াতে পিসিমার পেটের উপর ল্যাণ্ড করেছিলাম, আর পিসিমা আমার কান-টান মলে বার বার বলতে লাগলেন যে উনি পষ্ট টের পাচ্ছেন ওঁর নাড়িভুঁড়ি সব এলিয়ে গেছে!"

এতটা বলে লোকটা একবার আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "ছোটবেলা থেকে এমনি আমার ট্রেনিং যে কোনো শা—র চোরও আমার কাছ থেকে কানাকড়িটিও পায় নি! এই দেখুন নোটের তাড়া নিয়ে নির্বিঘ্নে যাচ্ছি!"

এই অবধি বলেই হঠাৎ সে এদিক-ওদিক চেয়ে সটাং শুয়ে পড়ে নাক ডাকতে লাগল। গাড়িতে আর যে দু-চার জন ছিল তারাও সবাই একসঙ্গে নেমে গেল। আর আমিও আমার যে দু-একটা কাজ ছিল সেরে নিয়ে অন্য এক বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম ও একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে এসেছে, চোখ ঘষে উঠে দেখি আমার সঙ্গীটি কখন জানি নেমে গেছে। তার কথা মনে উঠতেই আর তার চোরের ভয় মনে করতেই বেজায় হাসি পেল। ঠিক এই সময় চোখে পড়ল বেঞ্চির তলায় আমার সুটকেস, পুঁটলি ও চটি কিচ্ছু নেই। আছে কেবল তার সেই দাঁত-বের-করা ছেঁড়া চটি জোড়া।

ভীষণ রাগ হল। ভণ্ড, জোচ্চোর, বকধার্মিক কোথাকার! রাগের চোটে হঠাৎ নিজের ট্যাঁকের উপর হাত পড়ে গেল। ট্যাঁক খুলে দেখলাম কাল রাত্রে লোকটা ঘুমিয়ে পড়বার পর তার বুক-পকেট থেকে যে নোটের তাড়াটা সরিয়েছিলাম—আমার সুটকেস ইত্যাদি চুরি যেতে পারে—কিন্তু সেটি ঠিকই আছে।

বেশ একটু খুশি মনে আবার শুয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠলাম।

সেকালে

পঁয়ষট্টি বছর আগে আমার মামাবাড়ির দেশে এক দিকে যেমন সাধু-সজ্জনের ভিড় ছিল এবং তার ফলে পুজোপার্বণ, তিথিপালন, হরির লুট, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙালী-বিদায় লেগেই থাকত, আবার তেমনি অন্য দিক দিয়ে ঠগ-ঠ্যাঙাড়ে, জোচ্চোর-বাটপাড়েরও এমনি উপদ্রব ছিল যে, দিনের বেলাতেও কেউ একা নির্জন পথে বেরুতে সাহস পেত না।

তখন লোকের অবস্থাও ছিল ভালো। খাওয়া-দাওয়ার কারো অভাব ছিল না, পুকুরে প্রচুর মাছ, গোয়াল-ঘরে বড়-বড় দুধী গাই বাগানে অপর্যাপ্ত শাকসবজি, ফলপাকুড়, কোনো ভিখিরি কখনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে যেত না।

কিন্তু তা হলে হবে কি? দুষ্টুলোকদের ঠেকানো কারো সাধ্য নয়; উপরন্তু দু-একজন ছিঁচকে চোর ছাড়া কেউ বড়-একটা ধরাই পড়ত না, তা তাদের সাজা দেওয়া হবে কি করে? সে সময়ে ঐ অঞ্চলের জেলখানাগুলো বারোমাস খালি পড়ে থাকাতে গ্রামের পঞ্চায়েতের পরামর্শে নাকি সে-সব ঘরগুলি গরিবদের কাছে অল্প দামে ভাড়া দেওয়া হত, আর ঐ ভাড়ার টাকা থেকে শীতকালে ঐ গরিবদেরই লাল কম্বল কিনে দেওয়া হত। কিন্তু সৎকাজের সব সময় ভালো ফল হয় না। চুরি-ডাকাতি উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে লাগল।

শেষকালে এমন হল যে, সরকারি খাজাঞ্চিখানার এক দিকের দেয়াল রাতারাতি কারা কেটে নিয়ে যথাসর্বস্ব তো নিয়ে গেলই, উপরন্তু দেয়ালের ইঁটগুলি খুব মজবুত হওয়াতে সেগুলিকে সুদ্ধ যে গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল, চাকার সব দাগ থেকেই তা বোঝা গেল। সমস্ত অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা, চৌকিদার, জমাদারদের মুখে কাপড় বেঁধে একটা ছোট কুঠরিতে তালাচাবি বন্ধ করে এই কাজটি সারা হল, বাইরের কাকপক্ষীটি কিছু টেরই পেল না। পাহারাওয়ালারা শুধু এইটুকু বলতে পারল যে, লোকগুলো দারুন ষণ্ডা আর বীভৎস সব

মুখোশ দিয়ে সারা মুখটা ঢাকা।

এত-সব উপদ্রবের মধ্যে যে আমার মামাবাড়ির লোকরা নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করতে লাগলেন, ছেলেমেয়েদের পৈতে ও বিয়ে উপলক্ষে ভাল ভাল সোনার গয়না গড়িয়ে, পাড়াসুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন, তার একমাত্র কারণ হল নাকি ওদের গুরুদেবের আশীর্বাদ।

আমার ছোটমামার কাছে শুনেছি যে গুরুদেবটি যে-সে লোক ছিলেন না! হাঁটু পর্যন্ত লম্বা দুই হাত, ফরসা রঙ, তাল-ঢ্যাঙা মানুষটি। আর শরীরে সে কি শক্তি! একবার বাঁ হাতে একটা পাগলা মোষের শিং চেপে ধরে তাকে এমনি বশ করে ফেলেছিলেন যে সেই অবধি সে কুকুর-বাচ্চার মতো তাঁর পিছনে-পিছনে ঘুরত, কেউ কাছে এলেই ল্যাজ নাড়ত।

গুরুদেবের অবিশ্যি খুবই নামডাক, খুবই চাহিদা, তাই বারোমাস গাঁয়ে থাকা তাঁর ঘটে উঠত না। দুটি শিষ্য নিয়ে আসতেন যেতেন, দুদিন এর বাড়ি দুদিন ওর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করে সকলকে আশীর্বাদ করে চলে যেতেন। ঠিক আতিথ্যও বলা যায় না, কারণ সাধুসজ্জন মানুষ, কারো বাড়ির মধ্যে পদার্পণ করতেন না, উঠোনে তাঁদের জন্য কানাৎ ফেলা হত। নিজেরা রান্না করে নিরামিষ খেতেন, তার জন্য কাঁচা ফল, তরকারি, দুধ, ছানা শিষ্যরা জোগান দিত। টাকাকড়ি যে যা পারত প্রণামীও দিত, কিন্তু গুরুদেব কখনো কিছু চাইতেন না। লোকে খুশি হয়ে চ্যালাদের হাতে যা-খুশি দিত। তারাও সেটাকে খুশি হয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ছোট একটা কালো সিন্দুকে তুলে রাখত। যাবার সময় সিন্দুকটি কাঁধে করে নিয়ে যেত, আবার দরকার হলে গরিব-দুঃখীকে সিন্দুক খুলে টাকা-পয়সা দানও করত।

গুরুদেবের ক্ষমতাও ছিল অনেক। ফোঁটা দিয়ে, বড়ি দিয়ে, মাদুলি দিয়ে সাধারণ রোগ তো সারিয়েই দিতেন, আবার তেমন কঠিন ব্যামো হলে অনেক সময়, চাই-কি, শহরের হাসপাতালে যাবার খরচটাও দিয়ে দিতেন! কাজেই লোকে যে তাঁদের দেবতার মতো ভক্তি করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গাঁয়ের বুড়োরা গুরুদেব সম্বন্ধে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ছেলে-ছোকরারা ততটা ছিল না। বিশেষ করে আমার ছোটমামা ও তাঁর বন্ধুরা! তার একমাত্র কারণ অবিশ্যি হিংসে

ছাড়া আর কিছু নয়।

গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া তাদের মনে আর কিছুই থাকা উচিত ছিল না। কারণ ধর্মের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু গুরুদেব যাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাদের বাড়ির লোকদের আর কখনো যে কিছু খোয়া যেত না এটা তো কম কথা নয়!

সমস্ত শীতটা গুরুদেব গাঁয়ে থেকে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে চলে যেতেন; আবার পৌষ পড়লে এসে হাজির হতেন। মাঝের কটা মাস গাঁয়ের লোকেরা তাঁর আগমনের আশাতেই কাটিয়ে দিত। আর এমনি ছিল তাঁর তেজের মহিমা যে কেউ যদি তাঁর অনিষ্ট বা নিন্দামান্দা করেছে তো তার একটা বড় ক্ষতি হবেই হবে। ফিরে এসে তাই শুনে অবিশ্যি গুরুদেব খুবই দুঃখ করতেন।

একবার ছোটমামা পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। পাড়ার কতকগুলি আড্ডাবাজ ছেলে মিলে একটা ক্লাব খুলেছিল। সেখানে তাস পেটা, জুয়ো খেলা, লুকিয়ে লুকিয়ে সবই চলত। ছোটমামা তাঁর একটি গুণধর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, মেলা টাকা হেরে শেষটা আর উপায় না দেখে গাঁয়ের মহাজনের কাছে ধারধোর করে, সে-সব শোধ না করেই, আবার ছুটির শেষে কলকাতার কলেজের মেসে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে মহাজন মহা চটে গিয়ে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছে, বাড়িতে বলে দেব বলে ভয় দেখাচ্ছে। ছোটমামার বয়স তখন আঠারো কি উনিশ হবে, সেরকম বুদ্ধিও পাকে নি। বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। তখন হঠাৎ গুরুদেবকে মনে পড়ল। কতবার ঐ গুরুদেবকে নিয়েই বন্ধুমহলে হাসি-তামাশা করেছেন। এবার বিপদের সময় কিন্তু মনে-মনে দিনরাত গুরুদেবকে ডাকতে লাগলেন। আর কেবলই মনে হতে লাগল যে গুরুদেব নিশ্চয় একটা হিল্লে করে দেবেন।

হলও তাই। পুজোর ছুটিতে দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে আবার দেশে যাচ্ছেন। পথে সন্ধ্যা নেমে গেছে, চার দিক অন্ধকার করে দারুণ মেঘও করেছে। মাঝপথে ছোট একটা জংশনে গাড়ি বদল করতে হয়। স্টেশন মানে একটা শেডের মতো, তারই পাশে একটা কুঠরিতে স্টেশন-মাস্টারের আপিস, আর শেড বোঝাই গুড়ের নাগরি ও দিশি খেজুরের

তাল। সবটা থেকে একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই আধো-অন্ধকারে মিনিট-পনেরো অপেক্ষা করতে হবে।

ছোটমামার তো বুক টিপ্‌টিপ্ করছে। খালি মনে হচ্ছে গুড়ের ভাঁড়ের ওপাশে যেন দুটো লোক গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে! তার পর যেই-না দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছোটমামা দু-পা এগিয়েছেন, অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো কালো মুস্কো লোক এসে তাঁর দু-ঘাড়ে বিরাশি সিক্কা ওজনের দুই হাত রেখেছে। ছোটমামা তো পাথর হয়ে গেছেন!

কানের কাছে মুখ এনে একজন বললে—"ইস্, ভারি ভালোমানুষ বনে গেছিস দেখছি! খ্যাঁদা নাকের উপর আঁচিলটা না দেখলে তো চিনতেই পারতাম না। নে ধর, ভণ্ড কোথাকার! তোর আশায় বসে-বসে হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।" ততক্ষণে ট্রেনটাও এসে লেগেছে, আর দু-চারজন লোকও স্টেশন-মাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে! লোক দুটো ছোটমামার মুঠোর মধ্যে একটা ছোট কালো থলি একরকম জোর করে গুঁজে দিয়ে নিমেষের মধ্যে পিট্টান দিল। এক হাতে নিজের গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগ, অন্য হাতে থলিটা নিয়ে ছোটমামা গুটিগুটি সামনেই যে গাড়ি পেলেন তাতে উঠে পড়লেন। গাড়িও ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে ছোটমামার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এসেছে, নেড়ে দেখেন, ব্যাগটা দারুণ ভারী। চার দিকে চেয়ে দেখেন গাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, ভুল করে ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে পড়েছেন! তখনকার দিনে গাড়ির আলো এত উজ্জ্বল ছিল না, সেই টিম্‌টিমে আলোতেই থলির মুখের দড়ি খুলে, একবার তাকিয়েই ছোটমামা আরেকটু হলেই মূর্ছা খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন! থলিটার গলা অবধি হীরে, জহরৎ, সোনার গিনি ঠাসা! সব চেয়ে উপরে একটা লাল পাথরের আংটি জ্বল্-জ্বল্ করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা।

"জয় গুরুদেব" বলে এক মুঠো গিনি যেই-না ছোটমামা হাতে করে তুলেছেন, অমনি জানলা দিয়ে একটা যমদূতের মতো লোক গলে এসে—তখন জানলায় শিক লাগানো থাকত না—ঝুপ্ করে সীটের উপর পড়ল। ছোটমামা অবাক হয়ে দেখলেন, তার কুচ্‌কুচে কালো হাতে একটা বেঁটে মোটা মুগুরের মতো কি, আর মুখে একটা বিকট মুখোশ, তার নাকের কাছটা ফাঁকা। সেইখান দিয়ে খ্যাঁদা একটা কালো নাক

লোকদুটো ছোটমামার হাতে একটা ছোটো কালো থলি জোর করে গুঁজে দিল।

বেরিয়ে রয়েছে, তার উপরে বিরাট একটা আঁচিল!

লোকটি হাত বাড়িয়ে বলল—"বা-ব্বা! দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছ চাঁদ! এবার দাও দিকিনি থলিটা! খুব লোক বাবা তুমি!" ছোট-মামা কোনো আপত্তি না করে থলিটা তার হাতে দিয়ে দিলেন। গিনি-গুলিও দিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটা ফিক্ করে হেসে থলির মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। "আহা, অত ভালোমানুষি নাই-বা দ্যাখালে! উটি তোমার টিপিন খাবার পয়সা বলেই নয়তো রেখে দাও।" বলে এক লাফে যেরকম ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবে জানলা গলে চলে গেল! ছোটমামা বার বার গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে গিনি কটি পকেটস্থ করলেন।

তার পর যথাসময়ে দেনা শোধ করে ছোটমামা কুসঙ্গ ত্যাগ করে, আগ্রহের সঙ্গে গুরুদেবের আগমনের অপেক্ষায় থাকলেন। পৌষ মাসের আরম্ভেই শ্যামলবাবুদের বাগানে গুরুদেবের তাঁবু পড়েছে শুনে ছোটমামা আগে-বাগে ছুটে গিয়ে গুরুদেবের দুই পা জড়িয়ে ধরলেন। গুরুদেবও উদ্ধত ছেলেটার সুমতি হয়েছে দেখে মহা প্রসন্ন হয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আর পাশের ফুলের সাজি থেকে একটা আশীর্বাদী স্থল-পদ্ম তুলে তার হাতে দিলেন।

ছোটমামা হাত জোড় করে ফুল নিতে যাবেন, হঠাৎ চোখে পড়ল গুরুদেবের ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা লাল পাথর-দেওয়া আংটি জ্বল্‌জ্বল্ করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা। ভীষণ চমকে গিয়ে ছোটমামা গুরুদেবের মুখের দিকে চাইলেন। গুরুদেব দু-চোখ বুজে মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

ঠিক যেই নিতাইদের বাড়ির পেছনের সেই ঝাঁকড়াচুলো ঝোপটার কাছে এসেছি, পকেট হাতড়ে দেখি যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! সেই কোনা-মোড়া আধ-ময়লা নোটটা কে যেন বুক-পকেট থেকে তুলে নিয়েছে!

ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। ভয়ের চোটে কোট খুলে, শার্ট-প্যান্ট ঝেড়ে-ঝুড়ে ভালো করে খুঁজে দেখলাম। জুতো-মোজা খুলে তার ভেতরে হাতড়ে দেখলাম।—কোথাও কিছু নেই।

গলা শুকিয়ে গেল। বাবা যে রোজ বলেন আমার আলজিবটা আর টনসিল-দুটো বেড়ে-বেড়ে গলার ফুটো একেবারে বন্ধ করে ফেলেছে, এ কথা যে সত্যি তা টের পেলাম। চুলগুলো শির্-শির্ করে একে-একে সব উঠে দাঁড়াল, আর তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা মতন কিসের হাওয়া বইতে লাগল। আজকে ঐ নোট হারানো মানে একেবারে আমার সর্বনাশ হওয়া। পিসিমা বার বার বলে দিয়েছেন—তাঁর সেমিজের ছিট ছ-গজ, তাঁর নাতির হাতওয়ালা গেঞ্জি দুটো, হলদে জুতো একজোড়া—আমার মাপের হলেই চলবে, এই-সব কিনে যদি কিছু বাকি থাকে, সেই দিয়ে আমার সেই রঙিন খড়ির বাক্স কিনতে পারি। আর, সে বাক্স আজ না কিনলে, কাল ইস্কুলে আমার যে কি অবস্থা হবে, তা জানবে শুধু গোবিন্দবাবু আর আমি, আর ক্লাসের বাকি উনত্রিশটা ছেলে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি কি কি করেছিলাম, ভালো করে ভেবে দেখলাম। গেটের বাইরের সেই আশ্চর্য লোকটার কথা টপ্ করে মনে পড়ে গেল। এখন মনে হল, তার মুখটা কেমন চোর-চোর মতন। তখন বুঝতে পারি নি; ভেবেছিলাম—চেনা-চেনা লাগছে কেন? মনে পড়ল যে শুনেছি, কানের লতিটা ঝুল্‌ঝুল্ না করে মাথার সঙ্গে জোড়া থাকলে বুঝতে হবে লোকটা সুবিধের নয়। তায় আবার চোখদুটো সরু-সরু লম্বা-লম্বা, নাকের দু-পাশে খুব কাছাকাছি পিট্-পিট্ করছে। ঝাঁটার মতো গোঁফ, তিনদিনের দাড়ি। ও-ই চোর না হয়ে যায় না। ওর

সারা মুখে যেন তাই লেখা আছে।

আমি কেন তখন টের পাই নি? সে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে বলেছিল, "দেশলাই আছে?" আমি রেগে বলেছিলাম—"আমি বিড়ি খাই না।" সে বলেছিল, "বিড়ির জন্য নয়; আমারও গুরুদেবের বারণ আছে। হুঁকো?—হ্যাঁ; চুরুট—হ্যাঁ; পাইপ?—হ্যাঁ; কিন্তু বিড়ি কখনো না। আমার একটা দরকারি কাগজ পড়ে গেছে কিনা, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, তাই?"

তখন দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা খুঁজলাম। নিশ্চয় সেই সময়ে কখন টুপ্ করে আমার সেই কোনা-মোড়া আধ-ময়লা দশ-টাকার নোটখানি সে তুলে নিয়েছে। মনে হল 'পেয়েছি' বলে সে এমনি হঠাৎ ঘুরেছিল যে, আমি তার পেছনের ধাক্কা খেয়ে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়েছিলাম। সে-ই যে চোর—এর কোনো সন্দেহ নেই।

তখুনি ফিরে তার সন্ধানে চললাম। অন্ধকারে তাকে চিনতে না পেরে একেবারে তার উপর দিয়ে আরেকটু হলেই হেঁটে যাচ্ছিলাম। সে জামা-টামা ঝেড়ে বলল, "কিছুতে তাড়া করেছে নাকি?" আমি বললাম, "না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করল।"

সে কিছু না-বলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার এগুতে লাগল।

পথে তার সঙ্গে অনেক কথা হল, কিন্তু আমার মনটা তার বুক-পকেটের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল।

একটু দূরে বাস-স্টপের কাছে এসে বলল, "আর হাঁটা যায় না। চল, বাসে যাই।"

দুজনে বাসে উঠলাম, পাশাপাশি বসলাম। কণ্ডাক্টর পয়সা চাইলে, সে-ই দুজনের হয়ে টিকিট কাটল; ভাবলাম—হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, তা আর কাটবে না?

দুজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। এক দিক দিয়ে ভালোই। আমি চাই সে ঘুমোয়, আবার আমি সুদ্ধু ঘুমিয়ে পড়লে তো চলবে না। সে চাই কি আমার জুতোজোড়াটা হয়তো পা থেকে খুলে নিয়ে নেমে পড়বে। কণ্ডাক্টরের তো উপর দিকে এত বড় পাগড়ি আর নীচের দিকে এত বড় দাড়ি যে, কিছু দেখতে পায় কিনা সন্দেহ।

তাই আমি তাকে মামাবাড়িতে ডাকাত পড়ার একটা গল্প বানিয়ে

বানিয়ে আস্তে আস্তে একটানা সুরে বলতে লাগলাম, আর সে একটু অন্য দিকে তাকালেই আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়াতে লাগলাম, যাতে সে শিগ্‌গির ঘুমিয়ে পড়ে। সেই একঘেয়ে গল্পের চোটে আমার সুদ্ধ ঘুম পেতে লাগল।

হঠাৎ চমকে দেখি, সে তার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘুমোচ্ছে, মাথাটা বাসের ঝাঁকুনিতে একটু করে নড়ছে, আর বুক-পকেটটা একটু হাঁ হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে ভাঁজ-করা একটা কোনা-মোড়া আধ-ময়লা দশ-টাকার নোট!

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আমি এদিক-ওদিক দেখে হঠাৎ টুপ্‌ করে সেটি তুলে নিলাম।

প্যান্টের পকেটে সবে পুরেছি, বাসটা একটা ঝাঁকুনি দিল আর সেও সোজা হয়ে বসে চোখ রগড়াতে লাগল। আমি যত জোর করে আমার চোখদুটোকে অন্য দিকে ঘুরোতে চাই, সে-দুটো তবু ফিরে-ফিরে ওর ঐ হাঁ করা পকেটের দিকে তাকায়।

বাস থেকে নেমে বাঁচলাম। সে এক দিকে চলে গেল, আমি আরেক দিকে চলে গেলাম। ছিট কিনলাম, গেঞ্জি কিনলাম, জুতো কিনলাম, খড়ি কিনলাম। যতক্ষণে বাড়ি ফিরলাম, সেই লোকটার কথা ভুলেই গেছি।

বাড়ি এসে পিসিমাকে জিনিসপত্র দিয়ে ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে খড়ি রাখতে যাব, যা দেখলাম তাতে আমার একেবারে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! পেটের ভিতর কিরকম করতে লাগল, টনসিল দুটো আবার বড় হয়ে গলাটাকে ঠুসে ধরল!

দেখলাম—দোয়াত চাপা দেওয়া কোনা-মোড়া আধ-ময়লা দশ-টাকার নোটটা—সেই যে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে জুতো পরবার সময় যেমন রেখেছিলাম, ঠিক তেমনটি রয়েছে!

সেই লোকটার পকেট থেকে নেওয়া ও খরচ-করা সেই নোটটার কথা মনে করে আমার হাত-পা যেন পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল।

কাকে কি বলব?

টাইগার

তাকে উলটে দেখলাম থাবার তলাটা গোলাপী মখমলের মতো, মাঝে-মাঝে কচি-কচি সাদা লোম। পেটের তলাটাও গোলাপী—নরম তুল্‌তুলে এক জায়গায় একটা শিরা না কি যেন ধুক্‌ধুক্‌ করছে। মুণ্ডুটাকে তুলে আবার নিজের পেট দেখতে চেষ্টা করছে, চোখ দুটো বিল্‌-বিল্‌ করছে। মুখের কাছে তুলে ধরতেই কচি একটা লাল জিব বের করে আমার গাল-গলা চেটে দিতে লাগল। আঃ!

একটু দুধ পেলে বেশ হত। খুকুর বাটিটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি গেলাম রান্নাঘরের দরজার কাছে।

"ও পিসিমা, একটু দুধ দেবে?" পিসিমা হাসি-হাসি মুখ করে হাতা ভরে দুধ নিয়ে দরজার কাছে এলেন।

"খিদে পেয়েছে বুঝি, দেখি বাটি!"

বাটি এগিয়ে দিলাম।

পিসিমা হাতা হাতে অবাক হয়ে আমার বগলের দিকে চেয়ে রইলেন।

"ছি, ছি, ওটাকে ফেলে দে বলছি! ভারি নোংরা জানোয়ার, ঘর-দোর একাকার করবে এখুনি!"

বাচ্চাটাকে তুলে ধরলাম, "দ্যাখ, পিসিমা, কিরকম গুল্‌গুল্‌ করে তাকাচ্ছে। দাড়ির নীচের খাঁজগুলো দ্যাখ!"

পিসিমা দুধের হাতা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু হাত সরে গেলেন—"আহা, কি করিস, কি করিস, রান্না করছি যে! ভালো চাস তো যেখান থেকে এনেছিস সেখানে দিয়ে আয়!"

বাচ্চাটাকে নীচে নামিয়ে দিলাম। লাল একটা ক্ষুদে জিব দিয়ে চুক্‌চুক্‌ করে মাটি থেকে দুধ চেটে খেতে লাগল। পিসিমা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

পিসিমা বললেন—"তোমার বাবা একবার দেখলে হয়! এমনিতেই বিষম রেগে আছে, তোমার দাদা-রত্নটি অঙ্কে বারো পেয়েছে। তাই

নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয়ে গেছে। এখন ছুটির দিনে, চাঁদ, তুমি এলে নেড়িকুত্তোর বাচ্চা কোলে করে। তাও যদি মোটাসোটা সাদা রঙের হত! তোমার কপালে আজ কি আছে কে জানে! তোমার রিপোর্ট এসেছে? যাও-না উপরে, কি হয় দেখো!"

বিষম রাগ হল। বাচ্চাটাকে তুলে নিতে চেষ্টা করলাম।

"পিসিমা ভালো না, খাস না ও দুধ। আমি তোকে ভালো দুধ কিনে দেব।"

কিন্তু বাচ্চাটা কিছুতেই ছাড়বে না, ভীষণ ভাবে দুধ চেটে সাফ করে দিতে লাগল।

"ওঃ, লবাব! মাস-কাবারে পাস তো একটা টাকা। তাও তো খেয়ে-দেয়ে দেনায় ডুবে থাকিস! উনি আবার দুধ কিনবেন!"

জোর করে বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম।

"আচ্ছা আচ্ছা, দ্যাখা যাবে, দুধ কিনতে পারি কি না দ্যাখা যাবে। আর, কি রিপোর্টের ভয় দ্যাখাচ্ছ? আমার রিপোর্ট কোথায় হারিয়ে গেছে।"

পিসিমা আঁৎকে উঠলেন—"রিপোর্ট হারিয়ে গেছে কি রে? ওরে শোন্-না, আবার কোথায় চললি—"

আমি উঠোন পার হয়ে, চৌবাচ্চার পাশের খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে, আস্তে আস্তে পিছনের বাগানে গেলাম।

পেয়ারাগাছ তলায় দাদা চুপ করে শুয়ে আছে। নিচু ডালে দুটো ইয়া বড়া-বড়া পাকা পেয়ারা ঝুলছে, দাদা সেগুলো পাড়ছে না।

আমি কুকুর-বাচ্চা কোলে নিয়ে সে দুটো পেড়ে দাদার পাশে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলাম। কুকুর-বাচ্চাটাকে আমার সামনে বসালাম। সে দুটো ছোট-ছোট থাবা গেড়ে উঁচু হয়ে বসে, ঘাড় কাত করে অবাক হয়ে দাদাকে দেখতে লাগল।

দাদা মুখ তুলে রেগে-মেগে বলল, "যা এখান থেকে। চান কর গে, ভাত খা গে।"

আমি বললাম, "তুমি করবে না?"

"না, যা বলছি এখান থেকে, নইলে ভালো হবে না!"

কুকুর-বাচ্চাটা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাদার কান চাটতে লাগল। দাদা চমকে, হাত-পা ছুঁড়ে, একেবারে উঠে বসল। ইস্, মুখটা কি

দাদা ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে বাচ্চাটাকে বুকের উপর বসিয়ে রেখেছিল।

লাল টকটকে। দাদা হাঁ করে কুকুর-বাচ্চাকে দেখতে লাগল। সে দাদার হাঁটুর উপর ক্ষুদে মাথাটা রেখে সরু দড়ির মতো ল্যাজটা নাড়তে লাগল। দাদা শেষটা ওর মাথায় হাত বুলোল, ওকে কোলে তুলে নিল, ওর পেটে মুখ গুঁজে দিল।

তার পর ওকে কোলের উপর নামিয়ে রেখে বলল, "দে তো একটা পেয়ারা। ইস্, কি বড়-বড় হয়েছে এই কদিনে!" দুজনে পেয়ারা দুটো খেয়ে ফেললাম, বিচি-টিচি সব গিলে ফেললাম।

দাদা বলল, "পেয়ারা গাছের ছায়াটা পাঁচিলের কাছে চলে গেছে। কত বেলা হয়ে গেছে। তুই যা, চান কর।"

আমি মাথা নাড়লাম।

দাদা বলল, "খাবি না?"

"না, আমার পেটব্যথা হয়েছে।"

"বাচ্চাটা খাবে না?"

"পিসিমার কাছ থেকে দুধ নিয়ে খাইয়েছি। পিসিমা হয়তো বাবাকে বলে দেবে, তা হলে হয়তো বাবা ওকে রাখতে দেবে না।"

দাদা ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে বাচ্চাটাকে বুকের উপর বসিয়ে রেখেছিল।

"তবে কি হবে?"

"হয়তো বলবে না। দাদা, মা থাকলে বেশ হত, কেন যে মা আবার মামাবাড়ি গেল। কি বাজে জায়গা, কেন যে যায়!"

দাদা চোখ বুজে কুকুরটাকে বুকে চড়িয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

"কি নাম রাখা যায় বল তো?"

দাদা চোখ খুলে বলল, " 'টাইগার' বেশ নাম।"

আমি বাচ্চাটাকে শূন্যে উঁচু করে ধরে বললাম—

"এই টাইগার। বুক তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়া। টাইগার হয়েছিস, ব্যাঘ্র হয়েছিস।"

টাইগার শূন্যের উপর ল্যাজ নাড়তে চেষ্টা করতে লাগল। পিসিমা উঠোন থেকে আমাকে ডাকতে ডাকতে খিড়কি দরজা অবধি এলেন। দাদা বলল—

"যা শিগ্‌গির!" বলেই কাঁটা-ঝোপটার পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

আমি আস্তে আস্তে পা টানতে টানতে পিসিমার কাছে গেলাম।

"আচ্ছা ছেলে বাপু তুমি! বারোটা বাজল, স্নান নেই, খাওয়া নেই! তোমার মা এলে আমি বাঁচি!"

আমি বললাম, "মা এলে আমিও বাঁচি। আমার অসুখ করেছে, আমি স্নানও করব না, খাবও না।" বলে আমি খুব খানিকটা কেঁদে-টেঁদে পিসিমাকে ব্যস্ত করে তুললাম।

শেষটা গরম জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মুছে কাপড় ছেড়ে শুতে গেলাম। দাদা যে কোথায় গেল?

পিসিমা বললেন, "যাই বাবা, খাওয়ার পালা সেরে আসি। বেশ ছুটির দিনটা কাটছে! একজনের অঙ্কে বারো পেয়ে খাওয়া বন্ধ, একজনের শরীর খারাপ, বাপ গেলেন মাছ ধরতে। যাই আমি একাই খানিকটা গিলে আসি।"

তাই বল! দাদা অঙ্কে বারো পেয়েছে বলে দাদার খাওয়া বন্ধ। কাল দাদা আমাকে কয়েকটা রঙিন খড়ি দিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলাম।

পিসিমা খেয়ে দেয়ে এসে, পাশের ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। আমাকে ডেকে বললেন—"কুকুর-বাচ্চাটার কি করলে? ও-সব নোংরা জিনিস ঘাঁটো বলেই তো শরীর খারাপ হয়। এখন থাক চুপ করে শুয়ে, তোমার রিপোর্ট হারানোর কথা শুনলে তো আছে বিকেলে আরেক পালা। তোমরা দুটি ভাই দুটি মানিক-জোড়! নাও, এখন ঘুমোও তো!"

একটু পরেই সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পাখি উড়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ করে পিসিমা নাক ডাকাতে লাগলেন।

আমিও উঠে পড়ে বাগানে চলে গেলাম। দাদা কাঁটাঝোপের ছায়ায় টাইগারকে নিয়ে খেলা করছে। বললাম—"দাদা, চল, টাইগারকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া যাক!"

দাদা বললে, "কোথায় যাবি?"

"কেন মামাবাড়িতে, মার কাছে। ওরা টাইগারকে দেখে খুব খুশি হবে। ওরা কুকুর ভালোবাসে, বেড়াল ভালোবাসে, কাকাতুয়া ভালোবাসে, খরগোশ ভালোবাসে। চল দাদা, হেঁটেই চলে যাওয়া যায় না?"

দাদা মাথা নাড়ল, "না রে, সে অনেক দূর। জানিস, আমার এ-বছর সার্কাস দ্যাখা বন্ধ, সিনেমা দ্যাখা বন্ধ, আসছে রবিবার মা এলে

তোরা সবাই পিকনিক যাবি, আমি যাব না।"

আমি উঠে পড়ে দাদার হাত ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে অনেকটা এগিয়ে আনলাম।

"দাদা তুই একটা স্টুপিড্‌! অঙ্কে বারো পাস কেন। আমি তো বত্রিশ পেয়েছি।"

দাদা কোনো উত্তর না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।

কুকুর-বাচ্চাটা এ-সব দেখে মহা কেঁই-কেঁই জুড়ে দিল। তাকে আবার কোলে নিতে হল।

দাদা বলল—"ওকে কোথায় পেলি?"

"শিকাদারদের মালী ওকে বেচে দিয়েছে। ওর মার সাতটা বাচ্চা হয়েছিল। একটা রেখে সব-কটা বিলিয়ে দিয়েছে। বুড়ো শিকদারমশাই নাকি বলেছেন, একটা রেখে সব-কটাকে জলে ডুবিয়ে দাও।"

"ই-স্‌! কি নিষ্ঠুর!"

"মালী কিন্তু জলে ডুবোয় নি। চার-আনা করে দামে বেচে দিয়েছে। বলেছে নাকি বিলিতি কুকুরের খুব দাম হয়। আমি চার-আনা দিয়ে ওকে কিনেছি।"

"পিসিমাও ওকে রাখতে দেবে না, আর বাবাও দেবে না। কুকুর-বাচ্চা কেন জন্মায়?"

"এই টাইগার, তুই জন্মালি কেন? তোকে কেউ চায় না।" টাইগার তাই শুনে আনন্দের চোটে আমার কোলে নেচে-কুঁদে, ল্যাজ নেড়ে, ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে একাকার। দাদাকে বললাম—"বাবা কক্ষনো ওকে রাখতে দেবে না, দাদা। আমার রিপোর্টটা কোথায় হারিয়ে গেছে।"

দাদা বিরক্ত হয়ে টাইগারকে একটু ঠেলে দিল, টাইগার মহা খুশি হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে, দাদাকে খেলা করে কামড় দিতে লাগল। ছোট্ট ইঁদুরের ল্যাজের মতো ল্যাজ, নড়ে নড়ে খসে পড়বার জোগাড়!

দাদা রাগ-রাগ গলায় বলল—"জেনে-শুনে আনলি কেন? বাবা যদি রামদীনকে বলে ওকে জলে ডুবিয়ে দিতে?"

"ইস্‌, বাবা কক্ষনো বলবে না।"

"আজ বলতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

দাদা টাইগারকে কোলে নিয়ে বলল—"চল, চলে যাই। বাবা বলেছে আমার লেখাপড়া হবে না। তা হলে তোরও বোধ হয় হবে না। হেঁটে-হেঁটেই মামাবাড়ি চল। কত লোক তো হেঁটে-হেঁটে জগন্নাথ দেখতে পুরী যায়।"

তখন আমরা আস্তে-আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার পায়ে জুতো ছিল, আমার খালি পা, হাঁটতে-হাঁটতে বিকেল হয়ে গেল। আমার জল-তেষ্টা পাচ্ছিল, পা ব্যথা করছিল। কত সব বাড়ি-টাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেলাম, পাড়াগাঁ সব এসে গেল। এক জায়গায় একজনের বাড়িতে জল খেলাম, টাইগারও খেল।

বিকেল হয়ে গেল, সন্ধে হয়ে গেল। দাদা হাঁটছে তো হাঁটছেই। শেষটায় আমি একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। "দাদা, আমি আর হাঁটতে পারছি না।"

দাদা আমার পাশে বসে আমার পায়ের গুলি টিপে দিতে লাগল। আমি কোলের উপর টাইগারকে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসলাম, আর দাদা আমার পা টিপে দিল। শেষটা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন রাত আটটা-নটা হবে, বাবা এসে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখল গাছতলায় তিনজনে ঘুম লাগাচ্ছি।

দাদা গাড়িতে উঠে টাইগারকে জাপটে ধরে বাবাকে বলল—"খুব ভালো বিলিতি কুকুর বাবা। মণ্টু চার-আনা দিয়ে কিনেছে। বড় হয়ে খুব ভালো শিকারী-কুকুর হবে। আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে।"

বাবা কিছু না-বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

তখন আমি কেঁদে ফেললাম—

"তুমি কি ওকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে? ওর নাম টাইগার।"

বাবা খ্যাঁচ্ করে গাড়ি থামিয়ে আমাদের বলল—"কেন, আমি কি একটা পাষণ্ড?" আমরা কেউ কিছু বললাম না দেখে আরো বলল— "বেশ নাম টাইগার। একটা কলার কিনতে হবে, লাইসেন্স করাতে হবে।"

আমি বললাম, "লাইসেন্স কেন করাতে হবে বাবা? গাড়ির লাইসেন্স তো আছে।"

দাদা বলল, "স্টুপিড্! ফুল!"

বাবা বলল, "আমি যখন ছোট ছিলাম, একটা নেড়িকুত্তোকে বাড়িতে এনেছিলাম। আমার বাবা তাকে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে

দেবে না, সেও কিছুতেই যাবে না। রোজ আমাদের দারোয়ান তাকে ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিত, আর রোজ সে ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসত। শেষটা দারোয়ানের ভাই একদিন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। লোকটা ভালো ছিল। ঐ কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম বাঘা।"

টাইগার কি বুঝল জানি না, এই পর্যন্ত শুনে হঠাৎ বাবার কনুই কামড়ে দিল। আমি তো ভয়ে আধমরা। বাবা জায়গাটা একটু ঘষে বলল, "আরে! ব্যাটার তো এরই মধ্যে খুব দাঁতের জোর হয়েছে!"

প্রশংসা পেয়ে টাইগার আহ্লাদে আটখানা হয়ে মাথা দিয়ে বাবাকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল।

লোমহর্ষণ

রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে দরদালানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, খিদেয় পেটের এ-দেয়াল ও-দেয়াল একসঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, টেবিল পাতা, সোনার বাসন-কোসন সাজানো, মুক্তো-বসানো গেলাসে কেয়ার গন্ধ-দেওয়া জল, রানী ওদিকে মখমলের গদির উপর বসে চাকুম্‌চুকুম্ আওয়াজ করছেন, অথচ খাবার দেবার নাম নেই।

মন্ত্রীমশাইয়েরও জিব শুকিয়ে ঘুঁটে, বিশেষ কিছু মুখে বলছেন না বটে কিন্তু পেটের মধ্যে কি যে হচ্ছে দেবতারাই জানেন।

অগত্যা আর থাকতে না পেরে রাজামশাই মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রী, যাও তো একটু অনুসন্ধান কর!" মন্ত্রী পাশের ঘরে গিয়ে লাল পোশাক-পরা প্রহরীদের বললেন, "খবর নিয়ে আয়।"

তারা রান্নাবাড়ির সদর দরজায় ভাণ্ডারীমশাইকে বললে, "খাবার দেয় না কেন খবর নিন।"

তিনি বাবুর্চিখানার বাইরে দাঁড়িয়ে নাক টিপে দরজার ভিতর মুণ্ডু ঢুকিয়ে বললেন, "খাঁবার দেঁতা নেই কাঁইকু?"

খাস খানসামা সাজ-পোশাক-পরা মোটাসোটা বাঙালি মানুষ, হাতের উপর রেশমী ঝাড়ন নিয়ে দৌড়ে এসে বললে, "চপ, কাটলেট, স্যুপ, স্যালাড সব তৈরি, ছোকরা বেল্ দেয় না, তাই খাবার দিতে পারছি না!"

"যাও, দ্যাখ, কেন ঘণ্টা দেয় না।"

খাস খানসামা ছোট খানসামাকে বললে, "যাও, দ্যাখ, ছোকরা কোথায় গেল।"

ছোট খানসামা ঘণ্টাতলায় গিয়ে দ্যাখে ছোকরা সেখানে ঘণ্টাগাছে ঠেস দিয়ে কি একখানা বই পড়ছে, তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চুল খাড়া হয়ে আসছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। বই কেড়ে, তার দুই কান আচ্ছাসে পেঁচিয়ে, ঘণ্টার দড়িতে কষে টান লাগিয়ে, ছোট খানসামা রান্নাবাড়ির দিকে এগুলো। চলতে চলতে বই তুলে দ্যাখে লোমহর্ষণ সিরিজ ২২ নং। মলাটের উপর দ্যাখে গুহা থেকে মুখ বের করছে বিকট ভয়ংকর একটা কি যেন।

খাস খানসামা ছোট খানসামার দেরি দেখে দোর গোড়া পর্যন্ত ছুটে গিয়ে দ্যাখে গোল-গোল চোখ করে কি একখানা বই পড়তে-পড়তে হোঁচট খেতে-খেতে সে আসছে। তার মাথায় দুই গাঁট্টা লাগিয়ে, বই কেড়ে নিয়ে, খাস খানসামা খাবার পরিবেশন করতে ছুটল।

রাজামশাই রানীমা মন্ত্রীমশাই, স্যুপ, চপ, কাটলেট, স্যালাড খেয়ে বসে আছেন, খাস খানসামা আর রাজভোগ আনে না। কোনো বিপদ হল না তো, হঠাৎ কোনো শত্রু এসে রাজভোগ খেয়ে ফেলল না তো? মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দ্যাখেন রাজভোগের থালা জানলার উপর নামিয়ে রেখে খাস খানসামা কি একখানা বই পড়ছে আর তার মাথার প্রত্যেকটা চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। রাগের চোটে মন্ত্রীমশাই ছুটে গিয়ে বই কেড়ে নিয়ে, সেটাকে পকেটে পুরে নিজেই হাতে করে রাজভোগের থালা এ ঘরে আনলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর পশ্চিম দেশ থেকে সাহেবদের দূতেরা এসেছে, তাদের সঙ্গে মেলা কথাবার্তা আছে। রাজামশাইয়ের বসে-বসে পায়ে খিল ধরে গেল, দূতদের হেসে-হেসে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, মন্ত্রীমশাই আসেনও না, কাজের কথাও পাড়া হয় না। শেষটা আর থাকতে না পেরে রাজামশাই বেরিয়ে গিয়ে দ্যাখেন, বারান্দার ঝাড়লণ্ঠনের তলায় দাঁড়িয়ে এক হাতে কি একটা বই নিয়ে মন্ত্রীমশাই নিবিষ্ট মনে পড়ছেন, আর উত্তেজনার চোটে অন্য হাত দিয়ে মুঠো-মুঠো দাড়ি ছিঁড়ে চার দিকে ছড়িয়ে ফেলেছেন।

রাজা রেগে-মেগে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে,

ঘরে গিয়ে সেটার উপর চেপে বসলেন, মন্ত্রীও সুড়্‌সুড়্‌ করে নিজের জায়গায় গিয়ে কাজের কথা পাড়লেন।

কথাবার্তা সেরে দূতরা কখন অতিথিশালায় চলে গেছে, মন্ত্রী বাড়ি গেছেন, কিন্তু রাজামশাই আর অন্দর-মহলে আসেন না। শেষটা সখীরাও সবাই হাই তুলছে দেখে রানী রেগে দুম্‌দুম্‌ করে সভাঘরে গিয়ে দ্যাখেন, সিংহাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে রাজামশাই কি একটা বই পড়ছেন, আর তাঁর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, কান দুটো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। রানী রেগে অন্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে রাজার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে তাঁকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে রাগে অভিমানে কেঁদে-কেটে গোঁসাঘরে গিয়ে খিল দিলেন। গোঁসাঘরের খাস দাসী তাঁর চুল বেঁধে দিল, রাত-কামিজ এনে দিল, বালিশটাকে আরেকটু উঁচু করে দিল, গন্ধতেলের প্রদীপটা একটু কাছে টেনে দিল। রানী তখন বালিশের তলা থেকে লোমহর্ষণ সিরিজ ২২ নং খানা বের করে দাসীকে বললেন, "তুই আমার চুলে বিলি কেটে দিস না, পায়ের আঙুলগুলো আস্তে-আস্তে টেনে দিস না, এখান থেকে ভাগ্‌। যেখান থেকে পারিস ২৩ নং খুঁজে রাখিস।" বলে বইখানি খুলে নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগলেন, আর আস্তে-আস্তে তাঁর ভুরু কপালে উঠে যেতে লাগল, মুখ হাঁ হয়ে যেতে লাগল।

বিদেশী গল্প অবলম্বনে

ভালোবাসা

আজকাল সবই অন্যরকম লাগে। দরজার কড়া নাড়বামাত্র ভিতর থেকে একটা ভারী জিনিস দরজার উপর আর আছড়েও পড়ে না; নখ দিয়ে কেউ দরজায় আঁচড়িয়ে, পালিশ উঠিয়ে, বকুনিও খায় না; ঘরে ঢুকবামাত্র নেচেকুঁদে গায়ের উপর চড়ে একাকারও করে না। মিনু শংকর কেউ কারো দিকে তাকায় না।

শোবার ঘরের মেজেটা অদ্ভুতরকম খালি-খালি লাগে; অদ্ভুত চুপচাপও, খচ্‌মচ্‌ করে কেউ চলে বেড়ায় না, থপ্‌থপ করে কানের

উপর ল্যাজ আছড়ায় না।

শুধু পিসিমা একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "আঃ, আপদটা বিদায় হয়ে ঘরদোরগুলো যেন কেমন হালকা হয়ে গেল। এবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে হাত-পা মেলে বসা যাবে। সদাই ভয়ে-ভয়ে থাকতাম ঐ বুঝি ক'ন্ থেকে কিসে মুখ দিয়ে আমায় এসে চাটল। আর তোদেরও বাবু বলিহারি! ঠাকুরদা ত্রিসন্দে জপতপ না সেরে জলস্পর্শ করত না, আর তোদের কিনা ঐ কুত্তোটার সঙে একপাতে না খেলেই নয়। অস্বীকার করিস নে, স্বচক্ষে দেখেছি টেবিল থেকে সব চুপি চুপি প্লেট নামানো হচ্ছে!"

মিনু শংকর কেউ অস্বীকার করল না; কোনো কথাই বলল না। নিঃশব্দে যে যার বই বের করে নিয়ে পড়তে বসে গেল। সাবধানে ঘুরে বসল যাতে আলমারির ঐ কোণটাতে যেখানে পুরনো সবুজ কম্বল-খানি পাতা থাকত সেদিকে চোখ না পড়ে!

পিসিমার কথা শুনে বাবা দোরগোড়ায় একবার দাঁড়িয়েছিলেন, এবার তিনিও নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। শুধু মা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, আর তার জন্য কোনো হাঙ্গামা নেই।"

পিসিমা একটু অবাক হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "হাঙ্গামাও নেই, বউ, খরচাও নেই। ওর পেছনে তোমরা এ ক-বছরে যা খরচ করেছ, তাতে এক-আধটা গরিব ছেলের স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরা চলে যেত। সেজদিদিরাও বলছিল, তোমাদের সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। কুকুরের জন্য রোজ রোজ দুধ রে, পাঁউরুটি রে, মাংস রে—এ-সমস্ত বাড়াবাড়ি।"

মিনু শংকর আস্তে আস্তে বই হাতে করে উঠে গেল! মা বললেন, "তা হলে জন্তু-জানোয়ার না পোষাই উচিত, ঠাকুরঝি!"

"হ্যাঁ, পুষতে হয়, গোরু মোষ পোষ, দুধটা পাবি। নিদেন একটা ছাগলই পোষ, তার দুধেরও ভারি গুণ, মহাত্মাজি খেতেন। নয়তো বেড়াল পোষ, ইঁদুর মারবে। তা নয়, এ কোথাকার লাট রে বাবা, ইঁদুর-বাঁদরের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি ঐ মিনু শংকরের পিছন পিছন ঘুর্-ঘুর্ করবে!"

মা বললেন, "ওরা বাড়ি পৌঁছবার অনেক আগে থাকতেই কেমন করে জানি টের পেত। অমনি উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।"

পিসিমা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন, "যাই বাবা, আমারও তো পুজো-আচ্ছা আছে!"

সবার পাতে মোটা-মোটা হাড়গুলো সব পড়ে থাকে, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়! সবাই লক্ষ্য করে, কেউ কোনো কথা বলে না। সন্ধেবেলা বাবা একবার বলে বসলেন, "আর কুকুর পুষব না। বাঁচেও না বেশিদিন, শুধু হাঙ্গামা বাধায় আর মায়ায় জড়ায়।"

মা বললেন, "আমিও সেই অবধি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, আর কখনো নয়।" এতক্ষণ পরে মিনু শংকরের কথা ফুটল; দুজনে জোর গলায় বলে উঠল, "সত্যি মা, আর কখনো নয়।" শংকর আরো বলল, "জানো, রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়, কিরকম নিঃশ্বাস ফেলা শুনতে পাই, ভুলে যাই, উঠে পড়ে দেখতে যাই ও ঘুমুচ্ছে কি না।"

পিসিমা ঘরে এসে শেষ কটি কথা শুনে বললেন, "হয়েছে! বলি, তোদের পিসেমশাই স্বর্গে গেলেন, কই তাঁর নিঃশ্বাস তো একদিনও শুনলাম না, আর তোরা তোদের কুকুরের শোকেই যে হেদিয়ে গেলি! এবার আবার একটিকে এনে দুঃখ ভোলা হবে নাকি?" বাকি চারজনে সমস্বরে বলে উঠল, "না, না, না, আর কখনো নয়।"

"যাক, তবু যে সুবুদ্ধি হল সেই রক্ষে। পই-পই করে বলি নি ও-সব জন্তু-জানোয়ার ঘরে এনে ঢোকাস নি রে বাবা! যত সব রোগের ডিপো। এই কোলে এসে মাথা রাখছে, এই গায়ের উপর থাবা রাখছে, উঃ, দেখে দেখে আমার গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করে উঠত। তা বাপু কিছু বলবার কি জো ছিল?"

মিনু শংকর একটু অস্বাভাবিকরকম জোরে বলল, "যাক, এখন তো আর সে নেই, এখন খুশি হয়েছ তো?"

এমনি করে দিন কাটে। পিসিমা ঝিকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁলা, ওটার বাসনকোসনগুলো ফেলে দিয়েছিস তো? নইলে আবার অন্য বাসনের সঙ্গে তুলে রাখলে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে। কোনোই তফাত তো নেই। যত সব আদিখ্যেতা এদের।" ঝিও একগাল হেসে বলল, "কে জানে, পিসিমা, দিয়েছে হয়তো ফেলে। উঃ, কি বলব পিসিমা, হিঁদুর মেয়ে আমি, আমাকে পর্যন্ত ঐ কুত্তোর সেবায় লাগিয়ে দিয়েছিল! হ্যাঁ সায়েবরাও কুকুর পোষে বটে, কিন্তু তার কাজ করে জমাদার! আর হেথা ঘাটেও আমি, গঙ্গাতেও আমি। তা মন্ত্র দিয়েছেনও

এটা-সেটা আমাকে, মিথ্যে বলব নি। আর আমিও বাসনটা মেজে দিয়েছি, কম্বলটা কেচে দিয়েছি। ও-সব আর এখন করতে হচ্ছে না, বেঁচিছি।”

এক মাস বাদে ঐ ঝিই একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “কি জানেন পিসিমা, মনটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ঐ যে ছাদের কোণে লাঠিগাছটি দেখছেন ঐটে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াত। আর সকাল-বেলায় উঠোনের দুয়োর খুলে ভিতরে যেই-না ঢুকেছি, সে কি ন্যাজ নাড়ার ধুম! সত্যি বলছি মা, আমায় দেখে আর কেউ অমনটি খুশি হয় নি কোনো জন্মে, অথচ কিচ্ছু তো পেত না আমার কাছটিতে। হ্যাঁ, পিসিমা মারা কি আর-একটা আনবে-টানবে না?”

পিসিমা এমন একটি চেলা হারিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, “না রে বাবা, আর দরকার নেই। ওরা চারজনেই প্রতিজ্ঞা করেছে আর কক্ষনো নয়।” ঝি আর-একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “কি জানি, ডাক্তারবাবু একদিন বলেছিলেন, “যাঁরা কুকুর নিয়ে একবার বাস করেছেন, তাঁরা কুকুর ছাড়া আর থাকতে পারেন না। বড় আদুরে ছিল, পিসিমা, আমাকে দেখলেই এত খুশি হত, ধপাধপ্ শব্দ করে ন্যাজটা নাড়ত।”

পিসিমা রবিবার সকালে কথাটা একবার নিজেই পেড়ে, সবাইকে যাচিয়ে নিলেন।

হ্যাঁরে নতুন খবর শুনছিস? ঐ পাতির-মা কুকুরের সঙ্গে এ্যাদ্দিন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চালিয়ে এসেছে, এখন ওর নাকি ভারি মন কেমন করে। তা আমিও বলে দিয়েছি, বাপু, সে মনই কেমন করুক কি যাই করুক আর নয়।”

কেউ কোনো কথা বললে না। আরো কদিন কাটল। একদিন ডাক্তারবাবু এসে বললেন, “কি, কুকুরের শোক কমল? ভালো ভালো কুকুরের ছানা বিক্রি হচ্ছে যে।” মার জন্মদিন আজ, সবাই বড় ব্যস্ত। মা সমানে কিসমিস বেছে যেতে লাগলেন, অম্বলে পায়েসে ঘিভাতে লাগবে। শংকর মিনু পরস্পরের দিকে তাকাল আর বাবা একবার খবরের কাগজটা নামিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে নিয়ে, আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেলেন। শেষে মা বললেন, “আবার কুকুর!”

প্রথমে এল মিনু আর শংকর কাপড়ে করে কি ঢাকা দিয়ে।

সন্ধের মধ্যে রাঁধাবাড়া সেরে, ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবার হুকুম মতো মা স্নান করে, নতুন কাপড়খানি পরে বসেছেন। পিসিমা খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ এই বেশ হয়েছে, বউ! আচ্ছা এদের কাউকে দেখছি না যে, সব গেল কোথায়?"

"কি জানি, সব একে একে তো বেরুল। ঐ যে ঠাকুরঝি, এক-আধজন এল বোধ হয়।"

প্রথমে এল মিনু আর শংকর কাপড়ে করে কি ঢাকা দিয়ে। মার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, "এই নাও মা, তোমার জন্মদিনের উপহার।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবাও এলেন, "এই নাও গো একটা জিনিস আনলাম তোমার জন্যে, ধরো।" বলে আরেকটা কাপড়ে ঢাকা কি কোলে ফেলে দিলেন।

পিসিমা অবাক হয়ে দেখলেন, মার কোলে দু-দুটো মিশকালো কুকুর-বাচ্চা এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে, মাড়িয়ে দিচ্ছে, ক্ষুদে-ক্ষুদে ল্যাজ নাড়ছে। লাল লাল জিব ঝুলছে।

সবাই হেসে ফেলল, "এ্যাঁ, বাবা! তুমিই বুঝি অন্যটি কিনেছিলে? ঐ মেম বলল, একজন খুব মোটা ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গেছেন।"

বাবা বললেন, "আমিই তো। এই, তোরা অত পয়সা পেলি কোথায় রে?"

"বা—বা! আমাদের বুঝি জন্মদিনের জমানো টাকা ছিল না? আর বাকিটুকু তো পিসিমাই দিলেন।"

পিসিমা হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, "যাই, চট্ করে সন্ধেটা সেরে আসি! বা—ব্বাঃ এদ্দিন তো বাড়ি ছিল না, হয়েছিল একটা গোরস্থান! ঐ দ্যাখ, পাতির-মার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি, দু-দুটো বাটি কোত্থেকে আনল বল দিকিনি। ওরে, আমার দুধ থেকেই নিস আজ, কাল থেকে আনালেই হবে।"

তেজী বুড়ো

আয়না দেখে আঁতকে উঠলুম। এ তো আমার সেই চিরকেলে চেহারা নয়। সেই যাকে ছোটবেলা দেখেছিলুম ন্যাড়া মাথা, নাকে সর্দি, চোখ ফুলো। তার পর দেখেছিলুম চুল খোঁচা, নাক খাঁদা, গালে-টালে কাজল। এই সেদিনও দেখলুম খাকি পেন্টেলুন, ময়লা শার্ট, মুখে কালি। এমন-কি, আজ সকালেও দেখেছি কালো কোট, ঝাঁকড়া চুল রাগী রাগী ভাব।

এ সেই চিরকেলে আমি নয়। দেখলুম বয়েস ঢের, মুখ ভরা নোংরা ঘেমো কাঁচাপাকা দাড়ি, ঝুলোঝুলো গোঁফ, চোখে নীল চশমা, গলায় হলদে লাল ডোরা কাটা কম্ফর্টার, গায়ে গলাবন্ধ লম্বা কালো কোট, বুকের কাছে বোতাম নেই, মরচে ধরা সেফ্‌টিপিন আঁটা। —অবাক হয়ে গেলুম।

আয়নার পিছনে হাতড়ে দেখলুম কেউ যদি লুকিয়ে বসে থাকে। দেখলুম কেউ নেই, খালি কাঠের উপর আঙুলগুলো খচ্‌মচ্‌ করে উঠল, নখের মধ্যে খানিকটা বার্নিশ না ময়লা কি যেন ঢুকে গেল।

বিরক্ত লাগল।

গলা হহ্‌ম্‌ করে সাফ করে বললুম, "কে?"

সেই লোকটা দাড়ি চুলকে মুচকি হেসে বলল, "ন্যাকা! চেন না যেন!" বলে এক হাতে গোঁফ আঁচড়ে উপরে তুলে দিল, অন্য হাতে দাড়ি খাম্‌চে নীচে ঝুলিয়ে দিল। দেখলুম নীচে আমারই নাকমুখ ঢাকাচাপা রয়েছে!

বললুম, "য়্যাঁ!"

লোকটা সিঁড়ি না কি যেন বেয়ে তর্‌তর্‌ করে খানিকটা উপরে উঠে গেল, চাপা গলায় বলল, "বাকিটাও পছন্দ হল কি?"

দেখলুম তার মুণ্ডু দ্যাখা যাচ্ছে না। তার জায়গায় নোংরা ধুতি হাঁটু অবধি, গোড়ালি ছেঁড়া লাল মোজা গুটিয়ে নেমেছে, পাম্‌স্যু'র ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে, নখগুলো আঁকাবাঁকা, ময়লা ঢোকা।

ব্যাপারটার কোনো দিক দিয়ে সুবিধে বুঝলুম না। মুণ্ডু ফিরিয়ে চলে গেলুম। যাবার আগে বাতি নিবিয়ে ছায়াটাকে নিকেশ করে দিলুম। তবু মনে হল আয়নার ভিতর বুনো অন্ধকার থেকে কে যেন বুড়ো মানুষ হ্যাঃ হ্যাঃ করে বিশ্রী হাসি হেসে আনন্দ করছে। কি আর বলব! রাগলুম, ভয়ও পেলুম। খেতে গিয়ে মনে হল সবাই যেন একটু অন্যরকম করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হল যেন সুবিধে পেলেই সব-কটা গোঁফের ফাঁকে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হেসে নিচ্ছে। যেন সেই বুড়ো লোকটার কথা আর গোপন নেই, সবাই জেনে ফেলে আমোদ করছে।

খাবারগুলো বদ লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। তবু রক্ষে নেই। যেখানে যাই, কে যেন নীল চশমা পরে সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভালো করে লক্ষ্য করলুম কানে তার পাকা লোম, শোনবার সময়ে খাড়া হয়ে ওঠে। একবার জোর করে বললুম, "এইয়ো। আমি অন্য লোক। তুই কে রে?" বলতেই সে কোথায় মিশিয়ে গেল। শার্টের গলার চার পাশে আঙুল চালিয়ে তাগড়া হয়ে নিলুম।

এমন সময় গঙ্গুদা বলল, "এদিকে আয়।"

গেলুম—বাপ্ রে, না গিয়ে উপায় আছে? ও বাপু ভীষণ লোক। মুখে দাড়ি, রোগা শরীর, বাবাজিদের সঙ্গে ভাব। সাদা শিমুলের শেকড় খাইয়ে নাকি পড়া দাঁত গজিয়ে দিতে পারে।

দেখলুম সে চোখ পাকিয়ে, পায়ের পাতা উলটে, সটাং হয়ে খাটে বসে দুই হাঁটুতে হাত বুলুচ্ছে, মুখে একটা খিদে খিদে ভাব। বলল, "ঘাড়ে সুড়সুড়ি দে।" ভাবলুম বলি, 'এখন পারব না।' কিন্তু সে এমন কট্‌মট্ করে চেয়ে বললে—

> ও পারে যেয়ো না ভাই, ফটিংটিংয়ের ভয়,
> তিন মিন্‌সের মাথা কাটা, পায়ে কথা কয়।
> তাদের সঙ্গেতে মোর চেনাশোনা আছে রে,
> সুড়সুড়ি না দিস যদি বিপদ ঘটতে পারে রে।

দেড়টি ঘণ্টা সে গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগল—

> কেরোসিন। কেরোসিন।
> কেরোসিনের সুবাতাসে
> মহাপ্রাণী খইসে আসে,

খাও, খাও, ভইরে টিন,
কেরোসিন! কেরোসিন!

রেগে ভাবলুম দিই ব্যাটার ঘাড়ে চিম্‌টি। সে আরো গাইল--

অনুতাপে দগ্ধ হবি,
ড্যাঁও দুদু চেটে খাবি।

জিগ্‌গেস করলুম, "ড্যাঁও দুদু কি?"

বললে, "ড্যাঁও পিঁপড়ের দুধ। দে, সুড়সুড়ি দে, অত খবরে কাজ কি?"

খানিক পরে আয়নার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখলুম আবার সেই লোকটা। এবার আবার মাথায় মান্‌কি ক্যাপ্‌। বড় কান্না পেল। বললুম, "এমনিই তো যথেষ্ট ছিল, আবার ওটা কেন?"

সে বললে, "ছ্যাঃ। গঙ্গুদাকে ভয় পাও, আবার কথা! দু কানে যে তুলো গুঁজি নি সে তোমার ভাগ্যি আর আমি দয়ালু বলে। ছ্যাঃ, এত প্রাণের ভয়!"

আবার বললুম, "একটু আগে তো অমন ছিল না। ওটা খুলে ফেলুন বড় বদ, বড় বদ।"

সে বললে, "তাপ্পর অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক জিনিস অদল-বদল হয়ে গেছে। আর চল্লিশটা বছর সবুর কর, এই এমনটিই হবে। ছ্যাঃ। গঙ্গুটাকে মানুষ হতে দেখলুম, তাকে ভয় পায়! আরে তার দাঁত পড়তে ক্যায়সা চেঁচিয়েছিল আজও মনে আছে।" চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে বললুম, "আপনি বুড়ো মানুষ, আর কি বেশি বাঁচবেন!"

লোকটা চকাত্‌ চকাত্‌ করে হেসে বলল, "ফ্যাচর্‌! ফ্যাচর্‌! সেই আনন্দেই থাকো। বুঝলে না হে? আমিই হচ্ছি তুমি। তুমি যেমন ভীতু, কাপুরুষ, হাঁদা, বুড়ো হলে আমার মতন সাবধান-সাবধান গোছের হবে। তাই তো আমার রাগ ধরে। ইচ্ছে করলেই লক্ষ্মী-ডাক্তারের মতন হতে পারো। হাফপ্যান্ট আর মাদ্রাজি চটি পরে ফলমূল খেয়ে তেজী-তেজী ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারো। তা নয়! আরে ছোঁড়া, ঐ তো টিকটিকির মতন শরীর, ছারপোকার মতন মন! অত ভয় কিসের? এতে অসুখ করবে, ওতে বকুনি খাব, অত ভাবনা কেন? কর আরো, আর এইরকম চেহারা হবে। আজ মান্‌কি ক্যাপ্‌, কাল মাথায় কম্বল মুড়ি। আরে হতভাগা তোর মতো একটা অপদার্থ মলেই-বা কি?"

এই অবধি শুনে এমন রাগ হল যে ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম।

তাতে এক আশ্চর্য কাণ্ড হল।

চড়ের চোটে গাল ঘুরে গেল! দেখি ওমা! সে লক্ষ্মীডাক্তার হয়ে গেছে! একগাল হেসে সেলাম ঠুকে বললে, "সাবাস্ বেটা! এই তো চাই।" বলেই কোথায় মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখি নি। কিন্তু তার পর থেকেই লোকে আমায় বলে: "তেজী বুড়ো।"

দিনের শেষে

লক্ষ্ণৌ থেকে ওস্তাদ এসেছে। দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়িতে গান শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।

ঝগড়ু বলল, "তা তোমরা যদি সব-কিছুই বিশ্বাস না করে আনন্দ পাও, তা হলে আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে সর্বদা মনে রেখো, বোগিদাদা, যা বিশ্বাস করবার মতো নয়, তা যে সত্যি করে হয় না, এরকম কোনো কথা নেই।"

ঝগড়ু রাগ করে উঠে দাঁড়াল। ওর পেছনে কুচি কুচি ঘাস লেগেছিল, তার কতকগুলো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। তাই দেখে বোগি নরম গলায় বললে, "তাই বলে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারেও মানুষ চোখে দেখতে পায়, সে কথা কি করে বিশ্বাস করি? অসম্ভব জিনিস যে হয় না, ঝগড়ু।"

ঝগড়ু আরো রেগে গেল। "অসম্ভব বলেই সে-জিনিস হবে না? এ কি একটা কাজের-কথা হল, বোগিদাদা?"

বাগান যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মর্চে-ধরা কাঁটা-তারের বেড়া। তার পরেই রেলের লাইনের বাঁধ আকাশ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। দুপুরে দুখু ঘাস কেটেছে, যেখানে-সেখানে কুচি-কুচি ঘাস পড়ে আছে; পাখিরা সব বাসায় ফিরে আসছে; শ্যামলবাবুদের গোয়ালে এখন গোরু দোয়া হচ্ছে। বাঁধের ওপারে কিচ্ছু দ্যাখা যায় না; বাঁধের উপরে একটা ন্যাড়া মনসার ঝোপ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে;

পিছন দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। কানে এল একটা শব্দ, টংলিং টংলিং টংলিং। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে একটা মালগাড়ি বাঁধের উপর দিয়ে চলে যেতে থাকে।

যেই সূর্যের সামনে আসে, অমনি সেই গাড়িটা কুচ্‌কুচে কালো হয়ে ফুটে ওঠে। শেষ গাড়িটার দু দিককারই বড় টানা দরজা খোলা। সেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ওপারের সূর্যটাকে এই মস্ত হয়ে দ্যাখা গেল। আর দ্যাখা গেল, সূর্যের সামনে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কালো পাতলা ছিপ্‌ছিপে একটা মানুষ। তার মাথার উপর খাড়া দুটো শিং।

বোগি, রুমু, ঝগড়ু, কেউ আর কথা বলে না। ঠিক সেই সময় বাঁধের পিছনে সূর্যও টুপ্‌ করে ডুবে গেল। আর অমনি চার দিক ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়া হয়ে উঠল। শীত-শীত মনে হতে লাগল। বকের মতো একটা সাদা পাখি কোঁ-ও-ও-ও, কোঁ-ও-ও-ও বলে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঝগড়ু উঠে পড়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিল, "আর নয়, এখন ভিতরে চল।"

রুমু বললে, "ঝগড়ু, লুচি ভাজতে বল-না, আমার খিদে পেয়েছে।"

ঝগড়ু রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই বোগি বললে, "স্‌—স্‌—স্‌, দ্যাখ!"

বাঁধের ধার বেয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে নেমে, এক লাফে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে, শিংওয়ালা লোকটা একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর পিঠে একটা লম্বা ঝোলা।

"এই, শোন! আমাকে লুকিয়ে রাখবে?" বোগি রুমু ওর মুখের দিকে তাকাল, এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

লোকটা বলল, "আমার পা ব্যথা করছে, তেষ্টা পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। রাখবে লুকিয়ে? তা হলে তোমাদের জাদু-পড়া, গুণ-করা, ভেল্কি-বাজি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে?" বলেই লোকটা দিদিমার মার হাতে লাগানো সাদা গোলাপ ফুলের ঝোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে ডেকে বলল, "এই দ্যাখ!" বলে টুপ্‌ করে একবার বসেই আবার উঠে দাঁড়াল। বোগি রুমু অবাক হয়ে দেখলে—কোথায় কালো পোশাক, কোথায় শিং! সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সাদা পোশাক, মাথায় মুকুট। লোকটা একটু হেসে আবার টুপ্‌ করে একবার বসেই

কোথায় কালো পোশাক, কোথায় শিং ! সাদা চুল, সাদা দাড়ি,

সাদা পোশাক, মাথায় মুকুট !

উঠে পড়ল! আবার কালো পোশাক, মাথায় শিং যে-কে সেই।

বোগি রুমু উঠে একবার গোলাপগাছের পিছনটা ভালো করে দেখে এল। কোথাও কিছু নেই।

"কি দেখছ, দিদি? ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঠকাই না।"

বোগি বললে, "এসো, তোমাকে লুকিয়ে রেখে দেব, শোবার জন্য দড়ির খাট দেব, জল খেতে দেব, কিন্তু আমাদের অন্ধকারে দেখতে শিখিয়ে দিতে হবে, মাটিতে কান পেতে এক মাইল দূরে বনের মধ্যে হরিণ-চলা শুনতে শিখিয়ে দিতে হবে।"

রুমু বললে, "আর সেই?"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "কি সেই, দিদি?"

"সেই যে, বাঁশি বাজালে জন্তু-জানোয়ার বশ হয়?"

"হ্যাঁ, তা-ও শিখিয়ে দেব, চোখের সামনে আমের আঁঠি থেকে আম গাছ করে তাতে ফল ধরাতে শেখাব, দড়ি বেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে শেখাব—"

বোগি বলল, "ধ্যেৎ!"

লোকটা বললে, "ধ্যেৎ? এই নাও ধর।" বলেই পাশের পেয়ারা গাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের কাকাতুয়া ধরে দিল।

বোগি ঢোক গিলে বলল, "চলো।" লোকটা তক্ষুনি নীল পাখিটাকে অন্ধকারে উড়িয়ে দিল। বলল, "হরিণ-চলার শব্দ আর এমন কি। আমাদের মণিপুরে তুঁতফলের গাছে রেশমী-গুটির শুঁয়োপোকারা থাকে। রাত্রে যদি গাছতলায় দাঁড়াও, ওদের পাতা চিবুনোর শব্দ শুনতে পাবে।"

দূরে রান্নাঘরের আলো দ্যাখা যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, "আমার মা দুধ দিয়ে কমলালেবু দিয়ে মেখে শীতের রাত্রে বাইরে রেখে দিত, আর পাহাড় দেশের বেঁটে মানুষরা এসে সে-সব খেয়ে যেত। তাই আমাদের কোনো অভাব থাকত না।"

রুমু বলল, "তুমি তাদের দেখেছ?"

বোগি বলল, "রুমু, বোকার মতো কথা বোলো না।"

দুখু ভূতের ভয় পায়, মালীর ঘরে থাকে না। ঘরের পাশে জলের কল আছে। তাই শিংওয়ালাকে ওরা সেখানে থাকতে দিল। "যাও, ঢুকে পড়। ঝগড়ু দেখলে আবার মুশকিল হবে।"

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা মোমবাতি হলে হত-

না ? যদি ইয়ে—মাকড়সা-টাকড়সা থাকে ?"

বোগি বললে, "তবে-না বললে, অন্ধকারে দেখতে জানো ?"

সে বললে, "আহা, আমি দেখতে পারি কখন বললাম ? বলেছি, তোমাদের শিখিয়ে দেব। আমার অন্ধকারে ভয় করে।"

রুমু বললে, "দাদা, দাও-না তোমার নতুন টর্চটা ওকে।"

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ঝগড়ু ডাকল, "বোগিদাদা—আ—আ, রুমুদিদি—ই—ই।" আর অমনি ওরাও লোকটার হাতে টর্চ গুঁজে দিয়ে ধুপ্‌ধাপ্‌ দৌড় লাগল।

সব শেষের পেটফোলা গরম লুচিটা লাল কাশীর চিনি দিয়ে খেতে হয়। রান্নাঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা মুখ ধুল। যেখানে মুখ ধোয়া জল পড়ে, সেখানে একটা মস্ত লঙ্কা গাছ হয়েছে। দুখু বলেছে, ওকে কেউ লাগায় নি, আপনা থেকেই হয়েছে। তাতে ছোট্ট-ছোট্ট তারার মতো সাদা ফুল ফুটেছে আর রাশি রাশি লাল টুক্‌টুকে লঙ্কা ঝুলে রয়েছে। মাথার উপর আকাশটার ঘন বেগ্‌নী রঙ, কিন্তু দূরের আকাশ আলো হয়ে রয়েছে ; কালো বাঁধের উপর দিয়ে কালো শুঁয়োপোকার মতো একটা মালগাড়ি যাচ্ছে, টংলিং, টংলিং, টংলিং করে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে।

শুনে শুনে ঘুম পায়। রুমু বায়না ধরে, আজ কিছুতেই একলা শোবে না। ঝগড়ু বিড়্‌বিড়্‌ করে কি সব বলতে বলতে বোগির খাটে ওর বালিশটা দিয়ে দেয়। বোগির কানে কানে রুমু বলে, "দাদা!"

"কি, রুমু ?"

"ওর যদি ভয় করে ?"

বোগি কোনো উত্তর দেয় না। তার পর বিরক্ত হয়ে বলে, "ও কি রুমু, আবার কান্নার কি হল ?"

"ও-ঘরে মাকড়সা আছে দাদা, আমি দেখেছি।"

বোগি বললে, "ওকে টর্চ দিয়েছি তো, রুমু।"

"ঝগড়ুর ঘরে অনেক জায়গা।"

ঝগড়ু বলল, "কি কানাকানি হচ্ছে। ও-সব ভালো নয় বলে দিচ্ছি। কি, লুকোচ্ছ কি! আজ গল্প শুনবে না ?"

বোগি বললে, "তুমি যাও-না, তোমার কত কাজ বাকি আছে। যাও-না রান্নাঘরে।"

কিন্তু ঝগড়ু কিছুতেই যাবে না। চৌকাঠের উপর বসে পড়ল। "অসম্ভব জিনিস হয় না বলে ?"

রোগি পাশ ফিরে শুল। "হয়, ঝগড়ু হয়, আমি ভুল বলেছিলাম।"

ঝগড়ু রাগ করে আলো নিবিয়ে সত্যি করেই চলে যাচ্ছে দেখে রুমু হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার পকেটে গুঁজে দিল।

"কি কর দিদি, তামাকের গন্ধ হবে হাতে। কি, চাও, কি ?"

"অসম্ভবের গল্প বল ঝগড়ু।"

ঝগড়ু খাটের পায়ের দিকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। "তোমরা হয়তো বলবে পরশপাথরও অসম্ভব।"

রোগি গায়ের ঢাকা খুলে ফেলে উঠে বসল। "পরশপাথর অসম্ভব জিনিস নয় ? পরশপাথর থাকলে এত গরিব লোক হবে কেন ?"

রুমু বলল, "তুমিই তো বলেছ, এত গরিব যে, বীচিসুদ্ধু কুল ছেঁচে খায়।"

ঝগড়ু বলল, "বেশ, তা হলে পৌষ মাসের সন্ধ্যাবেলায় কম্বল গায়ে দিয়ে বুড়ো লোকটা আমার ঠাকুরদার কাছে আসে নি।" ঝগড়ু আবার উঠে দাঁড়াল।

"না, ঝগড়ু না, দাদা কিচ্ছু জানে না, তুমি বল !"

ঝগড়ু শুরু করলে—"চার দিক চাঁদের আলোয় ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে এমন সময় সে লোকটা এল। বলল, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' ঠাকুরদা বললেন, 'কোত্থেকে দেব, এ বছর অজন্মা, আমাদেরই খাবার কুলোয় না, মুরগি সব মরে গেছে, শালকাঠ ভালো দরে বিকোয় নি, দেব কোত্থেকে বল ?' লোকটা বলল, 'তোমাদের এ বেলাকার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে ?' 'না'। 'বেশ, তবে তোমার ভাগটাই নাহয় দাও আমাকে।' বাড়িতে যা ছিল চেঁচেপুঁছে ঠাকুরদা সব তার সামনে ধরে দিলেন। বলেছি তো, দুমকার ব্যাপারই আলাদা। লোকটা দাওয়ায় বসে বাড়ি-সুদ্ধ সবাকার ভুট্টা দিয়ে ভাত দিয়ে সেদ্ধ সবটুকু খেল, তার পর আমাদের পাহাড়তলির কুয়োর মিষ্টি জলও এক ঘটি খেল। তার পর আঁচিয়ে উঠে ট্যাক থেকে একটা হরতুকি আর একটা ছোট্ট কালো পাথর বের করে হরতুকিটা মুখে ফেলে বলল, 'বড্ড অভাব তোমাদের, তাই-না ?' বলে পাথরটা দিয়ে পাথরের বড় থালাটাকে ছুঁয়ে দিল, অমনি থালাসুদ্ধু সোনা হয়ে গেল।

"সকলে তো থ! বুড়ো লোকটিও কালো পাথরটাকে ট্যাঁকে গুঁজে জঙ্গলের দিকের পথ ধরল। তখন সকলের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, সোনা থাকলে দুর্ভিক্ষেরও কোনো ভয় থাকবে না। চার দিক থেকে একটা 'ধর, ধর', 'গেল, গেল', রব উঠল। বুড়ো লোকটি একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল তার পর একটা লাফ দিয়ে হরিণ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।"

বোগি রুমু কিচ্ছু বলল না।

ঝগড়ু বলল, "বল, এ-ও অসম্ভব।"

বোগি বালিশে মুখ গুঁজে বলল, "অসম্ভব হবে কেন?"

ঝগড়ু তো অবাক! এমনি সময় দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। "সে এক কাণ্ড শুনে এলাম রে। রামহাটি স্টেশনে কে একটা জাদুকর নানারকম খেলা দ্যাখাচ্ছিল, দেখতে দেখতে দারুণ ভিড় জমে গেল, তার পর কি নতুন খেলা দ্যাখাবে বলে সে এর ঘড়ি, ওর আংটি, তার টর্চ সব নিয়ে দে লম্বা! ঐ ভিড় স্টেশনের মধ্যে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল, সবাই মিলে আঁতিপাঁতি খুঁজেও তার টিকিটি পেল না। কিন্তু তোদের ঘুমুবার সময় হয়ে গেছে, তোরা এখন ঘুমো।"

অনেকক্ষণ পরে রুমু বললে, "দাদা!"

"কি?"

"টর্চ তো ছিল না ওর কাছে।"

বোগি চুপ করে রইল। রুমু আবার ডাকল, "দাদা!"

"কি বল?"

"ওর কপাল কেটে গিয়েছিল।"

বোগি বললে, "আঃ, রুমু, ফের কাঁদছ কেন?"

"রক্ত বেরুচ্ছিল যে দাদা, টর্চের আলোতে দেখলাম।"

বোগি রুমুর পিঠে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল।

ঘড়ির শব্দ দূরে সরে যেতে লাগল। আরো দূরে বাঁধের উপর মালগাড়ি যাচ্ছিল টংলিং টংলিং টংলিং।

পরদিন সকালে মালীর ঘরে গিয়ে বোগি রুমু দেখল, দড়ির খাটে টর্চটা রয়েছে, আর-একটা ছোট বাঁশি। লোকটা নেই।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশের কথা আর কী বলব, সে কি আর এখন আমাদের আছে? একেবারে পাকিস্তানের পুবকোণে ঠুসে দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার লাল-লাল গোল-আলু আর সেখানকার পাকা সোনালী আনারস আর আঠাল দুধের ক্ষীর যে একবার খেয়েছে সে সারাটা জীবন শুধু কি খেলুম কি খেলুম বলে হা-হুতাশ করে কাটাবে!

তা ছাড়া সেখানকার বাঘের যা উপদ্রব ছিল সে আর ভাবা যায় না। অনেকদিন আগের কথা বলছি, রাত হলেই যখন-তখন গাঁয়ের মধ্যে বিরাট বিরাট বাঘ এসে ঘুরে বেড়াত, আর যে-যেখানে থাকত সামনে যার বাড়ি পেত সেখানেই কপাট দিয়ে, চীৎকার করে নিজের বাড়িতে খবর দিত—"শুনছ নি? আইজ আর বারি যাইতাম না, তোমরা হগলতান খাইয়া-দাইয়া হুইও পর।" বাঁশ-চেরা সব গলাও ছিল, আধমাইল দূর থেকে শোনা যেত। খেত কি! দুধ, ঘি আর তাল-তাল ভাত।

শুনেছি আমাদের বুড়ো চাকর যামিনীদার শ্বশুর শিবু একবার ঐরকম বন্ধুর বাড়িতে আটকা পড়েছে। বাইরে বাঘ হালুম-হুলুম করে বেড়াচ্ছে, তার দাপানির চোটে বাড়ি-ঘর কাঁপছে। এমন সময় শিবুর বন্ধু বলল, "উয়ারে খ্যাদাইয়া নদী পার করতে পারস ত তরে ঐ সবরি কলার কান্দিটাই দিবাম।" শিবুও তেমনি লাফিয়ে উঠে বলে, "তাই দিবাম, এক্ক্যারে নদী পার করাইবাম।"

এই-না বলে ঘরের কোণ থেকে বাঁশগাছটা নিয়ে তার আগাটা হাতখানেক দা দিয়ে চিরে নিল। তার পর হঠাৎ সেটা মাটিতে ঠুকে একটা বিকট হা রে রে রে শব্দ করে, দরজা খুলে ছুটে বাইরে বেরুল। বাঘ না তাই শুনে এ্যাক্কারে ল্যাজ তুলে পগার পার। শিবুও সেইরকম চেরা-বাঁশের শব্দ আর আর হা রে রে রে চীৎকার করতে-করতে সত্যি-সত্যি তাকে নদী পার করে দিয়ে এল।

পার করে দিয়ে শিবুর তো ভারি ফুর্তি হল, এবার ক্যায়সা কলার

শিবু অবাক হয়ে দ্যাখে, বাচ্চাটার সারা গায়ে ডোরা ডোরা দাগ।

কাঁদিটা কাঁধে নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে! ফুর্তির চোটে গলা দিয়ে গান বেরিয়ে গেল, বাঁশগাছা কাঁধে ফেলে গান গাইতে গাইতে শিবু বাড়িমুখো চলেছে। ওদিকে বাঘও নদীর ওপার থেকে গান শুনে বুঝল তবে এ তো মানুষ, ভয় পাবার কিছু নয়! এই-না ভেবে জোড় পায়ে লাফাতে-লাফাতে শিবুর পিছনে ছুটল, আর শিবুও "ও বাবা রে, মরে গেছি রে, ধরেছে রে," বলে পাঁই-পাঁই ছুটেছে। কোনোরকমে সামনে যে-বাড়ি ছিল তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, পাঁচজনে মিলে ঠেলে-ঠুলে দরজার খিল দিয়েছে, আর বাঘও ওদিক থেকে দরজার উপর লাফিয়ে পড়েছে।

এইরকম ব্যাপার মাঝে-মাঝেই হত। আসল কথা হল, শিবু ভীষণ ভাঙ খেত। তাই নিয়ে শিবুর বউ দিনরাত খেচাখেচিও করত কিন্তু কোনো ফল হত না।

একদিন শীতকালে সন্ধেবেলা শিবু তো নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরের মধ্যে ঝিমুচ্ছে, এমন সময় বউ এসে বলল "আবার ঝিমুচ্ছ? তেঁতুল-গাছ তলা থেকে নতুন বাছুরটাকে ঘরে এনে তুলেছ?"

তাই তো! নেশার ঘোরেও শিবু টের পেল কাজটা ভালো হয় নি। বাছুর তো সেই দুপুর থেকে তেঁতুল-তলায় বাঁধাই আছে, যদি বাঘে নেয়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, অন্ধকারের মধ্যেই শিবু তেঁতুলতলায় গিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে বাছুর তুলে কোলপাঁজা করে ধরে ঘরের দিকে চলল। দরজার সামনে আসতেই ভিতর থেকে প্রদীপের আলো একটু-একটু বাছুরটার গায়ে পড়তেই শিবু অবাক হয়ে দ্যাখে, বাছুরটার সারা গায়ে ডোরা-ডোরা দাগ, এমন-কি, শিবুর হাতের উপর দিয়ে যে ল্যাজটা ঝুলে রয়েছে তাতে পর্যন্ত আগাগোড়া ডোরা কাটা! দারুণ চম্‌কে গিয়ে শিবু জন্তুটাকে দুম্ করে মাটিতে নামিয়ে দিতেই সেটা গাঁক্ করে একটা ডাক ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে দে-ছুট। আর শিবুও ঢুলতে ঢুলতে তেঁতুল-তলায় ফিরে গিয়ে এবার সত্যি-সত্যি-বাছুরটিকে কোলে নিয়ে, ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে, আবার তক্তপোষে বসে-বসে ঢুলতে লাগল।

নেশার ঘোরে বউকে কিছু বলাই হল না।

পরদিন সকালে নেশা ছুটে গেলে তার সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, 'অ্যাঁ, কও কি! তবে কি বাছুর ভ্যাইব্যা বাঘটারেই কোলে করছিলাম নাকি?'

বাঘের উপদ্রব আমাদের গ্রামে লেগেই ছিল। একদিন আমার

বাবার এক ঠান্‌দিদি বাগান থেকে ডাব পাড়িয়েছেন, তারই গোটাদুইকে যেমন একটুখানি খোসা ছিলে নিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দেয় ঐরকম করে হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে পা দিয়েছেন, এমন সময় তাঁদের বাড়ির চাকর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিল যে পুকুরপাড়ে ঠান্‌দিদির বুধী গাইকে বাঘে ধরেছে। ঠান্‌দিদি তো চটে লাল। ব্যাটা তুই কোন আক্কেলে বেচারা গাইকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিলি! আর বাঘ হতভাগারও তো কম আস্পর্ধা নয় যে ঠান্‌দিদির গাই ধরে;

হন্‌-হন্‌ করে ডাব দোলাতে-দোলাতে ঠান্‌দিদি একেবারে পুকুরপাড়ে গিয়ে হাজির। এক দিকে বুধী শিং বাগিয়ে বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছে, আর ঠান্‌দিদিও একদৌড়ে "তবে রে পাজি!" বলে বাঘের মাথায় দিয়েছেন কষিয়ে ডবল ডাবের বাড়ি। বাড়ি খেয়ে বাঘ বিকট আর্তনাদ করে উঠেছে, আর আশেপাশে থেকে বিশ-পঁচিশ জন লোক মোটা-মোটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে দেখতে-দেখতে বাঘের দফা শেষ।

এইরকম সব ছিল আমাদের দেশের লোকেরা সেকালে। এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

পালোয়ান

নিউ মার্কেটের পিছনে বাঁদরের দোকান আছে। ছোট্-ছোট খাঁচায় পোরা বাঁদরের ভিড়, এ-ওর গায়ে চিপ্‌কে রয়েছে। তা ছাড়া সাদা ইঁদুর, বেজি, কাকাতুয়া, কালোমুখো ল্যাজ-প্যাঁচানো শ্যামদেশের বেড়াল, ভালুক বাচ্চা, আরো কত কি যে পাওয়া যায়! চার দিকে একটা সোঁদা-সোঁদা চীনাবাদাম—পাকা-কলা—বাঘ-বাঘ—গন্ধ।

সেখানে প্রায়ই যেতাম। হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম। কিনবার তো আর উপায় ছিল না। টিপিনের পয়সা জমিয়ে গোটা-দুই সাদা ইঁদুর যে কিনতে পারতাম না তা নয়। তবে পিসিমা, বড় জ্যেঠিমা, মা, এরা সব তা হলে কি কাণ্ডটাই যে করবেন সে আমার বেশ জানা ছিল। শেষটা বাবা বাধ্য হয়েই বলবেন—"জগা! যেখান থেকে এনেছিলি সেইখানে দিয়ে আয়।" এই ভয়েই কিছু করতে

গুম্ গুম্ করে নিজের বুকে কীল মেরে বলল, "কি রে মুরগি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদর-বাচ্চা দেখছিস?"

পারছিলাম না।

ঐখানেই একদিন পালোয়ানটার সঙ্গে দ্যাখা হল। ইয়া বুকের ছাতি। দেখতে যেন একটা বিরাট পিপে। কোথায় যে ঘাড় শেষ হয়েছে, কোথায় যে বুক, কোথায় যে ভুঁড়ি শুরু হয়েছে, কিছুই বাবা বোঝা যায় না। আমাকে দেখে গুম্ গুম্ করে নিজের বুকে কীল মেরে বলল, "কি রে মুরগি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদর-বাচ্চা দেখছিস? এই আমার মতো আধসের করে দাঁত দিয়ে খোলা ভেঙে বাদাম খাবি, আর পাঁচশো বার ডন-বৈঠক করবি।" এই বলে সে সেখানেই দু-চার বার ওঠ-বোস করে দেখিয়ে দিলে। বাঁদরগুলো তো তার কাণ্ড দেখে এ-ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে হেসেই একাকার!

লোকটি আমার কাছে এসে দুই আঙুল দিয়ে আমার বাইসেপ টিপে হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, "কি খাও হে? গোলাপ জল দিয়ে মাখন তোলা দুধ বুঝি? ছি, ছি, লজ্জা করে না? ঐরকম শরীর দিয়ে দেশ রক্ষা করবি কি করে? জানিস ভীমভবানী দিস্তে-দিস্তে মোটা-মোটা লাল আটার রুটি, গাওয়া ঘি আর অড়র ডাল দিয়ে খেয়ে দুটো দু-মণি মুগুর নিয়ে দু-ঘণ্টা ভাঁজতেন।"

ততক্ষণে বেশ একটা ছোটখাটো ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে। "আমি কে, তা জানিস? আমি ঐ ভীমভবানীর নাতি। জানিস আমার দাদামশাই স্যাণ্ডোর শিষ্য ছিলেন। তাঁর পায়ের গুলিতে মোটা-মোটা লোহার ডাণ্ডা মেরে বেঁকিয়ে বিনুনি বানিয়ে ফেলা হত।"

আবার বুক চাপড়ে লোকটা বলল, "আর সেই আমি কিনা তোদের মতো গঙ্গা-ফড়িংদের সঙ্গে সময় নষ্ট করি!" বলে লোকটা চলে গেল।

তার পর আরো অনেকবার দ্যাখা হয়েছে। সর্বদা একই ড্রেস। খাকি হাতকাটা মিলিটারি শার্ট, খাকি হাফ্‌প্যান্ট, পায়ে ব্রাউন ক্যাম্বিসের জুতো। ছোট্ট-ছোট্ট করে চুল ছাঁটা, খোঁচা-খোঁচা দাঁতের বুরুসের মতো গোঁফ।

কত কি যে বলত তার ঠিক নেই।

"আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদর দেখছিস? জানিস, আমার বাবা বিখ্যাত বাঘ-শিকারী ছিলেন। এমনি তাঁর সাহস ছিল যে, মাচা-ফাচা বাঁধতেন না, কত সময় বন্দুক নিয়ে যেতে পর্যন্ত ভুলে যেতেন। এমনি করে বাঘের ল্যাজ ধরে বাঁই বাঁই করে বার-কুড়িক চার দিকে ঘুরিয়ে

দিতেন ছেড়ে। পঞ্চাশ গজ দূরে ব্যাঘ্রমশাই পড়ে একেবারে ইহলীলা সংবরণ।"

মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে, চোখ-টোখ পাকিয়ে ভুরু কুঁচ্কে জিজ্ঞাসা করত—

"কি? বিশ্বাস হল না বুঝি? তবে চল্ ব্যাটা আমার পিসেমশাইয়ের কুস্তির আখড়ায় নিয়ে যাই, আমার দু-চার প্যাঁচ শিরমোড়া দাড়িমোড়া না খেলে দেখছি তোদের বিশ্বাস হবে না। কেমন, যাবি কি না?" বলে খপ্ করে কুলোর মতো দুই হাত দিয়ে আমার ঘাড় ধরে টান! ব্যস্ত হয়ে বলি—"আরে না, না। আপনি যা যা বলেন আমি ভীষণ বিশ্বাস করি।" তক্ষুনি খুশি হয়ে গিয়ে আরো বলতে থাকে—

"দেশে আমাদের বাড়ির বাগানে বুনো হাতি ছাড়া থাকে, লোকের বাড়িতে যেমন হরিণ-টরিণ থাকে। সকালে-বিকেলে যখন-তখন আমার ভাইরা এক হাত দিয়ে বুনো হাতির এক হাঁটু ধরে ঠেলতে ঠেলতে তাদের মাটিতে বসিয়ে দেয়।" মাথা নিচু করে একটু লজ্জার সঙ্গে হাসে আর বলে—"বুঝলি, ভগবানের ইচ্ছেয় পয়সাকড়ির আমাদের অভাব নেই। ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময় থেকে সোনা-রুপোর পাহাড় জমছে তো জমছেই। এখন আর ওজন-টোজনও করা হয় না, গুদোম ঘরে অমনি পড়ে পড়ে থাকে আর ধুলো জমে। আমাদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত কি ভয়ংকর গায়ের জোর! একবার আমার মা আর ঠাকুমা খুন্তির বাড়ি দিয়ে একদল ডাকাতকে স্রেফ ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার সাহেব বড়লাট সেইজন্য তাঁদের হিন্দী ভাষায় চিঠি লিখে ছিলেন। তাঁরা অবিশ্যি মানে বুঝতে না পেরে সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।"

এই অবধি বলে আমার দিকে ফিরে বললে, "হাসছিস যে? বলি, লেখাপড়া শিখে তোর কি সুবিধেটাই হচ্ছে বল-না? দেখতে তো ঐ ভিজেবেড়ালটি, সাত-চড়েও তো মুখে রা নেই, করবি তো কেরানীগিরি কি পোস্টমাস্টারি। আর আমাকে দ্যাখ্ যুক্তাক্ষর পড়তে পারি না, ইচ্ছে করে শিখি নি, আর আমাদের গুদোম ঘরে যে ঢুকবে তাকে মণি-মুক্তো মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঢুকতে হবে। যাই, সন্দে হয়ে এল ডন-বৈঠকের সময় হল।"

আরেকদিন অনেক নতুন পাখি এসেছে, লাল, নীল সবুজ সব

তোতাপাখি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি হঠাৎ লোকটা এসে তাই দেখে হেসেই কুটোপাটি—"ওকি রে! তার চেয়ে খাটে শুয়ে-শুয়ে টুনটুনি পাখির ছবি দেখলেই পারিস। আমার বাবার কাকাবাবু হিমালয় থেকে ঈগল পাখি ধরে এনে টিরেটি বাজারে বিক্রি করতেন। ডানা মেললে তাদের এদিক থেকে ওদিক বারো ফুট, তা জানিস? সেগুলোর দুই পা এক হাতে মুঠো করে ধরে আর অন্য হাতে বাঁকানো ঠোঁটদুটো একসঙ্গে চেপে ধরে গঙ্গার ধারে হেঁটে হাওয়া খেতে যেতেন। তোরা আর আমাকে হাসাস নি।"

যেমনি লোকটার গুষ্টিসুদ্ধ সকলের গায়ে জোর, তেমনি তাদের মনে সাহস। একদিন সে বলল, "কি বলাবলি করছিল ওরা? দোকানদারের শত্রুরা এসে বাঁদরকে আফিং খাইয়ে দিতে চেষ্টা করছিল? হেসে বাঁচি নে! আরে পুরুষ মানুষের মতো যে পুরুষ মানুষ তার শত্রু থাকবে কেন? আমার বুড়ো ঠাকুরদা হয় স্রেফ পিটুনি দিয়ে সব বন্ধু বানিয়ে ফেলতেন, নয়তো যারা তবু বন্ধু হতে রাজি হত না তারা রাতারাতি কোথায় যে উড়ে যেত তার ঠিক নেই, একদম নিখোঁজ! পুরুষ মানুষের আবার শত্রু কি রে? আমার একজনও শত্রু নেই।" বলে কট্‌মট্‌ করে সকলের দিকে তাকাল। আমরা সকলেই হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগলাম। আমরা তো তার বন্ধু লোক।

একদিন বিকালে বাঁদরের দোকানে গিয়েছি। বাঁদরওয়ালা বলল, "একটা কুকুর-বাচ্চা দেখবে, খোকাবাবু? একজন দিয়ে গেছে, ভারি সস্তা দাম।" এমন সময় লোকটি এসে বললে—"কি! কুকুর রাখ নাকি তোমরা? এখানকার সব কুকুর দেখলে আমার হাসি পায়! আমাদের বাড়ির উঠোনে ডালকুত্তা ছাড়া থাকে। গলায় একটি কলার পর্যন্ত থাকে না। চোর বাছাধন সোনাদানার লোভে যে কখনো ঢোকেন না তা নয়। কিন্তু পরদিন সকালে এক-আধটা লেংটির সুতো, কি হাফ্‌প্যান্টের বোতাম ছাড়া কিচ্ছু কখনো দ্যাখা যায় নি।"

তার পর দোকানের রোয়াকের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বলল—"উঃ! পা-টাতে একটু ব্যথা হয়েছে; কাল রাতে হেঁটে বর্ধমান ঘুরে এলাম কিনা! তা কিনা বলছিলাম, ও হ্যাঁ, ঐ বর্ধমানে আমার মাসির বাড়িতে এমন সব কুকুর আছে, যা দেখলে শুধু মেসোমশাইকে কেন মাসিমাকে পর্যন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। সেগুলোকে একবার দেখলে

কেউ বিশ্বাস করবে না যে, ওরা শুধু সাধারণ গোরু-ভেড়ার হাড় খেয়ে মানুষ। আরে আমি নিজেই তো একবার একদল ব্লাড্-হাউন্ড—ও কি, ওটা আবার কি নিয়ে এল”—এই বলে তড়াক্ করে লোকটা লাফিয়ে বারান্দা ছেড়ে একেবারে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানদার অত বুঝতে না পেরে, কালো কুচ্‌কুচে মিশ্টি ভুটে কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে ধরে একেবারে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখলাম লোকটার দুই চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, তার চুল আর গোঁফ খাড়া-খাড়া হয়ে উঠেছে।

কুকুর-বাচ্চা ক্ষুদে ল্যাজটা নেড়ে লাল ছোট্ট একটা জিব বের করে লোকটার গালে অল্প একটু চেটে দিল। অমনি কিরকম একটা শব্দ করে লোকটা সেখানেই মুচ্ছো গেল! দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলল—“মোটর কোম্পানির সব দরওয়ানগুলোই ঐরকম, খালি বসে-বসে খাবে, আর ছুঁলেই অজ্ঞান। থাক্ ব্যাটা পড়ে।”

এই দ্যাখ আমি এক টাকা দিয়ে কুকুর-বাচ্চাটাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। যে যাই বলুক, আমি কিছুতেই ওকে ছাড়ব না। পুজোর সময় সবাই সবাইকে জিনিস দেয়, আমিও নিজেকে কুকুর-বাচ্চা দিলাম। জানো, আমার ঠাকুরদাদা একবার—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক গে।

গুণ-করা

বুঝলে, আমার মামাবাড়িতে ফাগু বলে একটা চাকর ছিল। বাঙালি নয়; ঐ গারো পাহাড় অঞ্চলে ওর বাড়ি। আশা করি গারো পাহাড় কোথায় সে কথা আর তোমাদের বলে দিতে হবে না। ফাগু যে বাঙালি নয় সে ওকে দেখলেই বোঝা যেত। বেঁটে, মোটা, এক মাথা কাঁটা কাঁটা চুল, দারুণ ফরসা আর খেত যে, আরে বাপ্, দেখলে তোমাদের তাক্ লেগে যেত। রোজ দুটি বেলা এক গন্ধমাদন পর্বত ভাত আর এক গঙ্গা জল তার চাই। তাই দেখে আমরা হাসাহাসি করলে আবার সে কি রাগ!

“অত হাসবার কি আছে, দিদি? জানো, আমরা হলাম গিয়ে

পরীদের বংশ। আমরা নানারকম তুক্‌তাক্ ভেল্কি-মন্তর জানি, একটু না খেলে আমাদের চলবে কেন?"

একদিন আমার মামাতো ভাই নগা বলল, "দ্যুৎ? পরী আবার হয় নাকি? যত-সব বানানো গল্প। চালাকি করবার আর জায়গা পাও নি।" তাই শুনে ফাগু এমনি চটে গেল যে আরেকটু হলেই থালায় এক পাহাড় ভাত ফেলেই উঠে যাচ্ছিল। নেহাত অত ভাত খেলে বেড়ালটার অসুখ করতে পারে বলেই গেল না। কোনো কথা না বলে পাহাড়টিকে শেষ করে, এক কলসি জল গিলে, তার পর আবার বলল, "তোমরা জানোই-বা কি আর বোঝই-বা কি? ইস্কুলে গিয়ে কয়েকটা বই মুখস্থ করে নিজেদের সব মস্ত পণ্ডিত মনে কর। বলি, একটা তেঁতুল পাতাকে বাঘ বানিয়ে দিতে পারো?"

নগা বললে, "হ্যাঁ, তুমি পারো না তো আরো কিছু! একটা থালা মাজ্‌তে পারো না, পিসিমার কাছে তাড়া খাও, তুমি আবার বাঘ বানাবে!" ফাগু ব্যস্ত হয়ে বলল, "আস্তে, খোকাবাবু, আস্তে। বড়রা শুনতে পেলে আমাকে আস্ত রাখবে না।" নগা বললে, "কেন, আস্ত রাখবে না কেন?"

"আরে আমার ঠাকুরদা শুধু যে তেঁতুল পাতাকে বাঘ বানিয়ে দিতে পারত তা নয়, তার উপর সুতো বেঁধে মানুষকে ছুঁচো বানিয়ে দিতে পারত।" "মানুষকে ছুঁচো বানাত বললেই হল! কক্ষনো মানুষকে ছুঁচো বানাত না।"

ফাগু বলল, "আহা, ছুঁচো বানাত তো আর বলি নি, বানাতে পারত। খুব দয়ালু ছিল তাই বড়-একটা বানাত না। তবে মানুষকে ইঁদুর ব্যাঙ কাঁচপোকা বানিয়ে দিতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

শুনে আমরা সবাই একেবারে থ মেরে গেলাম। ফাগু আরো বলল, "আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের পাহাড়ের নীচেকার গাঁয়ের চমরু মোড়ল ঠাকুরদার কাছে টাকা ধার করে শোধ দিচ্ছিল না বলে, ঠাকুরদা প্রথমে সরষে পুড়িয়ে তাকে আমাদের বাড়িতে এনে, তার পর তার চার দিকে সুতো বেঁধে মন্ত্র পড়ে একটা ব্যাঙ বানিয়ে, একটা মাটির হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তার পর চমরুর বউ হাঁউমাউ করে কেঁদেকেটে এসে টাকা শোধ করে দিয়ে গেলে, তবে ঠাকুরদা আবার চমরুর মাথায় ঘুঁটের ছাই মাখিয়ে ওকে মানুষ করে দিলেন। ঐজন্যেই বার বার বলি, খোকাবাবু, আমার পিছনে লেগো না।"

নগা মাঝে মাঝে ফাগুর মাথার টিকি ধরে টানত কিনা, তাই ফাগু ওরকম বলল। নগা যদিও মুখে বলল—"হ্যাঃ। উনি সব-কিছু করতে পারেন, অথচ দশ-টাকা মাইনেতে বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছেন!"—মুখে একটু চাল দিল বটে কিন্তু টিকিতে হাত দিল না।

ফাগু আস্তে আস্তে উঠে থালা-ঘটি নিয়ে আঁচাতে গেল; যাবার সময় শুধু বলল, "টাকাপয়সা তৈরি করতে পারি এ কথা তো বলি নি, খোকাবাবু। সে আমার ঠাকুরদাদাও পারত না। আর সে যা পারত, আমার বাবা অতটা পারত না। আবার আমি পারি আরো কম। তবে একেবারে যে কিছুই পারি না তাও নয়। দেখাব এখন একদিন। এখন তোমরা কেটে পড় দিকিনি। চাকর-বাকরদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম মোটেই ভালো নয়।"

বুঝতেই তো পারছ এ-সব কথা বড়দের কাছে মোটেই বলবার মতো নয়। তার পরদিন সন্ধেবেলা ফাগু মুঠোর মধ্যে করে কি একটা ছোট্ট লাল বীচি আর একটা তামার আংটি দ্যাখাল। "কি রে ফাগু, ও দিয়ে কি হবে?" ফাগু বলল, "আংটি পরে ওটা খেলে, তার পর যদি আমার জানা একটা মন্তর মনে মনে বলা যায় তা হলে যখনই ইচ্ছা হবে তখুনি আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারব। এর অনেক বিপদও আছে, কাজেই তোমরা যেন আবার খেতে-টেতে চেয়ো না।" এই-না বলে আমাদের সামনেই টপ্ করে সেটাকে গিলে ফেলল। আরেকদিন, দেখি পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা তামার মাদুলি বাঁধা। বলে কিনা, "ওটা যতক্ষণ আমার পায়ে পরা থাকবে, ততক্ষণ সব জন্তু-জানোয়ারদের কথা আমি বুঝতে পারি, দিদি।" নগা বিরক্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই বৈকি, এদিকে ক খ পড়তে পারেন না, বাড়িতে চিঠি লিখতে হলে আমাকে এসে খোসামুদি করেন, উনি বুঝবেন জন্তু-জানোয়ারদের ভাষা!"

আমার ছোট মামাতো বোন টিনা বলল, "সস্‌প্যানকে বলেন ন্যাজ্-পানা, রেফ্রিজারেটরকে বলেন ক্যাবেন্ডিস্, ইলেকট্রিককে বলেন লিক্‌টিস্, উনি বাঘা পুষিদের কথা বুঝবেন।" ফাগু একটু কাষ্ঠ হেসে বলল, "দ্যাখ দিদি, পরীদের ইংজিরি শিখবার দরকার হয় না, ঐ যে কাল মাস্টারবাবু তোমাদের বকতেছিলেন বাঁশ বেয়ে বাঁদর ওঠে বুঝতে পারছিলে না বলে, ও-সবও আমাদের শিখতে হয় না। আমাদের দেশে

'আমি নিজের চোখে দেখেছি বাঁদররা বাঁশ বেয়ে বেয়ে ওঠা-নামা করতেছে। একটুখানি ওঠে আবার একটুখানি করে পিছলে পড়ে যায়, আর রেগেমেগে সে যা বলাবলি করতেছে, সে আর তোমাদেরকে না বলাই ভালো, কোন ফাঁকে কি শিখে নেবে। হ্যাঁ কি বলছিলাম, জন্তুদের কথা বুঝি বৈকি। এই তো একটু আগে পুষি বলছিল, খোকাবাবু হাত না ধুয়েই পিসিমার বাটি থেকে দুধ চুরি করে ওকে খাইয়ে দিয়েছে। অত হাসছ কি দিদি? কাল বাঘাকে কে ঐ পুজোর সময় ছেড়ে দিয়েছিল সে কথাও বাঘার কাছে শুনেছি।"

এর পর ফাগুকে আমরা খুব বেশি ঘাঁটাতাম না। কিন্তু সত্যি ব্যাটার খাওয়ার আর ঘুমের বহর দেখে অবাক না হয়ে পারতাম না। মাঝে মাঝে আমাদের বলত, "দ্যাখ, দাদা দিদি, তোমরা যদি আমাকে খুশি করতে পার তোমাদের আমি ঐ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মন্তরটা শিখিয়ে দেব। আমরা তখুনি ওকে আমাদের পয়সাকড়ি, যার যা হাতে ছিল দান করে বসলাম। "এবার খুশি হয়েছ তো ফাগু, এবার শিখিয়ে দাও।" ফাগু বলত, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিখিয়ে দেব বৈকি। তবে একটা কালো প্যাঁচার চোখের মণি লাগবে। সেটা আনতে পারবে তো?" আমরা সবাই অপ্রস্তুত হয়ে এ ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম! শেষে নগা বলল, "কি যে বল ফাগু, প্যাঁচার চোখ কোথায় পাব? আচ্ছা এই কালো মার্বেলটাতে হবে না?" ফাগু একটু ভেবে বলল, "তা হতে পারে, পরীদের ছেলে আমি, ওটা শক্ত হলেও আমার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তা হলে যে, আবার জ্যাঠামশাইয়ের ঐ ভালো তামাকটার এক দলা লাগবে। আর দেখ, খোকাবাবু, কাউকে যদি এ-সব কথা বল তো মন্তর তো হবেই না, বরং পড়া-টড়া যা একটু-আধটু জানো তাও সব ভুলে যাবে।" নগা বলল, "পাগল, পাগল, এ-সব কথা কাউকে বলি কখনো!"

তামাক পেয়ে ফাগু বলল, "আজ তো হবে না খোকাবাবু, আজ সকালে পশ্চিম দিকে ছাগল ডেকেছিল, আজ হবার নয়। কাল বিষ্যুৎবার, বাদ দিতে হবে, পরশু একাদশী পরশু মন্তর-তন্তর করলে ম্যালেরিয়া হয়, সেই গিয়ে একেবারে শনিবার করতে হবে। তা এক দিক দিয়ে ভালো হল, সেদিন ছোটকাকিমাও বাপের বাড়ি থেকে আসবেন, ওনার সঙ্গে সেই দুষ্টু বিজুও আসবে, ওকেও তা হলে শিখিয়ে

চালাকি করবি তো পিটিয়ে ছাতু করে দেব।

দিতে পারব। আচার-টাচার চুরি করতে ভারি সুবিধে হবে।"

তাই হল। কোনোরকমে বিষ্যুৎ শুক্কুরটা পার করে শনিবার সকালে যেই ছোটকাকিমার সঙ্গে বিজু এসে উপস্থিত হয়েছে, ধরলাম গিয়ে ফাগুকে। নগা বলল, "আর চালাকি চলবে না, ফাগু, বলে রাখলাম। যা, যা, বলেছিলে সব হয়েছে। এবার না শিখিয়ে দিলে কিন্তু বাবাকে বলে-টলে একাকার করব, সে পড়াই ভুলি আর যাই করি।" আমি বললাম, "হ্যাঁরে, সত্যিই তাই। তা ছাড়া এমনিতেই তো প্রায় সবই ভুলে গেছিস, মাস্টারমশাই বলছিলেন না?" খুশি হওয়া দূরে থাকুক নগা আমাকে এক ধমক দিল, "চুপ। আমি তোর চেয়ে বড় না।" বিজু বললে—"আহা, তোরা থাম্ না। দ্যাখ্ ফাগু, পড়া-টড়ার জন্য আমি কেয়ারই করি না। জানিই না কিছু, ভুলব কি ছাই। তবে এটুকু বলে রাখি চালাকি করবি তো পিটিয়ে ছাতু করে দেব। তোর চেয়ে ঢের ঢের ভালো লোকদের একেবারে আমচুর বানিয়েছি তা জানিস? যখন শেষটা ছেড়ে দিয়েছি পানের মসলার সঙ্গে তাদের কোনো তফাত থাকে নি। কাঁদতে কাঁদতে সব বাছাধনরা বাড়ি গেছে।"

ফাগু বলল, "আরে না, না। অত অবিশ্বাস করলে কি চলে, দাদা? আজ সন্ধ্যাবেলায় সুয্যি ডুববার একঘণ্টা পরে খুব ভালো সময়। তোমরা চারজনে একটা নতুন কাঁসার ঘড়ায় পঞ্চাশটা সন্দেশ, একটা নতুন ধুতি, একটা নতুন গামছা, আংটিটা তো আমার পকেটেই আছে"—বলে ফাগু এ পকেটে সে পকেটে হাতড়াতে লাগল। সব্বনাশ আংটি তো নেই! "তার কি হবে! এমনি আংটিতে তো হবে না, ওটা যে মন্ত্রপূত ছিল।"

এ্যাঁ ফাগু! শেষ কালটা সব পণ্ড! বিজু ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, "দ্যাখ্, চালাকি রাখ্, আংটি যখন তুই হারিয়েছিস তোকেই ব্যবস্থা করতে হবে। এক মিনিট সময় দিলাম। ফাগু কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলল, "লাল পাথর-বসানো বড় সোনার আংটি একটা হলেও চলে যায়। তা সে আমি কোথায় পাব?" বিজু একটু হেসে বলল, "আচ্ছা, সে আমি দেব 'খন। কিন্তু অদৃশ্য হতে শেখাতে হবে।"

ফাগু বলল, "সে আর বলতে। ঠিক সাড়ে ছটার সময় ঐ জিনিস-গুলো নিয়ে, গোয়াল ঘরের পিছনে ঐ খালি গুদোম ঘরটাতে তোমরা এসো। আগে আমি নিজে অদৃশ্য হয়ে দেখব পারি কি না, আংটিটার জন্যই

একটু ভাবছি। তার পর তোমাদের শিখিয়ে দেব। তবে কি জানেন দাদাবাবু, এ-সব বড় শক্ত খেলা, এইটুকু ভুল করেছি তো সর্বনাশ! হয়তো চিরটা কালের মতো উবে যাব, হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাব।" বিজু বললে, "ন্যাকামো রাখ্! সাড়ে ছটাই ঠিক রইল।"

সন্ধেবেলা বড়রা সিনেমা দেখতে গেলে, বিজু ছোট কাকিমার সঙ্গে এসেছিল ওঁর বিয়ের যে ঘড়া, তত্ত্বর সন্দেশ, ধুতি, গামছা আর নিজের নতুন লাল পাথরের আংটি, এই-সব নিয়ে আমাদের সঙ্গে গুদোম-ঘরে গেল। সেখানে ফাগু অপেক্ষা করছিল। "কাউকে বল নি তো তোমরা? তা হলে কিন্তু মন্তর ফলবে না।" "আরে না, না, এবার শুরু কর।" ফাগু ঘরে ঢুকে বলল, "তোমরা একটু বাইরে দাঁড়াও, গোপনে মন্তরটা সড়গড় করতে হয়।" বলে জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে আমরা বসে আছি তো বসেই আছি। আধ ঘণ্টা গেল, এক ঘণ্টা গেল, চার দিক দিয়ে এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে আর কি বলব। তার পর বড়রা সাড়ে আটটার পর এসে হাজির হবে, তখন কিছু হবার জো নেই। এত দেরি করলে মন্তর শিখব কখন! শেষটা বিজু কাঁধ দিয়ে দরজা ঠেলে খুলে ফেলে দিল। গিয়ে দেখি সব ভোঁ ভাঁ। ফাগু ও জিনিসপত্র সব ডিস্যাপিয়ার্ড!

ভেবেই পেলাম না কি হল। ব্যাটা মন্তরই ভুল করে চিরকালের মতো হাওয়াই হয়ে গেল, না কি—আমরা সবাই গুদোম ঘরের দেয়ালের ছোট জানলাটার দিকে একবার তাকালাম। খালি বিজু একটু মাথা চুলকে বলল—"আমি আবার আমার বন্ধু জগাইয়ের কাছে খানিকটা খানিকটা বলেছিলাম, সেইজন্যই কি বেচারা শেষটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল নাকি?"

পরে গোলমাল হয়েছিল বৈকি, আংটির কথা কেউ না জানলেও, ঘড়া নেই, সন্দেশ নেই, কাপড় নেই, ফাগু নেই। গোলমাল হবে না? তবে ফাগুকে পাওয়া যায় নি।

কি বুদ্ধি

জন্তু জানোয়ারদের বিষয়ে কতরকম অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায় তার আর ঠিক নেই। একবার নাকি একটি ব্যাঙ কেমন করে পাথরের ফোকরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়ে, ঐভাবে কতকাল যে ছিল তার ঠিক নেই। বোধ হয় অনেক শো বছর। তার পর যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, অমনি সে চাঙা হয়ে উঠে বার দুই চোখ মিট্‌মিট্‌ করে, থপ্‌থপ্‌ করে কোথায় চলে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

তার পর আরেকটা অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম, গোবি মরুভূমিতে কয়েকজন ভূপর্যটক নাকি বিরাট বিরাট গোল গোল পাথরের মতো কি পেয়েছিলেন, সেগুলি ভেঙে দ্যাখেন কোনো অতিকায় জানোয়ারের ডিম। বালির মধ্যে থেকে ভিতরটা একটুও নষ্ট হয় নি।

এ-সব গল্পের সত্যিমিথ্যা সম্বন্ধে অবশ্য আমি কিছুই বলতে চাই না, তবে চেনা-জানা জানোয়ারদের মধ্যে, একবার একজন বাঘ-শিকারীর কাছে একটি মজার বাঁদরের গল্প শুনেছিলাম। তাঁর নাম মুকুন্দবাবু তিনি তো বলেছিলেন গল্পটা সত্যি।

একবার নাকি তাঁরা লোকজন নিয়ে মধ্য ভারতের কালাহান্দীর ঘোর জঙ্গলে বাঘ শিকারে গেছেন। গভীর বনের মধ্যে তাঁবু গেড়েছেন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে অবধি কানে আসছে একটা অনর্গল গুন্‌গুন্‌ শব্দ। আশেপাশে ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখেন, বিরাট এক বোলতার চাক, লম্বা হয়ে নিচু একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে। হাজার হাজার বোলতা যাওয়া আসা করছে, আর গুন্‌গুন্‌ শব্দ হচ্ছে।

তাঁবুর সামনে বসে মুকুন্দবাবু মজা দেখছেন। চাক থেকে নীচে মাটির উপর টুপ্‌ টুপ্‌ করে মধু পড়ছে, প্রজাপতিরা উড়ছে, পাখিরা কিচির্‌-মিচির্‌ করছে। এমনি সময় চোখ পিটির্‌-পিটির্‌ করতে করতে এক বাঁদর-ছানা এসে হাজির। ছোঁক্‌-ছোঁক্‌ করতে করতে একেবারে চাকের তলায় গিয়ে উপস্থিত।

চাকটা খুব নিচু ডালে ঝুলছে, বাঁদর-ছানা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাই

দেখতে দেখতে বাঁদরের পায়ের কাছে ছোটখাটো একটা বোলতার ঢিপি জমে গেল।

দেখল। তার পর আঙুল দিয়ে মাটি থেকে একটু মধু তুলে নিয়ে চেটে খেল।

ইস্! কি ভালো রে! আরেকটু পেলে হয়।

এই ভেবে বাঁদর-ছানা চাকটাকে একটু ঠেলে ঠুলে দেখতে লাগল। হয়তো-বা একটা বোলতাকে চিপে দিয়ে থাকবে, কি যে কারণেই হোক, কোত্থেকে এক বোলতা এসে দিয়েছে হুল ফুটিয়ে। আরে বাপ্! আর যায় কোথা! ঐ ছোট বাঁদর-ছানা মানুষের মতো হাত ঝেড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, সাংঘাতিক ক্যাঁও-ম্যাও করে, জঙ্গলটাকে একেবারে মাতিয়ে তুলল। তার পর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়তে দৌড়তে সে তো সেখান থেকে ভাগল।

কিন্তু একটু বাদেই, ওমা, কোত্থেকে এক ধাড়ী বাঁদরকে সঙ্গে এনে হাজির! চাকের কাছে এসে কিচির্-মিচির্ হুকুহুকু করে কি যে না বলল তার ঠিক নেই।

তার পর ছানা বাঁদর তফাতে দাঁড়িয়ে রইল, ধাড়ী বাঁদর খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে চাকের কাছে এসে উপস্থিত হল। ততক্ষণে বেলা একটু বেড়েছে, বোলতারা বেশির ভাগই চাকের মধ্যে ঢুকেছে, মাঝে মাঝে একটা-একটা বেরুচ্ছে, আর উড়ে চলে যাচ্ছে।

বুড়ো বাঁদর খানিকক্ষণ ধরে চাকটাকে খুব নজর করে দেখল। তার পর গম্ভীর মুখ করে বাঁ হাতের তেলো দিয়ে বেরুবার গর্তটাকে চেপে ধরল। ছানা বাঁদর দূর থেকে হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে কাণ্ড দেখতে লাগল যেই-না ভিতর থেকে একটা বোলতা বেরুতে চায়, বুড়োর হাতে সুড়্সুড়ি লাগে বোধ হয়, আর অমনি সে হাতটা একটুখানি ফাঁক করে ডান হাত দিয়ে খপ্ করে বোলতাটাকে ধরে, দাঁত দিয়ে কামড়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে, বোলতাটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। হাতের তেলোর চামড়া এমনি পুরু যে তাই বোধ হয় বোলতারা আর হুল ফুটোতে পারে না!

তাঁবু থেকে মুকুন্দবাবু অবাক হয়ে দেখলেন যে দেখতে দেখতে বাঁদরের পায়ের কাছে, ছোটখাটো একটা বোলতার ঢিপি জমে গেল। ছোট বাঁদরটা তখনো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তার পর মুকুন্দবাবুরা কাপড় চোপড় পরে, দলবল নিয়ে, শিকারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

ফিরলেন সেই সূর্য ডোবার সময়, ক্লান্ত শরীরে। তাঁবুতে ফিরে, স্নান সেরে, বাইরে এসে ডেক-চেয়ারে পা মেলে বসলেন। চারি দিকে ফুট্‌ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। হঠাৎ মুকুন্দবাবু দারুণ চমকে উঠলেন। কি

সর্বনাশ, ঐ না ছানা বাঁদরটা এখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজনার চোটে একবার এ পায়ে, একবার ও পায়ে, লাফাচ্ছে!

বুড়ো বাঁদরও বোলতার চাকের তলায় বসে আছে আর তার পাশে দেড়হাত উঁচু একটি বোলতার পাহাড়! তখনো সে একমনে একটির পর একটি বোলতা কামড়ে চলেছে। যতক্ষণ মুকুন্দবাবু জেগে রইলেন বাঁদর দুটোও নড়ল না।

তার পর ওঁরা তো খেয়েদেয়ে শুতে গেলেন। পরদিন সকালে উঠে দ্যাখেন, বাঁদর দুটো কখন চলে গেছে। বোলতার চাকের তলায় একটা বোলতার পাহাড়। আর সকালবেলার রোদে প্রজাপতিরা উড়ছে, পাখিরা কিচির্-মিচির্ করছে, কিন্তু বোলতাদের কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

বনের ধারে

ছোটবেলায় পাহাড়ে দেশে থাকতাম। চার দিকে ছিল সরলগাছের বন। তাদের ছুঁচের মতো লম্বা পাতা, সারা গায়ে ধুনোর গন্ধ, একটুখানি বাতাস বইলেই শোঁ শোঁ একটা শব্দ উঠত। শুকনো সময় গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে অমনি আগুন লেগে যেত; সরলগাছের ডালপালা ভরা সুগন্ধ তেল, সেও ধূ ধূ করে জ্বলে উঠত। বাতাসের মুখে সেই আগুন ছুটে চলত, মাইলের পর মাইল পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ঘন সবুজ বন মাঝে মাঝে পুড়ে ঝলসে থাকত।

বনের ধারে যারা বাস করত তাদেরই হত মুশকিল। আগুনের দাপাদাপি বন্ধ করবার জন্য পাহাড়ের গোড়া থেকে চুড়ো পর্যন্ত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে, গাছপালা কেটে ফেলে, চওড়া একটি ঘাস-জমি করে রাখা হত। তার এক দিকে আগুন লাগলে, অতখানি খোলা জায়গা পার হয়ে অন্য ধারে আগুন পৌঁছনো শক্ত হত।

পাহাড়ের বাসিন্দারা ছেলেবুড়ো সবাই মিলে আগুনের সঙ্গে লড়াই করত। এক পাহাড়ের মাথা থেকে উঁচু গলায় কু—উ—ই—ই বলে ডাক দিত। পাহাড়-দেশে এক চুড়ো থেকে আরেক চুড়োয় মানুষের পৌঁছতে হলে অনেক খানাখন্দ বন-বাদাড় ভেঙে যেতে হত, কিন্তু শব্দ

পৌঁছত এক নিমেষে। অমনি যত গাঁ খালি করে সবাই মিলে, পাতাসুদ্ধ গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত পিটিয়ে পিটিয়ে আগুন নেবাতে।

আর বনের যত পশুপাখি, তারা সব দলে দলে বন ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করত। বনের জানোয়ার আগুনকে যত ভয় করে, আর কিছুকে ততটা করে না। অন্য জানোয়ারের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা যায়, গাছের ডাল-পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে দিয়ে। অন্য জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়, নখ দিয়ে, শিং দিয়ে, খুর দিয়ে, দাঁত দিয়ে। কিন্তু আগুনের কাছ থেকে পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অন্য সময় জন্তু-জানোয়ারদের ভারি গর্ব ; তাদের হারাতে গিয়ে মানুষকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। একটা পাখি ধরবার জন্য কায়দা কত, একটা হরিণ মারবার জন্য কত তোড়জোড়। তাও সামনা-সামনি সোজাসুজি নয়, লুকিয়ে জাল পেতে, খাবার দিয়ে ভুলিয়ে, তবে-না পাখি ধরে ; বন্দুক নিয়ে, শিকারী নিয়ে, বন পিটিয়ে তবে-না জানোয়ার মারে। আর তারা লড়ে খালি হাতে, শুধু তাদের জানোয়ারের বুদ্ধি আর জানোয়ারের শক্তি দিয়ে। কিন্তু আগুনের কাছে তাদের সব গর্ব খাটো হয়ে যায়। হুড়্‌মুড়্‌ করে কাচ্চা-বাচ্চা বুকে চেপে, তারা বন থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তবে পাহাড়-দেশের লোকেরা আগুন লাগার সময় জানোয়ার মারত না, সবাই মিলে আগুনের সঙ্গে লড়ত।

আমাদের দুধ দিত ডোরাক ; শুকনো বুড়ো, মাথায় পশমের পাগড়ি বাঁধা, দু কানে দুটি পলা পরা। তার বাড়ি ছিল বনের ধারে, ঘাস-জমির গা ঘেঁষে। ঘাস-জমির ঢালুতে তার গোরু-ছাগল চরত। তাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত, সারাদিন পাহারা দিতে হত না। বনের মধ্যে কত জানোয়ারের বাস কে তার খবর রাখে। তবে বড় জানোয়ার থাকলেও টের পাওয়া যেত না। ডোরাক বলত সহজে ওরা খোলা জায়গায় মানুষের বাসের কাছে আসে না, যদি না খিদের তাড়নায়, কি তার চেয়েও প্রবল কোনো রাগের বশ হয়ে আর সব ভুলে যায়।

একবার ডোরাক আমাদের ঐ বনের মধ্যে নিয়ে গেছিল। চার দিকে শীতের শেষের রোদ ঝিল্‌মিল্‌ করছে, কিন্তু বনের মধ্যেটা ঘন ছায়ায় ঢাকা, পায়ের নীচের মাটিটা স্যাঁৎসেতে, তার ওপর সরলগাছের পাতা পড়ে পুরু গালচের মতো হয়ে রয়েছে। সরলগাছের মিষ্টি ধুনোর গন্ধের

সঙ্গে, কেমন একটা জানোয়ারদের উগ্র গন্ধ মিশে রয়েছে, কিন্তু কোথাও কাকেও দ্যাখা যাচ্ছে না।

গাছের গোড়ায় প্রকাণ্ড সব ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, ডালে ডালে ফিকে সবুজ আগাছা বুড়ো মানুষের দাড়ির মতো ঝুলে রয়েছে; ধরে একটু টানলেই পড়্-পড়্ শব্দ করে শেকড়সুদ্ধু উঠে আসে।

সেখানে ফিস্‌ফিস্ করে ছাড়া কথা কইতে ইচ্ছে করে না। ডোরাকের কানে কানে বললাম, "তারা কোথায়?"

ডোরাক আমাদের শুকনো পাতা দিয়ে মোড়া গাছের কোটর দ্যাখাল। পাথরের ফাটলে নরম শুকনো শ্যাওলার বিছানা দ্যাখাল। মাথার অনেক ওপরে গাছের ডালে পাতার মধ্যে অন্ধকারের ভেতর জটা মতন দ্যাখাল। তার বেশি কিছু নয়। দূর থেকে অনেকবার যেন চক্‌চকে চোখ দেখেছিলাম, কাছে গেলেই কিছু নয়; বোধ হয় যে যেখানে চোখ বুজে, ডানা মুড়ে বসে থাকে। মানুষকে তারা বড় ভয় করে।

বনের মাঝে মৌ-গাছ দেখলাম। সে কোনো একরকম গাছই নয়। ঝাউগাছ, সরলগাছের মাঝখানে একটা মস্ত মরা গাছ, ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও পাতা নেই। কিন্তু গাছের খাঁজে খাঁজে ফাটলে ফোকরে শত শত মৌচাক। আর চার দিকে মৌমাছিদের সে কী গুঞ্জন, কান যেন ঝালাপালা হয়ে গেল।

ডোরাক ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে আমাদের সাবধান করে দিল। কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে বললে, ও গাছের সন্ধান এখনো কেউ পায় নি। জানলেই দলে দলে এসে, গভীর রাতে গাছের গোড়ায় আগুন দিত। মৌমাছিরা অমনি অন্ধের মতো সব চাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, আর মানুষরাও সমস্ত মধু লুটেপুটে নিয়ে যেত। ডোরাক বলল, "তোমরাও যেন কারো কাছে মৌ-গাছের গল্প কোরো না। তা হলে লাখ লাখ মৌমাছির প্রাণ যাবে, মৌ-গাছ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

পাথরের ফাঁকে ডোরাক দ্যাখাল সবুজ সাপ ঘুমুচ্ছে। গায়ের আঁটো চক্‌চকে খোলসটা ঢিলে হয়ে গেছে। ডোরাক বলল, সারা শীতকাল ঘুমুবে সাপটা। বলল, এক সময় নাকি পুরনো খোলসটা ছেড়ে দেবে, নতুন খোলস গজাবে। কদিন শরীরটা নরম তুল্‌তুলে হয়ে থাকবে, একটু কিছুতেই ব্যথা লাগবে; তার পর নতুন খোলসটাও আঁটো, শক্ত, মজবুত হয়ে উঠবে। বলল, ভালুকরাও নাকি সারা শীত ঘুমিয়ে কাটায়।

ডোরাক আমাদের ওর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেছিল, বাইরে দড়িতে শুঁটকিমাছ শুকুতে দিয়েছে দেখেছিলাম। বনের ধারে বাড়ি, উঠোন পেরুলেই ঘাস-জমি, তার ওপারে ঘন বন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা কচি ছোলা মধু দিয়ে খেলাম।

তার আগের বছর ঐ বনে আগুন লেগেছিল, তিনদিন ধরে কেউ নেবাতে পারে নি। মাথার ওপর আকাশটা রাঙা হয়েছিল। বাতাসের সঙ্গে ছাই উড়ে এসে ডোরাকের বাড়ির দাওয়াতে পড়ছিল। আগুনের আঁচ পেয়ে ডোরাকের গোরু-ছাগল পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। তাদের আর কিছুতেই বেঁধে রাখা গেল না। প্রথমটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপতে থাকল, তার পর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, খুঁটি উপড়ে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। ডোরাকের বউ বলছিল, কাছে পিঠে আগুন লাগলে জন্তু-জানোয়ার বেঁধে রাখতে হয় না।

খুব কাছে আসতে পারে নি আগুন। পাড়ার সবাই মিলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আগুন ঠেকিয়েছিল। ডোরাক এত ক্লান্ত হয়ে গেছিল যে, ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। দিক ঠাওর করতে পারছিল না। হঠাৎ দ্যাখে বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। হয়তো অন্য বছরের আগুনে অনেক গাছ পুড়ে গেছিল সেখানকার, তাদের জায়গায় চারাগাছ কয়েকটা বেরিয়েছিল, তবে চারা তেমন বাড়ে নি।

খানিকটা দম নেবার জন্য ডোরাক সেখানে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর একটু বসেছিল। এমনি সময় হুড়্মুড়্ করে বন থেকে অনেক-গুলো জানোয়ার বেরিয়ে এল। তার মধ্যে একটা কালো ভালুকও ছিল, তার বুকে একটা ছানা।

খোলা জায়গায় এসে তারা থমকে দাঁড়াল, তার পর হয়তো মানুষ দেখেই যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। দিনের আলো কমে এসেছে, ডোরাক তাদের ভালো করে নজর করতে পারল না। কিন্তু মা ভালুকটা সামনে পড়ে গেছিল, সে একেবারে পাথর বনে গেল। ছানাটা অমনি কুঁই-কুঁই করে উঠল, ভালুক হঠাৎ চমকে উঠে তাকে ফেলে, নিমেষের মধ্যে কিরকম একটা চীৎকার করে, আবার জ্বলন্ত বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কোথায় গেল তার নিজের ছানা?

ডোরাক অবাক হয়ে দেখল, এটা ভালুক-ছানা নয়। নিদারুণ ভয়ে ভালুকটা ভুল করে আর কারো ছানা তুলে নিয়ে এসেছে। কুকুর-ছানার

...তার মধ্যে একটা কালো ভালুকও ছিল, তার বুকে একটা ছানা।

মতো শুঁকে শুঁকে বাচ্চাটা একেবারে ডোরাকের কোলের কাছে এসে হাজির।

ডোরাক তাকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তার বুক, পেট, পায়ের ভিতর দিকটা নরম সাদা রোঁয়ায় ঢাকা, ওপরটা ফিকে হলুদ, তাতে মিহি একটু কালো ছোপ ছোপ লেগে রয়েছে, মাথাটা গায়ের তুলনায় যেন একটু বড় মনে হল।

চিতাবাঘের ছানা। দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডোরাকের হাঁটু চাটে। দুধ ছাড়া কিছু খায় না। ডোরাকের বউ কোলে নিলে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বোধ হয় মাকে খোঁজে। বউয়ের মনটা কেমন করে। রাতে ডোরাকের কম্বলের তলায় ঢুকে ছানাটা ঘুমোয়।

তিন মাস ছিল ছানাটা। বেশ বড় হয়ে উঠেছিল, সারা গায়ে মোলায়েম কালো চাকা চাকা দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল। বাড়িময় একটা বাঘ-বাঘ গন্ধ লেগে থাকত। বাইরের কুকুররা আর ভেতরে এসে জ্বালাতন করত না।

ছানাটাকে ওরা নিরামিষ খাওয়াত, দুধ, ভাত, ডাল, তরকারি। পাকা কলা খেতে ভারি ভালোবাসত। টক দইয়ের সঙ্গে পাকা কলা মেখে দিলে চেটেপুটে খেয়ে, ল্যাজ নেড়ে-টেড়ে একাকার করত।

বউয়ের বাবার নব্বুই বছর বয়স, লাঠি ভর দিয়ে পাহাড়ময় টুক্‌টুক্ করে ঘুরে বেড়াত। সে বলত—বাঘ পোষা যে সে কম্ম নয়। খবরদার যেন, রক্তের স্বাদ না পায়; শিরার ভেতরকার ঘুমনো আগুন যেন জ্বলে না ওঠে।

এমনিধারা কথা বলত বুড়ো। আর ছানাটা উনুনের পাশে শুয়ে শুয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। হলদে চোখের পেছনে মনে হত কে যেন বাতি জ্বেলেছে। কিচ্ছু বলত না কাকেও। মুরগি-ছানাগুলো ওকে একটুও ভয় পেত না, ওর পিঠে চড়ত।

ততদিনে শীত কেটে গেছে। চার দিকের পাহাড়গুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। ন্যাড়া গাছে পাতার কুঁড়ি সব খুলে গেছে। রোদ ঝিক্‌মিক্ করছে। সর্বজয়া গাছে কলি ধরেছে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে, প্রজাপতিরা উড়ছে।

সারা সকাল ছানাটা বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। দুপুরে দই-ভাত না খেয়ে, কালো মুরগিটাকে ধরে সকলের চোখের সামনে কড়্‌মড়্

করে খেয়ে ফেলল। কেউ বাধা দেবার আগেই কম্ম শেষ।

ডোরাকের বউ কেঁদে কেটে সারা; ওর মানত করা কালো মুরগি, বাড়িতে এবার অকল্যাণ হবে। রাগ করে শেকল দিয়ে ছানাটাকে বেঁধে রাখল। রাতেও তাকে ঘরে তুলল না। শুল না সারাদিন ছানাটা, খালি বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। পরদিন সকালে দোর খুলে বউ দ্যাখে রাতে কখন শেকল ছিঁড়ে সে পালিয়ে গেছে।

ডোরাকের কাছে গিয়ে বউ কেঁদে পড়ল, "যেমন করে পারো, আবার ধরে আনো, আমি ওকে বেঁধে রাখব, মাংস খেতে দেব।"

ডোরাক শুধু মাথা নাড়ল।

বউয়ের বুড়ো বাবা বলল, "আমাদের জঙ্গল-দপ্তরের দরজার ওপর লেখা আছে—বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।"

মেজোমামার প্রতিশোধ

আমার মেজোমামাকে নিশ্চয় তোমরা কেউ দ্যাখ নি। হাড় জিরজিরে রোগা বেঁটে মতন, সরু লিক্‌লিকে হাত-পা; সারা মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ। কারণ মেজোমামা দু সপ্তাহে একবার দাড়ি চাঁচেন, নাকি দাড়ি কামালেই মুখময় আঁচড়ে যায়; খাটো করে ধুতি পরা, আর প্রাণ ভরে নানারকমের ভয়—চোরের ভয়, পুলিশের ভয়, বাঘের ভয়, গাড়ি চাপা পড়ার ভয়, রোগের ভয়, ডাক্তারের ভয়, ভূতের ভয়, আর সব চেয়ে বেশি ভয় নিজের শ্বশুরকে।

মেজোমামার শালার বিয়ে হবে। শ্বশুর লিখে পাঠালেন মেজোমামাকে নিজে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে শ্বশুরের ঠাকুরমার আমলের লাখ টাকার গয়না বের করে নিয়ে নৈহাটী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। খুব সাবধানে যাওয়া আসা করতে হবে কারণ ও জিনিস একবার গেলে আর হবে না। আর দুষ্টলোকে খবর পেলে ওর জন্য মারপিট খুন-জখম করতে পিছ্‌পাও হবে না। শুনে তো মেজোমামার জিবতালু জড়িয়ে গেল, অথচ না গেলেও নয়, শ্বশুর তা হলে আর আস্ত রাখবেন না।

বঙ্কুদাদার গাড়িটা চেয়ে নিয়ে একেবারে স্টেশন যাবার পথে গয়নার বাক্স বের করে নিয়ে একটা আধময়লা বাজারের থলিতে পুরে, তার উপর কতকগুলো মুলোটুলো দিয়ে যত্ন করে ঢাকা চাপা দিয়ে তো স্টেশনে নামা গেল। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চির একটি কোনা দখল করতেও বেশি সময় লাগল না। এতক্ষণে মেজোমামা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। থলিটাকে বেঞ্চির কোনে গুঁজে তার উপর একরকম চেপে বসে ওফ্ করে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধুতির খুঁটটা দিয়ে কপালের গলার ঘামটাম মুছে নিলেন। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পাশে বসে পড়ল। উঃ, যেন সাক্ষাৎ বকরাক্ষস, ইয়া ছাতি, ইয়া ভুঁড়ি আর ইয়া বড়-বড় পান-খাওয়া বত্রিশপাটি দাঁত। তাকে দেখেই মেজোমামার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, কি অসৎ চেহারা লোকটার সে আর কি বলব! কানের লতি টানা, নাকের ফুটো বড়, চোখ ছোট, জোড়া ভুরু, আঙুলের গিঁটে গিঁটে লোম।

মেজোমামা জড়সড় হয়ে বসলেন, ট্রেনটা লাগলে বাঁচা যায়। এমন সময় লোকটা ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলল, "দামোদরের দলের লোক না? মুখটা যেন চেনাচেনা লাগছে।" মেজোমামা কথা বলবেন কি জিব শুকিয়ে সুকতলা। লোকটা একটু কাষ্ঠ হেসে আবার বলল—"ঘাবড়াচ্ছ কেন? জানো না কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না।" মেজোমামা অনেক কষ্টে ঢোক গিলে হঠাৎ সাহস করে উঠতে যাবেন, অমনি লোকটা কনুই ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিয়ে বলল, "আহা শোনোই-না। কথা আছে।" মেজোমামা আবার বসে পড়লেন। পেটটা ব্যথা-ব্যথা করতে লাগল। লোকটা বলল—"মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে চেয়ে দ্যাখ আমাদের বাঁয়ে যে খাকি হাফপ্যান্ট-পরা লোকটা হলদে সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হল ব্যাঙ্কের বড় জমাদার, নৈহাটী যাচ্ছে। নকুলেশ্বরবাবুর ছেলের বিয়ের গয়না আছে।" এই অবধি বলে সুড়ুৎ করে লোকটা জিবের জল টেনে নিয়ে আরো বলল—"হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, অমন ভালোমানুষও সাজতে হবে না। তুমিও আলুমুলো ব্যাগে করে ডেলি প্যাসেঞ্জার সেজে কেন বসে আছ সে আমি বেশ জানি। দ্যাখ, মুখের ভাবখানা বদলাবে কোত্থেকে, ওতে যে ছাপ মারা রয়েছে।" মেজোমামা একেবারে থ! লোকটা বলে কি?

ঠিক সেই সময়ে গাড়ি ইন্ করল আর সকলে ধড়্মড়্ করে উঠে

বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুষি পাকিয়ে মামার নাকের কাছে নেড়ে দিল।

পড়ল। তারই মধ্যে লোকটা মেজোমামার কানে কানে দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গলায় বলল—"দ্যাখ দামোদরের চ্যালা, আজ আর কোনো চালাকি করতে এসো না, তা হলে পিটে তোমাকে আলুভাতে বানিয়ে দেব, এই দ্যাখ।" বলে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুষি পাকিয়ে মামার নাকের কাছে নেড়ে দিল। "খবরদার আমাদের পাছু নেবে না। আমি ঐ লোকটার সঙ্গে এক গাড়িতে যাব, নৈহাটী স্টেশনের আগে একটা পোস্টের ধারে বীরেশ্বর, জানোই তো বীরেশ্বরকে, দাঁড়িয়ে আছে। যেই তার কাছে ট্রেন পৌঁছবে হুড়্মুড়্ করে মুখ থুবড়ে লোকটার ঘাড়ে পড়ে, বাঁ হাতে জানালা দিয়ে ব্যাগ মাটিতে ফেলতে নটবর শর্মার বেশি সময় লাগবে না। তুমি বরং ঐ গাড়িতে ওঠো।" বলে মেজোমামাকে একরকম কোলপাঁজা করে ধরে সামনের একটা থার্ড ক্লাসে তুলে দিয়ে, নিজে সেই লোকটার সঙ্গে পাশের গাড়িতে চেপে বসল। মেজোমামা এতক্ষণ টুঁ শব্দটি করে নি। সারা গা দিয়ে দর্দর্ করে তাঁর ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে। আর পা কাঁপুনি থামতে থামতে নৈহাটী এসে গেল। নৈহাটী পৌঁছে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সুড়্সুড়্ করে নেমে পড়ে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গেটের উলটো দিকে ছুটলেন। গাড়িতে খুব একটা সোরগোল হচ্ছে টের পেলেন।

লাইন পার হয়ে বাজারের থলি হাতে মেজোমামা পা চালিয়ে এগুতে লাগলেন। বেশ খানিকটা পথ, অন্ধকার হয়ে আসছে, এমনি সময় একবার ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখেন একজন মোটা লোক হন্হন্ করে পিছন পিছন আসছে। মেজোমামার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। সেই লোকটাই বটে। কোত্থাও জনমানুষ নেই, থলে নিয়ে মেজোমামা বাতাসের বেগে ছুটে চললেন। কিন্তু ল্যাগ্ব্যাগে হাত-পা নিয়ে কত আর ছুটবেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকটা অনেক এগিয়ে এল। ভয়ে", তো মেজোমামার চক্ষু চড়কগাছ; এখন কি করা যায়? লোকটাকে পিটলে কেমন হয়? সেও এক মুশকিল। যা জল্লাদের মতো বপুখানি আর উরে বাপ্ রে, কী খুনে প্যাটার্নের চেহারা। ছোটবেলা থেকে মেজোমামার ঠাকুরমা ওঁকে দিনরাত বলে এসেছেন, ন্যাপ্লা, শুঁয়োপোকা মাড়াচ্ছিস, দাঁড়া, তোকে আর-জন্মে শুঁয়োপোকা হতে হবে। এ্যাঁ, মাকড়সা ঠ্যাঙাচ্ছিস নাকি? জানিস তুই আর-জন্মে মাকড়সা হবি? ও কিরে, হাতে ঢিল কেন রে? ঢিল ছুঁড়লে ঢিল খেয়ে মরতে হয়

তা জানিস? কাজে কাজেই কাউকে আর ঠ্যাঙানোই হত না। কিন্তু তা বললে চলবে কেন? হ্যাঁ, স্টেশনের সেই লোকটাই তো বটে। নিশ্চয় সুটকেস খুলে তার মধ্যে জামা ইজের দেখে রেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে ছুটে আসছে। ছোটবেলা থেকে কত লোক যে মিছিমিছি পা মাড়িয়ে দিয়েছে, কান মলেছে, ভেংচি কেটেছে, চুল ছিঁড়েছে, কালি দিয়ে পিঠে গাধা লিখেছে, বিয়ের সময় শ্যালীরা নুন দিয়ে জল আর ন্যাকড়া দিয়ে সন্দেশ খাইয়েছে, অফিসে অন্য বাবুরা এপ্রিল ফুল বানিয়েছে, তার উপর আজ এই। হঠাৎ মেজোমামার মাথায় খুন চেপে গেল। থলেটাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে এক পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যেই-না সেই লোকটা কাছে এসেছে ঝড়ের মতো ছুটে গিয়ে দিলেন তার নাকে প্যাচ্ করে এক ঘুষি, তার পর মুখের উপর ধাঁই করে আরেকটা। লোকটা এমনি অবাক হয়ে গেল যে, কিচ্ছু করতে পারল না। মেজোমামা তাকে বেদম পিটলেন। উঃ, সে কী পিটুনি, চড়, লাথি, ঘুষি, কানমলা, চুলছেঁড়া, বিকট বিকট ভেংচি কাটা, নেহাত অন্ধকার ছিল বলে সে দেখতে পেল না, নইলে বাছাধনের পিলে চমকে যেত। তার পর সে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে পড়ল মেজোমামা থলে তুলে নিয়ে হাওয়া।

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন অনেক রাতে, ঘুরে ফিরে নার্ভাসনেসের চোটে ভুল রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বাড়ির লোকেরা তো ব্যস্তই হয়ে উঠেছিল। শ্বশুরমশাই ছুটে এসে গয়নার বাক্সটা হাতে নিয়ে বললেন, "যাক বাবাজি, নিরাপদে যে এসেছ এই আমাদের ভাগ্যি। চারি দিকে যা সব কাণ্ড হচ্ছে। এইমাত্র বটু খবর দিল বিকেলের ট্রেনে চুরি-ডাকাতি হয়েছে, আবার নলডাঙার মোড়ে হেডমাস্টারমশাইকে তিন-চারটে গুণ্ডা বেদম ঠেঙিয়েছে—বেচারি ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ওকি, ওরকম মুখে হাত দিয়ে খুক্‌খুক্ করছ যে? কাশি হয়েছে বুঝি? ওরে মেধো, জামাইবাবুর স্নানের জন্য শিগ্‌গির গরম জল দে, খাবার-টাবার তো রেডিই আছে।"

মেজোমামা এতক্ষণে শ্বশুরমশাইকে টিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে বললেন, "আমাকে কিন্তু কাল সকালের গাড়িতেই ফিরে যেতে হবে।"